

শ্রীশ্রীমদ গুরু দাস

তৃতীয় খণ্ড

(১২৯৮ সালের ডায়েরী)



শ্রীশ্রীমদ গুরু দাস

2022 (5603)

2529



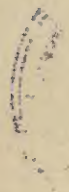
9



2420

শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ

১৫
বাস্করগুণমতিপ্রতি



শ্রীশ্রীমদ গুরু দশ

তৃতীয় খণ্ড

(১২৯৮ সালের ডায়েরী)

শ্রীমদাচার্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহান্ত্রিত অবস্থার
কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত

তদীয় কৃপাভাজন

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক যথাযথভাবে
লিখিত



[মুঠ পুনর্মুদ্রণ]
বৈশাখ, ১৩৬৯



পুরীধাম, ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের সেবায়ত
শ্রীবিষ্ণুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

মূল্য চারি টাকা পঞ্চাশ নং পঃ মাত্র

প্রথম মুদ্রণ—৪০০০—১৩২১ সাল।

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ—২০০০

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ—২০০০—১৩৩২ সাল।

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ—১১০০

পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ—২২০০—১৩৫৯ সাল।

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ—২২০০—১৩৬৯ সাল।

922
BRA

V3

৯৫২৭

[All rights reserved]

LIBRARY, V. A. MUSEUM
Date 31.7.2006
Accession No. 12235



মুদ্রাকর—শ্রীহর্ষনাথায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস

৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬



সূচীপত্র

বৈশাখ ।

(১২৯৮)

ঠাকুরের শ্রীবন্দন হইতে গোৱারিয়ার আগমন	...	১
ও আশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা	...	৩
গদ্যর প্রস্তর—গৌরীশঙ্কর	...	৪
গোবর্দ্ধনের শীলা—গিরিধারী গোপাল	...	৫
সতীশের প্রতি মায়াচক্রীর উৎপিড়ন	...	৬
প্রেতের বিষ্ণুমূর্তি ধারণ—তৎসম্বন্ধে প্রয়োত্তর	...	৭
গৈরিক ত্যাগ করিতে বলায়, ঠাকুরের সহিত	...	১১
সতীশের ঝগড়া	...	১২
ঠাকুরের প্রতি শ্রীধরের আকর্ষণ	...	১৪
দুর্দশাগ্রস্ত পরশুরামের প্রতি মাধবের কৃপা	...	১৬
স্বপ্ন, প্রারম্ভ এবং বিস্তৃত সাহিত্যিক দেহ বিষয়ে প্রয়োত্তর	...	১৯
ধার্মিকেরা সর্বদাই বিনয়ী	...	২০
আদান ও হোম বিষয়ে প্রয়োত্তর	...	২১

জ্যৈষ্ঠ ।

মহাপ্রভুর ধর্ম ও আধুনিক বৈকবধর্মে স্ত্রীলোকের সংশ্রব	...	২১
সতীর রক্ষাকর্তা স্বয়ং ভগবান	...	২৩
হোমের উপকারিতা ও প্রার্থনার অমুতাপ	...	২৫
কর্ম কিসে শেষ হয় ?	...	২৭
জীবমুক্তের কর্ম, প্রারম্ভের উপদেশ	...	২৮
জন্মই ভগবান	...	২৯
সাধকজীবনে শুদ্ধতার আবশ্যিকতা	...	৩০
অসময়ে শাস্ত্রপাঠের ও সাধুসঙ্গের অপকারিতা	...	৩১
গোৱারিয়া-আশ্রমে নিত্য সন্মার্জন ও ভাবাবেশ	...	৩২
সাধন কি ? সাধকের ও সিদ্ধের কর্তব্য কি ?	...	৩৩
ধর্ম হইল কি না কিসে বুঝিব ?	...	৩৪

বিষয়

ভাব বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য উপদেশ	...	৩২
দুর্গাচরণ বাবুর প্রতি কবিরের অত্যাচার।	...	৩৩
সম্পূর্ণ ক্ষমাতে ভগবানের দত্ত	...	৩৪
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমের অবস্থা	...	৩৫
এ সময়ে ঠাকুরের মৈনলিন কাণ্ডকলাপ	...	৩৬
আষাঢ় ।		
পরমহংস গৌর শিরোমণির দৃষ্টান্ত—দোষে ওপদর্শন	...	৩৮
সাধকজীবনে দুর্দশা। অসারত্ববোধই নির্ভরের হেতু	...	৩৯
ঐকান্তিক ভালবাসার পরিণাম শুভ—দুইটি দৃষ্টান্ত	...	৪১
প্রকৃতিতে আসক্তির ছাপ	...	৪৩
সাধনের অবস্থার ইন্ড্রিয়-চাক্ষু	...	৪৫
জন্মদক্ষিণ, জন্মর আনুগত্য ও জন্মর সঙ্গ বিষয়ে প্রশ্ন	...	৪৬
বিধিমাৰ্গ ও চক্ৰলতা বিষয়ে উপদেশ	...	৪৭
আসনের মধ্যমা	...	৪৮
জীবমুক্তের কথা—মৃত্যু ও অপমৃত্যু	...	৪৯
ব্রহ্মাধারের আদেশ, ব্রহ্মচর্যের জন্ত উৎকর্ষ	...	৫০
ব্রহ্মচর্যের প্রথম বৎসর অতীত	...	৫১

শ্রাবণ ।

দ্বিতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্যের উপদেশ	...	৫২
ক্রোধে স্বপ্নদোষ	...	৫৩
ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত লিখবার উৎসাহ ও বাধা	...	৫৪
ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের কথা	...	৫৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দৃষ্ট	...	৫৬
ব্রহ্মাধার, নীলকণ্ঠবেশ	...	৫৭
সাধনে দৈহিক উপসর্গ	...	৫৮
স্বপ্নদোষ ; হেতু ও প্রতিকারের উপদেশ	...	৫৯
উদ্ধারতা : হওয়ার সাধনপ্রণালী	...	৬০

ভাস্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈশ্বরের বৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ	...	আশ্চর্য্য জন্মবিবরণ	...
সমাধিসন্নিহিত আরক্ত; গেলারিয়ার কথা	...	অহিংসককে কেহ হিংসা করে না	...
গুরুমর্যাদালব্ধনে সিদ্ধপুরুষের পুনরাবৃত্তি	...	ঠাকুরের শান্তিপুত্র বাইতে ব্যস্ততা	...
স্বপ্নে লালের সহিত প্রতিযোগিতা	...	শান্তিপুত্র যাত্রা	...
কালীর অপমানে উৎপাত—পূজার শান্তি	...	পাণ্ডব বিজয় যাত্রাভিনয়—সত্যনিষ্ঠার উপদেশ	...
গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা	...	চিত্তবিকৃতি ও শাসন	...
ঈশ্বরের উপহাস ও শিক্ষাদান	...	সংসদ বিষয়ে উপদেশ	...
ঈশ্বরের অবস্থা ও প্রকৃতি	...	বাবল্য অগ্রাকৃত হরিসঙ্কীর্ণন	...
গুরুতে অবজ্ঞা দর্শনে ঈশ্বরের মাথা গরম	...	বাবল্য কুকুর দ্বারা অর্ধেত প্রভুর পাহুকা আবিষ্কার	...
ঈশ্বরের কঠোরানে আহুতি	...	হিমালয়ে গুরু অখণ্ড ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার	...
		জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রদোত্তর	...
		প্রসাদসম্বন্ধে প্রদোত্তর ও শ্রামাক্ষেপার কথা	...
		শান্তিপুত্রের রাস	...
		ঠাকুরের মূখে শ্যামহুল্লরের কথা	...
		ভাবের অমর্য্যাদা—নীলকণ্ঠের যাত্রাভিনয় বন্ধ	...

আশ্রিন ।

মাঠাকুরদের সমাধিসন্নিহিত	...	ঠাকুরের মূখে শ্যামহুল্লরের কথা	...
মন্দিরপ্রতিষ্ঠা প্রণালী	...	ভাবের অমর্য্যাদা—নীলকণ্ঠের যাত্রাভিনয় বন্ধ	...
মাঠাকুরদের সমাধি প্রতিষ্ঠা	...		
শান্তিপূজা ও ভগবানের নরলীলা	...		
ব্রহ্মজ্ঞান ও অবতারতত্ত্ব	...		
ভগবানের নরলীলা	...		
সংশয়সম্বন্ধে উপদেশ	...		
আকার ও উদ্ভিষ্টের অপকারিতা	...		
অপঘাতে মৃত ব্যক্তির শ্রেতাঙ্গার উৎপীড়ন	...		
শ্রেতাঙ্গার মুক্তির উপায়	...		
ধর্ম্মরূপে অধর্ম্ম	...		
রঘুবীর বাবাজীর ঐশ্বর্য্যের কথা	...		
দয়াতে পতন	...		
অভিমান কিসে হয় ?	...		

অগ্রহাঙ্গন ।

সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর কথা	...	সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী	...
বৈরাগ্য ও ত্রিতাপ সম্বন্ধে উপদেশ	...	খোদার উপর খোদার	...
ছেলেবেলায় উৎপীড়ন দর্শনে ঠাকুরের মুচ্ছা	...	ঠাকুরের শান্তিপুত্র হইতে কলিকাতা গমন	...
সমস্তই অসার—ধর্ম্মই সার	...	মসজিদবাড়ী স্ট্রিটের বাসা	...
নাম শু ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ	...	বৃন্দাবন বাবুর সেবানিষ্ঠা	...
নয় বৎসর বয়সে ঠাকুরের দয়া ও উদারতা	...	ঠাকুরের মুক্তিকৌজ দর্শন—আমার অভিমান চূর্ণ	...
সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী	...		
খোদার উপর খোদার	...		
ঠাকুরের শান্তিপুত্র হইতে কলিকাতা গমন	...		
মসজিদবাড়ী স্ট্রিটের বাসা	...		
বৃন্দাবন বাবুর সেবানিষ্ঠা	...		
ঠাকুরের মুক্তিকৌজ দর্শন—আমার অভিমান চূর্ণ	...		

কাণ্ডিক ।

ঔষধে বাবাজীর আপত্তি	...	কলেজের কতিপয় ছাত্রের সঙ্কীর্ণন;	...
আমাদের পাড়াগাঁ সম্বন্ধে ঠাকুরের নানা কথা	...	মুকুন্দ ঘোষের আকর্ষণ	...
গুরুর অপমান, ফল হাতে হাতে	...	বৈকব দর্শন—মহাপ্রভুর কথা	...
নিজ পুত্রের জীবন লইয়া শিশুপুত্রের জীবনদান	...	বিচারতত্ত্ব মহাশয়ের গৈরিক গ্রহণ	...

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঠাকুরের শাসন ও শাস্তি	...	১৪০ হরকান্ত বাবুর স্বপ্ন	১৭২
ম। আনন্দময়ীর সজ্ঞাত	...	১৪২ মাধোদাস বাবাজীর সমাধিতে অন্তর্দান	...
প্রসাদী বস্ত্র স্পর্শে ভাবাবেশ	...	১৪৩ ও ঠাকুরের কথা	১৭৩
বাসা পরিবর্তন	...	১৪৪ মাধু নারায়ণদাসের অভূত জন্ম-বৃত্তান্ত	১৭৩
শ্রামবাজারের বাসা	...	১৪৫	
শ্রামবাজারের ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য	...	১৪৬	
যথার্থ সভ্য কি উপায়ে লাভ হয়।	...	পৌষ।	
(আকাশবাণী—“গণ্ডি ছাড়”)	...	ঠাকুরের পূজা ও আরতি—মহাভাব	১৭৫
আমুগতাই ব্রহ্মচর্য	...	১৪৭ “আসন নেড় না, কৌস করবে”	১৭৬
এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে	...	১৪৮ যোগজীবনের পন্থীর গর্ভস্থ পুত্রের মৃত্যু-বিবরণ	...
ধর্ম সহজে লভ্য নয়	...	১৪৯ এবং তদীর জননীর ভবিষ্যৎ	১৭৭
জিজ্ঞাসার অবস্থা; হিন্দুত্ব ও পাশ্চাত্যত্ব	...	১৫০ আহার বিষয়ে অনুশাসন—জাতিবিচার	১৭৮
ব্রহ্মচারীদের স্বাভাবিক ভাব ও ভজন	...	১৫১ অবিচারে ভালমন্দ বুঝার সম্বন্ধ	১৭৯
ভাব কাকে বলে ?	...	১৫২ বীর্যধারণাদি শারীরিক তপস্তার প্রয়োজনীয়তা	১৮০
গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুষের লক্ষণ	...	১৫৩ নামে সিকিই প্রকৃত সিকি	১৮০
মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আস্থান	...	১৫৪ লোভ সর্বত্রই সমান ক্ষতিকর	১৮১
মহর্ষির সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎকার—	...	১৫৬ গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে কতিপয় প্রশ্নোত্তর	১৮১
মহর্ষির ভাব ও উপদেশ	...	লোভে হতাশ—উপদেশ	১৮২
শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভু। মহর্ষির প্রতি গুরুকৃপা।	...	১৫৭ দীক্ষাহুলে বিচিত্র ভাব	১৮৩
সগর্ভ ও বিগর্ভ সমাধি	...	এই দীক্ষা গ্রহণই ত্রিবেণী-স্নান	১৮৪
সমস্ত অবতার—পূর্ণ ভগবান। আত্মযজ্ঞিক প্রহর	...	১৬০ দীক্ষা বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে অপরাধ	১৮৫
কালীঘাটে কালী দর্শন—উদাসী মাধু দর্শন—	...	১৬১ দেব দেবীর অমুরোধ—পূজাটি লোপ না হয়	১৮৬
স্পর্শ করা বিষয়ে উপদেশ	...	মহাস্বামী মণিবাচুর দৃষ্টি শক্তি	১৮৭
রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আকাক্ষা ও অমুরোধ	...	১৬৩ চরণামৃত গ্রহণে প্রোতাহার উচ্চার	১৮৭
ছোট দাদার সেবা—ঠাকুরের অশ্রু	...	১৬৪ পাগলী ঠাকুরমা ও ঠাকুর, ঠাকুরের	...
ঠাকুরের বিরক্তি	...	জন্মবিবরণাদি শ্রবণ	১৮৮
ভিত্তরে ত্রিভঙ্গ	...	১৬৬ প্রসাদ কাকে বলে, কার্য্যাকার্য্য বুঝা শক্তি	১৮৯
স্বপ্ন-বিষয়ে কথা। ঠাকুরের রোগীর জন্ত	...	১৬৭ রাসলীলা ও গুরুশিষ্যসম্বন্ধ	১৯০
মহামুভূতি ও চিকিৎসা	...	ভোর কর্ত্তন—শিষ্টপদে লুটালুটি	১৯৩
নবীন বাবুর সেবা কার্য্য	...	১৬৭ পাপের মূল কিসে ধায় ? ধর্ম কি ?	১৯৫
ভক্তের সেবা-মাহসে ঠাকুরের হৃৎ	...	১৬৯ মহাপ্রভুর পুরাণ চিত্রপট	১৯৭
ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও সমাদর	...	১৭০ অভূত সর্কার্ত্তন—বাই বাই	১৯৮
ভক্তার হরকান্ত বাবুর দীক্ষা	...	১৭০ ঠাকুরসম্বন্ধে নরেন্দ্র বাবুর কথা	২০০
		১৭১ ঠাকুরের ঢাকা যাত্রা—গুরুভ্রাতাদের অবস্থা	২০১

বিবরণ	পৃষ্ঠা
পদ্মার জল হাওয়া, সাহেবের পরিহাস ...	২০২
শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোখারী জী	
বসন্তকুমারীর দেহত্যাগ ...	২০৩

মাস।

যোগজীবনের জ্ঞান আশ্রম ও পারলৌকিক অবস্থা।	
প্রার্থনাস্তর ...	২০৪
আশ্রমে অশান্ত ...	২০৬
ঠাকুরের এ সময়ে দৈনন্দিন কার্য ...	২০৭
ঠাকুরের হাসি ও খগড়ার শাস্তি ...	২১০
ঈশ্বরের বৈরাগ্যে বিষম উৎপাত; ঠাকুরের উপদেশ ...	২১১
স্বপ্নে ফকিরদর্শন ...	২১৬
গুরুজ্ঞাতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা; ঠাকুরের উপদেশ ...	২১৪
অভিমানের হ্রদশা; ঠাকুরের অনুশাসন ...	২১৫
প্রসাদের গুণ ও তাহাতে অবিবাস ...	২১৭

কাক্তন।

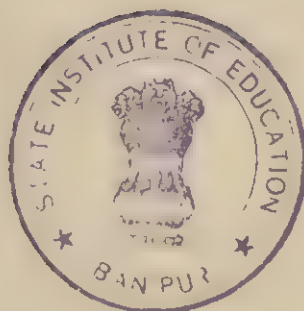
গেওয়ারিয়ার সিদ্ধ ফকিরের আশ্রম কথ্য ...	২২০
রমণীর বুড়োশিষ্যের কৃপা।	
ঠাকুরের পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা ...	২২২
আদেশপালনে অসমর্থতা; ...	
ঠাকুরের সহায়ভূতি ও উপদেশ ...	২২৪
সাধুর প্রতি অন্যদের ও উৎপীড়নে বিপত্তি ...	২২৬
স্বপ্ন—কর্ণের উপদেশ ...	২২৭
স্বপ্ন—প্রলয়ের দৃশ্য ...	২২৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
স্বপ্ন-ঠাকুরের দেহত্যাগের উদ্বোধন ...	২২২
কৃপণতার অনুশাসন।	
ঘরখানী উইল করবে কার নামে? ...	২৩০
আমার সঙ্কীর্ণতা।	
ঠাকুরের উপদেশ ও ভিক্ষার ব্যবস্থা ...	২৩১
প্রথম ভিক্ষা ঠাকুরের হাতে; এ কি চমৎকার ...	২৩২
চৈতন্য।	
সেবা-ভক্তিতে বিগ্রহ জাগ্রত হন ...	২৩৪
কোশলের দান; অনুতাপ ...	২৩৫
হুদিনে ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি ...	২৩৭
অবিবাস; সাধনে অভিমান; অনুশাসন ...	২৩৯
পরিবেশনে একটি। তীর্থপর্যটনের নিয়ম ...	২৪০
যোগসঙ্কট ...	২৪১
প্রকৃতির গলপ বাক্যকে প্রকাশ। উপদেশ ...	২৪৪
বৃষ্টিসময়ের তর্পণ; ঠাকুরের কৃপা ...	২৪৫
মাথকের মাদক ব্যবহার; গাঁজার ধূঁয় দগ্ধমহাবিজ্ঞা ...	২৪৬
দয়া ও সহায়ভূতিতে সাধারণ নীতি টেকে না ...	২৪৮
গুরাশক্তির ও ঠাকুর ...	২৫০
ঠাকুরের স্বপ্ন; সাধুতে বিশ্বাস ...	২৫০
মহাভাপুরুষের চামারীবৃত্তি ...	২৫৩
কুলগুরু, গ্রন্থগুরু, জীগুরু, সিদ্ধগুরু এবং সদ্গুরু সম্বন্ধে ...	২৫৪
নানাবিধ প্রমোক্তর ...	২৫৪
সাধনচেষ্টাই উন্নতির সোপান; নৈরাশ্রের ভরসা ...	২৫৮

চিত্রসূচী

১। শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুচক্র গোখারী ...	১
২। শ্রীযুক্তেশ্বরী মাঠাকুরণ শ্রীশ্রীযোগমারী দেবী ...	৮০
৩। শ্রীশ্রীগোখারী শ্রীভূর শাস্তিপুরস্থ বাটী ...	১০৮
৪। বাবলায় শ্রীশ্রীঅষ্টৈত প্রভুর ও তাঁহার ...	
অতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের মূর্তি ...	১১০
৫। বাবলায় শ্রীমন্দির সমুৎখর নাটমন্দির ...	১১২
৬। শ্রীশ্রীশ্রীমহেশ্বর জীউর মন্দির ...	১২০

১। শ্রীশ্রীশ্রীমহেশ্বর জীউ ...	১২২
৮। কালনার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম ...	১২৪
৯। নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর আশ্রম ...	১৩২
১০। শ্রীকালপুরের গোখারী শ্রীভূর মাতুলালয় ...	১২০
১১। মাতুলালয় সংলগ্ন কচুবন ...	১২২
১২। শ্রীমহাশ্রীভূর পুরান চিত্রপট—ভাবাবেশে নৃত্য ...	১২৮
১৩। শ্রীকলানন্দ ব্রহ্মচারী ...	২৬০





শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ



শ্রীশ্রীমদগুরুদেব

তৃতীয় অঙ্ক

ঠাকুরের শ্রীবন্দাবন হইতে গেণ্ডারিয়া আগমন ও

আশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা ।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়) ১২৯৬ সনের পৌষ মাস হইতে শ্রীবন্দাবনধামে বৎসরাধিক কাল বাস করিয়াছিলেন । এই স্থানে মাঠাকরণ (শ্রীমতী যোগমায়া দেবী) ১২৯৭ সনের ১০ই ফাল্গুন তারিখে দেহত্যাগ করেন । ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ঠাকুর তাঁহার স্বশ্রদ্ধাচাকুরাণী (শ্রীযুক্ত মুক্তকেশী দেবী), তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী, কন্যা কুতূবুড়ী (শ্রীমতী প্রেমসখী) এবং আমাদিগের অগ্রাগ্র কয়েকটি গুরুভ্রাতাভগিনীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবন্দাবন হইতে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় উপস্থিত হইলেন । সে স্থানে যাইয়া তিনি অল্প কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করেন এবং যোগজীবনের দ্বারা মাঠাকরণের অস্থি ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করিয়া ঢাকার দিকে গেণ্ডারিয়া যাত্রা করেন ।

কিছুদিন পূর্বে ঠাকুর আমাকে জানাইয়াছিলেন, “শীঘ্রই আমি গেণ্ডারিয়া যাইতেছি । সুবিধা বোধ করিলে এখন হইতেই তুমি সেখানে থাকিতে পার ।” কোন্ দিন কোন্ সময়ে ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিবেন, আমার কিছুই জানা ছিল না । আমি সাতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত বাঙ্গীতে থাকিয়াই, ঠাকুরের ঢাকা আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম । আশ্চর্য্য এই যে, অকস্মাৎ ১৩ই চৈত্র ঠাকুরের জন্ম আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল । আমি অমনি এক মাসের মত আহারের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ছোট দাদার (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) সঙ্গে ১৪ই চৈত্র গেণ্ডারিয়া আসিয়া পহুছিলাম । শুনিলাম ঠাকুর গত কল্যাই এখানে আসিয়াছেন ।

প্রায় দুই বৎসর পরে ঠাকুর ঢাকা পহুছিতেছেন, সর্বত্রই এ কথা ইতিপূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল । সুতরাং নানাহান হইতে গুরুভ্রাতাভগিনীগণ ঠাকুরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন । ঠাকুরের গেণ্ডারিয়া পহুছিবার পরদিন হইতেই দীক্ষাশ্রোত চলিয়াছে । চৈত্র

মাসের বাকি কয়দিনে কত লোক যে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিলেন বলিতে পারি না। বরিশাল, ফরিদপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গুরুভ্রাতাদিগের সমাগমে এখন আশ্রমে আর স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না। আশ্রমসংলগ্ন আমাদিগের সতীর্থ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ, শশীবাবু ও সতীশবাবু প্রভৃতির বাড়ীও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে ঢালা বিছানা করিয়া এবং ঐ ঘরের ছুঁদিকের বারেন্দায় চাটাই মাত্র বিছাইয়া, বহু অবস্থাপন্ন এবং সম্ভ্রান্ত গুরুভ্রাতৃগণ রাত্রি যাপন করিতেছেন। ঠাকুর পুর্বের ঘরে আসন করিয়াছেন। সেখানেও কয়েকজন গুরুভ্রাতা রাত্রিতে থাকেন। ছোট দাদা, কুঞ্জবিহারী গুহ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমি কোথাও স্থান না পাইয়া অগত্যা ভাণ্ডারঘরের এক কোণে কোনও মতে রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি।

রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই খোল করতাল বাজিয়া উঠে। গুরুভ্রাতারা সকলে মিলিত হইয়া ভোর-সন্ধীর্জন আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিন চারি জন গুরুভাই বাঁটা লইয়া সমস্ত আশ্রম ঝাড়ু দিতে থাকেন। কেহ কেহ গোবর জল লইয়া আমতলা, ঠাকুরের আসনকুটীর, আশ্রমের উঠান ও ঘরের চারিদিকের পিড়া ও বারেন্দা সূর্যোদয়ের পূর্বেই লেপিয়া রাখেন। গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই আপন আপন ঋচি-অনুযায়ী ঠাকুর-সেবার কোনও না কোনও কার্য লইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন। মহাসমারোহের পূজা বা মহোৎসবাদি ব্যাপারে দিনটি যে ভাবে আনন্দ উৎসাহে চলিয়া যায়, আমাদেরও সকলের সেই ভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু ঠাকুরের জোষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিস্বধা, কয়েকমাস পূর্বে তাঁহার পুত্র (দাউজী) জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইতেই অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, এখন মাতৃবিয়োগ সংবাদ পাইয়া, একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দিদিমা কন্যা বিয়োগে অতিশয় শোকাতুরা হইলেও, গুরুভগিনীদের সহিত সকাল বেলা এগারটা পর্য্যন্ত আশ্রমস্থ সকলের আহারের বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। যোগজীবনের জ্ঞান পঞ্চাশ ষাট জন লোকের রান্না প্রতিদিন অবাধে দু'বেলা প্রফুল্লমনে স্চারুপে করিয়া যাইতেছেন দোখয়া সকলেই অবাক হইতেছি।

সকালে ৭টার সময় ঠাকুরের চা সেবা হয়, পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শিখগুরুদিগের উপদেশ ও ভজন-সম্বলিত “গ্রন্থসাহেব” প্রভৃতি পাঠ হইয়া থাকে। বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত প্রত্যহই ঠাকুরের ঘর লোকে পরিপূর্ণ থাকে। আহারের পরে মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আসন আমতলায় লইয়া যাওয়া হয়। অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত ঠাকুর কাহারও সহিত বড় কথাবার্তা বলেন না—ধ্যানস্থই থাকেন। স্তবরাং অধিকাংশ গুরুভ্রাতারাই এই সময়ে আপন আপন স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করেন। নিয়ত একটি লোক ঠাকুরের নিকটে থাকা আবশ্যক বলিয়া, আমিই পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়া থাকি। ১লা বৈশাখ (১২৯৮ সন) হইতে আহারান্তে ঠাকুর আমাকে প্রত্যহ তাঁহার নিকটে ৭কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। পাঠের সময় গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আমতলায় উপস্থিত

হইয়া থাকেন ; কিন্তু পাঠান্তে সকলেই চলিয়া যান। স্ততরাং অপরাহ্ন পাঁচটা পর্যন্ত আমতলা প্রায় নির্জনই থাকে। পাঁচটার পর ধীরে ধীরে আমতলা লোকে পরিপূর্ণ হয়। আগিও এই সময়ে ঠাকুরের আদেশাঙ্কুযায়ী আমার আহারীয় প্রস্তুত করিবার জন্ত চলিয়া আসি। পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠাকুর স্বচ্ছন্দভাবে সকলের সঙ্গে শাস্ত্র, সদাচার, ধর্ম, সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপাদি করিয়া থাকেন ; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পরে সমস্ত গুরুভ্রাতারা একত্রিত হইয়া বহু খোল করতাল সংযোগে উচ্চসঙ্গীতন আরম্ভ করেন। এই সঙ্গীতনের চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। খোল করতালের ধ্বনি সঙ্গীতনের রবে মিলিত হইয়া আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলে। মহাভাবের তরঙ্গ প্রবল বেগে ঘন ঘন উঠিয়া আশ্রমস্থ সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল কি ভাবে যে চলিয়া যায় কিছুই আমাদের লক্ষ্য থাকে না। সঙ্গীতনান্তে ঠাকুর সন্দেশ, বাতাসা, পেঁড়া, বরফি প্রভৃতি মিষ্টান্ন স্বয়ং নিবেদন করিয়া হরির লুট দিয়া থাকেন। তৎপরে সকলে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলে, ঠাকুর আহাৰান্তে দুই এক ঘণ্টাকাল উপস্থিত শিষ্যগণের সহিত কথাবার্তা বলিয়া অবশিষ্ট রাত্রি প্রায় চারিটা পর্যন্ত একভাবে ধ্যানস্থ অবস্থায় কাটাইয়া দেন ; অতঃপর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করেন। আশ্রমস্থ সকলের এই ভাবে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে।

বৈশাখ, ১২৯৮ সাল।

গঙ্গার প্রসূর—গৌরীশঙ্কর।

আজ মহাভারতপাঠান্তে অপরাহ্নে আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে গুরুভগিনী এই বৈশাখ, ত্রীযুক্তা মনোহরা দিদি আসিয়া তাঁহার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা ঠাকুরকে বলিলেন ; গুরুবার। শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। মাঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে, মনোহরা দিদি ৩৩ব্রন্দাবনে গিয়াছিলেন। গত চৈত্র মাসের প্রারম্ভে ঠাকুর যখন হরিদ্বারে পূর্ণকুণ্ডমেলায় যান, অন্ত্যান্ত গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে মনোহরা দিদিও তথায় গিয়াছিলেন। হরিদ্বারে গঙ্গাগর্ভে ও বালিচড়ায় সুন্দর সুন্দর অসংখ্য প্রসূরখণ্ড দেখা যায়। স্থগোল শুভ্রবর্ণ প্রসূরককরে লাল, নীল, সবুজ ও কাল রঙের চক্র, মালার মত অতি পরিপাট্যরূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। স্নানের সময়ে মনোহরা দিদি একদিন নানা রঙের চক্রবিশিষ্ট একখানা গোলাকার শিলা তুলিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি গেণ্ডারিয়াতে আসিয়া, এই প্রসূরখণ্ড শয়নের ঘরে টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন ; কিন্তু সম্প্রতি এই প্রসূরখণ্ড লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, “হরিদ্বার হইতে আসিবার সময়ে সুন্দর একখানা সাদা স্থগোল চক্রধারী পাথর আনিয়াছিলাম, এত দিন উহা টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়াছি ; জানি না,

কেন উহাতে সময়ে সময়ে মহাদেব ও ভগবতী দেখিতে পাই। গত রাত্রে আবার শুনিলাম। প্রস্তরখানি আমাকে বলিতেছেন, ‘গঙ্গাতে বড় আনন্দে ছিলাম, এ অবস্থায় আমাকে এখানে আনিয়া রাখিলে কেন? আমার ক্লেশ হইতেছে।’—এরূপ দেখি শুনি কেন বুঝিতেছি না। ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন “হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরকে গৌরীশঙ্কর বলে। মহাদেব ও পার্বতী উহাতে অবস্থান করেন; পূজা না ক’রে এ শিলা রাখতে নাই।”

দিদি প্রস্তরখণ্ড আনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, “ভাই, এই পাথর আমি আর রাখতে পারব না, তুমি এটি নিয়ে যা হয় কর।” আমি প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া দিলাম। বাড়ীতে গোপাল ঠাকুর আছেন, এই প্রস্তরখণ্ডও সেই সঙ্গেই পুজিত হইবে।

গোবর্দ্ধনের শিলা—গিরিধারী গোপাল।

হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরে মহাদেব ও ভগবতীর প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা শুনিয়া, শ্রীবৃন্দাবন-ধামের আর একটি আশ্চর্য ঘটনার বিষয় মনে হইল। ঠাকুরের সঙ্গে যখন আমরা শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, তখন একদিন গুরুভ্রাতা স্বামিজী* গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন। ইনি পূর্বেই শুনিয়াছিলেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারী গোপাল রূপে এ পাহাড়ের প্রত্যেক খণ্ড শিলাতেই জাগ্রতরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার সময়ে বাঘ খণ্ড ছোট ছোট স্তম্ভের শিলা তাঁহার ঝোলাতে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। ভ্রজবালীরা গোবর্দ্ধনের শিলা অগ্ন্যত্র লইতে দেন না, এই ভ্রজ স্বামিজী শিলা কয়টি গোপনে সংগ্রহ করিয়া ঝোলার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুরের পার্শ্বের ঘরেই গুরুভ্রাতা শ্রীধরের শয়নঘর ছিল; স্বামিজীও শ্রীধরেরই এক পাশে আসন রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ঝোলা-ঝুলি সর্বদা ঐ আসনের উপরেই পড়িয়া থাকিত। একদিন স্বামিজী খুব প্রত্যাষেই কুঞ্জ হইতে পরিক্রমায় বাহির হইলেন। শ্রীধর মধ্যাহ্নে আহা়াস্তে আপন আসনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, স্বামিজীর আসনের উপরে কয়েকটি বালক খেলা করিতেছেন।

* স্বামিজী—শ্রীহরিমোহন চৌধুরী—বাড়া ধামরাই, জেলা ঢাকা। ইনি বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াই, কিছুকাল ঢাকা গভর্ণমেন্ট কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা কাঁচা করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতে ইঁহার ধর্মোন্মত্ততা ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। অল্প বয়স হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রকৃত ধর্ম জীবনে লাভ করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। স্বামিজীর মুখে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, একদিন নিভৃতকালে অতি নির্জন স্থলে আত্মহত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অকস্মাৎ ঠাকুর উহাকে দর্শন দিয়া আশ্বাসিত করিলেন। ঠাকুরের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরেই, স্বামিজী সরকারি চাকরিটি ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ঠাকুরের নিকটে সম্যাস গ্রহণ করিয়া উদাস ভাবে নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার অসাধারণ বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনের অদ্ভুত ঘটনা সকল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আমার পূর্ব তিন বৎসরের ভায়েব্রীতে বিবৃত রহিয়াছে।

তঁাহারা শ্রীধরকে বলিতে লাগিলেন, “গোবর্দ্ধনে আমরা বেশ আনন্দে ছিলাম, আমাদের এখানে এনে অনর্থক কষ্ট দিচ্ছ ? স্নান করাও না, খাবার দেও না, এ ভাবে আর কতকাল আমাদের এখানে রাখবে ?” এই কথা কয়টি বলিয়া বালকগণ অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। শ্রীধর জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া চমকিয়া গেলেন। কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

ঠাকুর শ্রীধরকে বলিলেন—“খাবার কিছু মিষ্টি আর পরিষ্কার এক ঘটা জল এক্ষণি এনে গিরিধারী গোপালদেবের নিবেদন করে দাও। হরিমোহনের বোলার ভিতরে গোবর্দ্ধনের শিলা আছে, অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবে।”

শ্রীধর তখনই স্বামিজীর বোলা খুলিয়া বারখণ্ড শিলা দেখিয়া অবাক হইলেন ; অবিলম্বে খাবার আনিয়া গিরিধারী গোপালদিগকে নিবেদন করিয়া দিলেন। স্বামিজী সন্ধ্যার সময়ে কুঞ্জে আসিলে ঠাকুর ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তঁাহাকে বলিলেন—“রীতিমত সেবা করতে না পারলে, এ সব শিলা আনতে নাই ; কালই ভোরে গোবর্দ্ধনে গিয়ে রেখে এসো।”

স্বামিজীও পরদিন প্রত্যুষেই বোলা লইয়া গোবর্দ্ধনে চলিয়া গেলেন। শিলার মাহাত্ম্য ভাবিয়া তিনি সমস্ত রাত্ৰা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। সমস্তগুলি শিলা কিছুতেই তিনি রাখিয়া আসিতে পারিলেন না। দশখণ্ড গোবর্দ্ধনে রাখিয়া, অবশিষ্ট দুই খণ্ড কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং কিছুকাল উহাদের সেবা পূজা করিয়া, একখণ্ড সতীশকে দিলেন। সতীশ প্রতিদিন খুব শ্রদ্ধার সহিত উহা পূজা করিয়া আসিতেছেন। স্বামিজী অবশিষ্ট শিলাখণ্ড সোনার মাতুলীতে ভরিয়া, দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়াছেন এবং জল ও তুলসীর দ্বারা প্রত্যহ তঁাহার পূজা করিয়া থাকেন।

* সতীশের প্রতি নায়াচক্রীর উৎপীড়ন।

আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় বসিলে, আমিও তঁাহার নিকট আর আর দিনের মত দুই ঘণ্টাকাল এই বৈশাখ, মহাভারত পাঠ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীধর ও সতীশ আসিয়া ১২শে এপ্রিল, রবিবার। তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ধ্যানমগ্ন ছিলেন ; একটু পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে, উহাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন।

* সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বাড়ী ঢাকা, বাঘিয়াগ্রামে। ইঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল না থাকায়, পাঠ্যবস্থায় অনেক ক্লেশ পাইয়াছিলেন। নানা দুরবস্থা ভোগ করিয়াও নিজ অধ্যবসায়েরূপে ইনি এট্রেন্স ও এক্. এ. পরীক্ষায় গভর্নমেন্টের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বি. এ. পরীক্ষা পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আকস্মিক কোন কারণে পরীক্ষা দিতে বিঘ্ন ঘটিল। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ইঁহার সুন্দর দখল ছিল। পঠদশার প্রারম্ভেই সতীশের ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। উপাসনাশীল, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মদের সঙ্গলাভ করিয়া ইঁহার ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগ

ঠাকুর সতীশকে বলিলেন—“সতীশ, শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে রাস্তায় নাকি তুমি মায়াচক্র দেখেছিলে? ঘটনাটি তোমার মুখে শুনি নাই, বল না শুনি।”

ঠাকুর কোনও কথা সতীশকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই, সতীশ আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়েন। ঠাকুরের আদেশ পাইয়া, সতীশ আজ খুব উৎসাহের সহিত হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—“পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমার মন অতিশয় খারাপ হইয়া গেল। আমি চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সকলই অসার ভাবিয়া তখনই (হেডমাষ্টারী) চাকরীটি ছাড়িয়া দিলাম ও পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। আপনি শ্রীবৃন্দাবনে আছেন জানিয়া, আপনার সঙ্গে থাকিব সঙ্কল্প করিয়া চলিলাম। আমি সমস্তিপুর হইতে রওনা হইয়া পথে এলাহাবাদের নিকটে একস্থানে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। তাঁদের সঙ্গে কিছু সময় আমার থাকিতে ইচ্ছা হইল। একটি খুব তেজস্বী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং আলাপাদি করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা জানিয়া নিলেন। ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াও উদাসভাবে বাহির হইয়াছি জানিয়া সাধু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সাধু আমাকে বলিলেন—“তোমরা মন হোয় তো কয় রোজ ইহাই রহে।” রাস্তার ক্রেশে শরীর আমার খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; সাধুও আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। ইহা ভগবানেরই কৃপা ভাবিয়া, দুই চার দিন সাধুর নিকটেই থাকিব স্থির করিলাম। কয়েকদিন থাকিয়া আমি একদিন শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তখন সাধু আমাকে বলিলেন, “আরে, কাঁহা যাওগে? হামারা সাংখ্‌ই রহে, খোড়া রোজ্‌মে সিদ্ধ ব্‌ যাওগে।” আমি সাধুকে বলিলাম, “মহারাজ, আপ্‌ সিদ্ধ হাঁয়?” সাধু খুব তেজের সহিত আমাকে বলিলেন, “তব্‌ ক্যা! তোম্‌ হামকো ক্যা সম্‌ঝা?” আমি বলিলাম, “আচ্ছা, আপ্‌ হামকো কুছ সিদ্ধাই দেখলানে সেক্‌তে?” সাধু বলিলেন “হাঁ, দেখোগে?” এই বলিয়া সাধু আমার কপালে তাঁর কয়েকটি অঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনটি তুড়ি দিয়া

জন্মে এবং উপরীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে সতীশের সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, উপাসনার ভাব ও অসাধারণ উৎসাহ উত্তম দেখিয়া অনেক সময় আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইনি বাহা সত্য বুঝিতেন, লঘু গুরু অপেক্ষা না করিয়া এবং কোনও দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাই বলিতেন ও করিতেন। একজ্ঞ আমরা উহাকে পাগলা সতীশ বলিয়া ডাকিতাম। ১২৯৭ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন। ঠাকুরের সঙ্গে ইনি পুরী গিয়াছিলেন।

অচিরে ঠাকুর কলেবর পরিত্যাগ করিবেন জানিতে পারিয়া, সতীশ শ্রীশ্রীজগদগুরুদেবের চরণে করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে প্রার্থনা করিলেন, বেন তৎপূর্ব্বেই উহার দেহত্যাগ ঘটে। ঐ সময়ে ঠাকুরের নিকটেও নিজের প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতি কাতরপ্রাণে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর একদিন সতীশকে বলিলেন, “জগদগুরুদেব তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।” ইহার কয়েক দিন পরেই, মাত্র দুই দিনের জন্মে, “ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগদ্বাত্রীপূজার দিনে, রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় সতীশ নিজ অধিলবিত শ্রীধাম প্রাপ্ত হইলেন। ইহার জীবনের অতি অদ্ভুত ঘটনাসমূহ আমার পূর্বাগর ভায়েরীতে লিখিত আছে।

বলিলেন, “আব্ মায়াচক্র দেখো।” ঐ সময়ে আমি কেমন যেন হইয়া গেলাম; আমার এক অভূত অবস্থা হইল। আমি অলৌকিক দৃশ্য সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্রাকারে ঘুরিতেছে, শত শত গ্রহ উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে; তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। অসংখ্য জীব জন্তু মায়াচক্রে পড়িয়া স্বর্গে যাইতেছে, আনন্দ করিতেছে, আবার ক্রমে ক্রমে তাহারা ই ঘুরিতে ঘুরিতে শত শত ভীষণ নরককুণ্ডে আসিয়া পড়িতেছে—চীৎকার করিতেছে, দগ্ধ হইতেছে। তিন দিন তিন রাত্রি এই মায়াচক্রে কত কি যে দেখিলাম বলিতে পারি না। এই সমস্ত দেখিয়া কখনও বা আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছি, কখনও বা ভয়ে জড়সড় হইয়াছি। যতক্ষণ মায়াচক্র দেখিলাম, ততক্ষণ ইষ্টমন্ত্র একবারের জ্ঞাপ্ত আমার স্মরণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ চতুর্থ দিনে যেমনই আমার ইষ্টনাম মনে পড়িল, মায়াচক্র অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই অভূত ঘটনায় সাধুকে আমি একটি অসামান্য সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিলাম, এবং সন্ন্যাসীর অল্পগ্রহ হইলে আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলাম। তিনিও আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে থাকিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন। ইচ্ছামাত্রই সন্ন্যাসী আমাকে অনায়াসে সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, এই বিশ্বাসে আমি তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কয়েকদিন সেখানেই রহিলাম।

একদিন সকালে সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন—“চলো, ইহা আউর নেহি রহেঙ্গে।” বলিবারাত্র আমিও সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। সন্ন্যাসী নিজের আসন গুটাইয়া অন্ত্রাণ্ড জিনিসের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি বোঝা সাজাইয়া, আমার ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া চলিলেন। আমিও তাহা লইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কতক্ষণ পরে আমরা একটি প্রকাণ্ড ময়দানের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ময়দানটি এত বড় যে, তার অপর পার ধু ধু দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী বলিলেন যে, ময়দানটি পার হইয়া যাইতে হইবে। বেলা তখন প্রায় দশটা, সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ময়দানের উপর দিয়া চলিলাম। সঙ্গে আমাদের আর একটি লোকও নাই, ময়দানও জনমানবশূন্য, ধু ধু করিতেছে। সন্ন্যাসী খুব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বিষম ভারী বোঝা ঘাড়ে লইয়া ভয়ঙ্কর রোজে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলাম। দুর্বল শরীরে ঐরূপ পরিশ্রমে আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসীকে আমি একটু ধীরে ধীরে চলিতে বলায়, তিনি বিরক্ত হইয়া খুব কর্কশ স্বরে বলিলেন—“আরে চল্।” আমি তখন ভাবিলাম, ‘এ আবার কেমন সাধু! ক্রেশে আমার প্রাণ যায়, একটু দয়া হইতেছে না!’ আবার ভাবিলাম—‘ইনি তো সিদ্ধ পুরুষ। বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন।’ ইহা ভাবিতেই মনে উৎসাহ আসিল, কিছুক্ষণ আবার খুব চলিলাম, পরে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন বোঝাটি কত ভারী তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“মহারাজ, যব্ হাম্ নেহি থে, তব্ কোন্ এত্না বোঝা লে যাতে রহে?” সাধু বলিলেন—“আরে হামারা ভূত সিদ্ধ্ হায়, হামারা সব্ চিজ্ ওহি লে যাতে।” সাধুর কথা শুনিয়া

আমার মাথা গরম হইল, বিষম রাগও হইল, অমনি মাথার বোঝাটি ছুড়ম করিয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, “আরে শালা, ভূতের বোঝা আমার ঘাড়ে ?” সাধুর অনেক জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সাধু দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং কুৎসিত গালি দিতে দিতে চিম্টা তুলিয়া আমাকে মারিতে দৌড়াইয়া আসিলেন। আমার তখন আবার মনে হইল, ‘ইনি তো মহাপুরুষ, ইহার প্রহারে আমার কল্যাণই হইবে।’ স্বতরাং না দৌড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সাধুও প্রকাণ্ড লোহার চিম্টাধারা সজোরে আমাকে পটাপট আঘাত করিতে লাগিলেন। আমার তখন মনে হইতেছিল, ‘ভিতরে আমার বিষম রিপূর উজ্জ্বলনা, সাধু দয়া করিয়া সেই রিপুগুলিকেই তাড়াইয়া দিতেছেন ; স্বতরাং সাধু যেমন পটাপট আঘাত করিতে লাগিলেন, আমিও তেমনি এক, দুই, তিন, চার করিয়া গণিতে লাগিলাম। ক্রমে ছয়টি ঘা মারিয়া সাধু যখন সপ্তম ঘা আমাকে হাঁকিলেন, তখন আমি “দূর শালা ! রিপু তো ছয়টা” এই বলিয়া দৌড় মারিলাম। সাধু গালি শুনিয়া আরও রাগিয়া গেলেন ; চিম্টা তুলিয়া বিষম যমদূতের মত আমার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। এবার আমাকে পাইলে সাধু খুনই করিবেন নিশ্চয় বুঝিয়া, আমি প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। সাধু আমাকে ধরে ধরে অবস্থা দেখিয়া, প্রাণ বাঁচাইবার অগ্র উপায় না পাইয়া, সম্মুখে একটা জঙ্গলাকীর্ণ পুরাতন কূপ দেখিয়া তাহাতেই লাফাইয়া পড়িলাম। সাধু আর কি করিবেন ! চলিয়া গেলেন। কূপে জল খুব অল্প ছিল, কিন্তু উঠিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া উহার মধ্যেই পড়িয়া রহিলাম। চিম্টার আঘাতে নানাস্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। তখন এত কষ্ট হইতেছিল যে মনে হ’ল বুঝি মারা পড়িলাম। এবার নিশ্চয় মৃত্যু ভাবিয়া, একান্ত মনে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছুকাল পূর্বে, কয়েকটি রাখাল ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা কাপড়ে কাপড়ে বাঁধিয়া নীচে নাগিয়া অনেক চেষ্টায় আমাকে উপরে তুলিল। আমার চলিবার সামর্থ্য ছিল না বুঝিয়া, সকলে আমাকে কাঁধে তুলিয়া ময়দানের একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে রাখিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে তাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার খবর তাহারা কোথায় পাইল ? একজন বলিল, “সাধুর তাড়াতে যখন তুমি দৌড়িয়া কূপাতে লাফাইয়া পড়িলে, তখনই আমরা বহুদূর হ’তে দেখিতে পাইয়াছিলাম।” এই বলিয়া উহারা চলিয়া গেল। আমি গাছতলায় পড়িয়া রহিলাম। সাধুর প্রহারে শরীর আমার এত খারাপ হইয়াছিল যে, বিষম জ্বর হইল। দুইদিন পর্যন্ত আমার পাশ ফিরিবার সামর্থ্য ছিল না। সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় ও শরীরের যন্ত্রণায় এত অসহ্য ক্লেশ হইতে লাগিল যে, মনে হইল এবার বুঝি প্রাণই যায়। মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া সম্মুখের গাছটিকেই জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম—“হে বৃক্ষ, আমার প্রাণ যায়, এ সময়ে একটি ফল দিয়া আমাকে বাঁচাও।” এই প্রার্থনা করিয়া বারংবার বৃক্ষটিকে নমস্কার করিতে লাগিলাম। ভগবানের কি অদ্ভুত দয়া ! হঠাৎ ঐ সময়ে টপ করিয়া একটি ফল আমার সম্মুখে পড়িল। ফলটি লাল, গোল, শ্রীফলের মত বড়, দেখিতে ঠিক

মাকাল ফলের ছায়া। আমি উহা পাইয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। একটু স্থির হইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া উহা খাইলাম। ঐরূপ ঠাণ্ডা সুমিষ্ট ফল জীবনে আর কখনও আমি খাই নাই। ফলটি খাওয়া মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে আমার শরীরের সমস্ত গ্রানি দূর হইল। শরীরটি নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ফলটি কোথা হইতে আসিল অসুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, একটি ফল বা ফুলও বৃক্ষে নাই। গাছটি ঝাপসা, বট গাছের মত। ফলটি খাইয়া এত সুস্থ হইলাম যে, অনায়াসে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া একটি গ্রামে পহুছিলাম, কোন কষ্টই আমার বোধ হইল না। তার পর সেই সাধুকে আর আমি দেখিতে পাই নাই।

ঠাকুর বলিলেন—“তাকে আর দেখবে কি? সে ঐ দিনেই সমস্ত হারায়েছে। তার সিদ্ধি-শুদ্ধি সমস্ত ছুটে গেছে, এখন পাগলের মত সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দিন রাত যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এখন আর তার কিছুই নাই, সমস্ত নষ্ট হ’য়ে গেছে।”

এ সব শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“সিদ্ধ হ’য়েও, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় নাকি?” ঠাকুর বলিলেন—“তা হয় না? সিদ্ধ হ’লেই সে ধার্মিক হ’ল নাকি? সিদ্ধ বলতে তোমরা কি মনে কর? ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যসিদ্ধ, সিদ্ধ তো কতই আছে! ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রব না রেখেও, লোকে কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছে। সিদ্ধ হ’লেই সে ধার্মিক হবে, ইহা কখনও মনে ক’রো না। আজকাল সিদ্ধ লোকের অভাব নাই।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“ভূতপ্রেতসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে ধার্মিক লোক নাই কি?”

ঠাকুর—“এ সব সিদ্ধদের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয় না।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“ঋহারা ভূতপ্রেতসিদ্ধ, ঠাহারা কি দেবদেবীর রূপও দর্শন করাইতে পারেন?”

ঠাকুর—“সকলেই যে পারেন তা নয়, তবে কেহ কেহ পারেন। এবার শ্রীবন্দাবনে একটি সাধু এসেছিলেন, তিনি চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাতে পারতেন। তিনি ভাল লোক ছিলেন।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“সে কি রকম বিষ্ণুমূর্ত্তি?”

প্রেতের বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ—তৎসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

ঠাকুর—“একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হ’লে তিনি আমাকে বল্লেন, ‘কাল সকালে একা আপনি আসবেন, আপনাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাব।’ আমি পরদিন প্রত্যুষে সাধুর কাছে গেলাম; তিনি আমাকে বসতে দিয়ে সম্মুখের ঘরে দৃষ্টি রাখতে বল্লেন। আমি সেই ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখে ব’সে রইলাম। সাধু আমার কাছে ব’সে জপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, সুন্দর পরিষ্কার চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন হ’লেও

তেমন একটা ভাব ভক্তির উদয় হ'ল না দেখে, সন্দেহ হ'ল। আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, শ্রীবৎসচিহ্ন বা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ওতে কিছুই নাই। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে নাম করতে লাগলাম। তখন ঐ মূর্তি থরথর কাঁপতে লাগল এবং বাবাজীকে বললে, 'তুই আমাকে কার কাছে এনেছিস, আমি যে টিক্তে পারি না;' এই ব'লে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাটিতে প'ড়ে গিয়ে চিঁ চিঁ ক'রে চীৎকার করতে লাগল। সাধু তখন অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে বল্লেন—'ছোড়্ দিজিয়ে মহারাজ। ছোড়্ দিজিয়ে।' আমি বললাম—“আমি তো ধ'রে রাখিনি?” সাধু বল্লেন, 'আপ' যো নাম করতে হাঁয়, ওহিসে বান্ধা গিয়া।' ঐ সময় দেখলাম বিষ্ণুমূর্তি আর নাই, বিকটাকার এক প্রেত মাটিতে প'ড়ে ছটফট করছে। আমি তখন ঐ সাধুকে খুব ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—‘তোমারা কাণমে বিষ্ঠা কাহে রাখা হায়? তোম' প্রেতসিদ্ধ হো?’ সাধু বলিলেন—‘হাঁ, মহারাজ! আপ' ভগবন্ত হায়, হামারা মালুম নেহি থে। হামারা প্রেত ভগবন্তকি সাম্নেমে ঠাহারণে নেহি সেক্তে।' আমি তাকে বললাম—“বিষ্ণুমূর্তি দেখাও ব'লে লোকের নিকট হ'তে প্রতারণা ক'রে তুমি টাকা পয়সা আদায় কর কেন?” সাধু বল্লেন—‘আপনি অনুসন্ধান ক'রলে জানতে পারবেন যে সকলকে আমি এ মূর্তি দেখাই না। যে সকল লোকের অর্থ মদ, বেশ্য ও নানাপ্রকার বিলাসিতায় নষ্ট হয়, এই মূর্তি দেখায়ে কেবল তাদের নিকট হ'তে প্রচুর অর্থ আদায় ক'রে থাকি; কিন্তু ঐ অর্থ হ'তে একটি পয়সাও আমি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করি না। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভিক্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করি। যে সকল স্থানে জলাভাব, ঐ অর্থ দ্বারা সেখানে পুকুর বা ইন্দারা কাটায়ে দিই, দুর্গমস্থলে রাস্তা প্রস্তুত করাই ও দুঃখী দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করি। আপনি আর একে কষ্ট দিবেন না, ছেড়ে দিন।' আমি তখন চ'লে এলাম। আসবার সময় সাধু খুব কাতর হ'য়ে আমাকে বল্লেন, 'যতদিন আপনি শ্রীবন্দাবনে থাকবেন কাহাকেও আমার প্রেতসিদ্ধির কথা বলবেন না।' সাধুর কথামত, যত কাল শ্রীবন্দাবনে ছিলাম কাকেও এ বিষয় বলি নাই, আজই তোমাদের নিকট বললাম। এই সাধু ভাল লোক ছিলেন।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—ভূত প্রেতও যখন বিষ্ণুমূর্তি বা দেব-দেবীর রূপ ধারণ ক'রে দর্শন দিতে পারে, তখন প্রকৃত রূপ এবং কপট রূপ বুঝতে পারব কি উপায়ে?

ঠাকুর বলিলেন—“ঐ রূপের প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সহিত নাম করতে থাকলেই কপট রূপ কখনও টিক্বে না, অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। যথার্থ কোনও দেব-দেবী

দর্শনমাত্রেই ঐ দেব-দেবীর ভাব প্রাণে উদয় হবে। নাম কর্তে কর্তে ঐ রূপটি আরও উজ্জ্বল পরিষ্কার হবে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—উজ্জ্বল পরিষ্কার রূপ তো প্রথম প্রথম প্রেতেও দর্শন হয়েছিল বলিলেন।
যথার্থ রূপ ও কপট রূপের আকৃতিতে কি কোনরূপ বৈলক্ষণ্য থাকে না?

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তাও থাকে। ভূতপ্রেতাদি দেব-দেবীর আকার ধারণ কর্তে পারলেও ঐ সকল দেবদেবীর চিহ্ন ধারণ কর্তে পারে না। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এ সকল যেমন বিষ্ণুর চিহ্ন, সেইরূপ সকল দেব-দেবীরই বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। যখনই যে দেব-দেবীর দর্শন হবে, লক্ষণগুলি তখনই মিলায়ে নিতে হয়। ঐ সময় খুব নাম কর্তে হয়; নাম কর্তে সমস্তই ধরা পড়ে। সতীশ নাম না ক’রেই তো গোলে প’ড়েছিল। নাম কর্তেই মায়াচক্র অদৃশ্য হ’লো, শুনলে তো?”

জিজ্ঞাসা করিলাম—শঙ্খ চক্র বা এরূপ কোন বিশেষ চিহ্ন তো সদগুরুর নাই; স্বতরাং ভূত প্রেত সদগুরুর রূপ ধ’রে এলে, কি প্রকারে তাহা বুঝতে পারব?

ঠাকুর বলিলেন—“ভূত প্রেত কি, দেব-দেবী ঋষি মুনিরাও সদগুরুর রূপ ধারণ কর্তে পারেন না। সদগুরুর রূপ দর্শন হ’লে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই করে না।”

গৈরিক ত্যাগ করিতে বলায়, ঠাকুরের সহিত সতীশের বাগড়া।

সতীশ মায়াচক্রীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অচিরে জীবনাবনে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়
১ ই বৈশাখ, পাগ্লা সতীশের সঙ্গে ঠাকুরের যেরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল, আজ ঠাকুর
২০শে এপ্রিল, বুধবার। তাহা উঠাইয়া শ্রীধরের সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন। পরিধানে ছেঁড়া
গৈরিক বসন—হাতে লম্বা বাঁশের দণ্ড, চেহারা অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, সতীশ ঠাকুরের নিকট দাউজীর
মন্দিরে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামান্তে একটু স্বস্থ হইলে ঠাকুর সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“সতীশ! তুমি গৈরিক নিয়েছ কেন? বীৰ্য্যধারণ না হ’লে গৈরিক নিতে নাই; শাস্ত্রে
নিষেধ আছে; তুমি গৈরিক ছাড়।”

সতীশ বলিলেন—“আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, গৈরিক ও দণ্ড আমার সন্ন্যাসের চিহ্ন, ইহা ছাড়ব
কেন?” শ্রীধর তখন বলিলেন, “সতীশ! গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করিস না, ভয়ানক অপরাধ।”

“সতীশ মাথা বাড়া দিয়া হাত নাড়িয়া খুব তেজের সহিত বলিল, “যা: যা: যা: বেটা! গুরু!
গুরু কে? গুরু তো পরমহংসজী; দীক্ষার সময় উনি তো বলেছিলেন—পরমহংসজী দীক্ষা দিচ্ছেন?
উনিও পরমহংসের শিষ্য, আমিও পরমহংসের শিষ্য। উনি তো আমার গুরুভাই। সাধুসঙ্গ কর্তে
এসেছি।”

ঠাকুর বলিলেন—“তুমি গৈরিক নিয়ে আমার কাছে তো থাকতে পাবে না, অগ্ন্যত্র গিয়ে থাক।”

সতীশ বলিল—“আজ তো আমি আপনার অতিথি।”

ঠাকুর বলিলেন,—“অতিথিরূপে এসেছ? তা হ'লে তোমাকে আর কিছুই বলবার নাই—আজ তবে এখানেই থাক।”—এই বলিয়া ঠাকুর সতীশের আদর যত্ন করিতে আমাদিগকে আদেশ করিলেন। দিন রাত সতীশ আমাদের উপর হুকুম চালাইয়া ও খুব ক্ষুধিত করিয়া কাটাইল। পরদিন সকালে ঠাকুর সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন—“সতীশ! এক তিথির অধিক সময় অতিথির তো থাকবার নিয়ম নাই, এখন তুমি অগ্ন্যত্র যাও।” পাগ্লা সতীশ খুব চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—“তা কেন? শাস্ত্রে আছে, এক রাত্রি কারো সঙ্গে বাস করলেই, সে বান্ধব হয়। স্ততরাং আপনি এখন তো আমার বান্ধব হইয়াছেন, বান্ধবশূন্য হইয়া কারো কোথাও থাকা উচিত নয়। এখন আর অগ্ন্যত্র যাইব না।” এই বলিয়া সতীশ শরীর বাড়া দিয়া আপন আসনে আরো আঁটিয়া বসিল। সতীশকে গৈরিক ত্যাগ করিতে ঠাকুর বিস্তর বলিলেন। কিন্তু সতীশ কিছুতেই উহা ত্যাগ করিল না। শ্রীবৃন্দাবনে পাগ্লা সতীশকে লইয়া এবং শ্রীধরের পাগলামী লইয়া ঠাকুর অনেক সময় আনন্দ করিতেন। ঠাকুর যাহাদের সঙ্গে, এবং দশজনার নিকটে যাহাদের কথা প্রসঙ্গে এরূপ আয়োদ করেন, সেই সতীশ ও শ্রীধরই ধন্ত!

ঠাকুরের প্রতি শ্রীধরের * আকর্ষণ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীধর মাথা গরম হইলে সময়ে সময়ে বিষম পাগলামী করিতেন। এক দিন সামান্য বিষয় লইয়া গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুর সহিত ভয়ানক ঝগড়া বাধিল। শ্রীধর মাথা গরমে কোনও

* শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গার সন্নিকটে সরদি গ্রাম হাঁহর জন্মস্থান। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া কিছুকাল ইনি পুলিশের চাকরী করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ছায়পুরতা ও কার্যদক্ষতা গুণে ইনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাজনক হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই জীবনে ধর্মলাভ করিবার জন্য শ্রীধরের অসাধারণ উৎকর্ষা ছিল। ক্রমে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মদের সঙ্গে লাভ করিয়া হাঁহর ব্রাহ্মধর্মে প্রবল অনুরাগ জন্ম। অচিরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণপূর্বক প্রত্যহ নিয়মিতরূপে আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকালের মধ্যেই ভগবৎকৃপায় শ্রীধরের কয়েকটি অলৌকিক উপলক্ষ ও প্রত্যক্ষদর্শন লাভ হইল। শ্রীধর তাহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মহৎ আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কোন অবস্থাই স্থায়ী হইবে না বুঝিয়া, শ্রীধর সদগুরুর অনুসন্ধান বাহির হইয়া পড়িলেন; এবং অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—“আমি সদগুরুর আশ্রয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা এখানে এসেছি—আপনি দয়া করে আমাকে দীক্ষা দিন।” পরমহংসজী বলিলেন—“সদগুরুর নিকট দীক্ষা নিতে হ'লে, সেই বিজয়ের কাছে যা। * * * *।” শ্রীধর আর শুধানে অপেক্ষা না করিয়া ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রচারকনিবাসে ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

কোনও বার পনের দিন পর্য্যন্ত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য থাকিতেন। কামিনীবাবু শ্রীধরকে ঐ সময়ে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—“সাবধান হও, বাগড়া করলে মার খাবে।” শ্রীধর ঐ কথা শুনিয়াই উর্দ্ধ্বাশ্রিত হইয়া বড় রাস্তায় যাইয়া এক পুলিশের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং খুব ব্যস্ততার সহিত চীৎকার করিয়া পুলিশকে বলিলেন—“বাঁকালা মুল্লুক হ’তে এক ভয়ঙ্কর ডাকাত আসিয়া আমাদের কুঞ্জে রহিয়াছে, সে আমাদের খুন কর্তে চায়—শীঘ্র তাকে ধর, না হ’লে এখনই আমাদের মেয়ে কেটে একাকার করবে।” পুলিশ শ্রীধরের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কুঞ্জে আসিল। কামিনীবাবুকে দেখাইয়া তখন শ্রীধর বলিল—“ইস্কো পাক্‌ড়ো।” এই সময় আর আর ধাঁহার ছিলেন, শ্রীধরকে পাগল বুঝাইয়া পুলিশকে বিদায় করিলেন। ঠাকুর এই ব্যাপার শুনিয়া শ্রীধরকে খুব ধমকাইয়া বলিলেন—“শ্রীধর! এখনই যেয়ে কামিনী বাবুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও, না হ’লে এস্থান হ’তে এ মুহূর্তেই চলে যাও।”

শ্রীধর বলিল—“মারতে যে চায় তার দোষ হলো না! সে ডাকাত নয়! ডাকাতকে পুলিশের হাতে দেওয়াই অপরাধ হ’ল! এজ্ঞা আবার ক্ষমা! আমি ডাকাতের নিকট কিছুতেই ক্ষমা চাইব না।”

ঠাকুর শ্রীধরকে শাসন করিয়া বলিলেন—“এখনি তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও, এক্ষণি যাও।”

দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীধর ঠাকুরের সঙ্গে ছাড়া প্রায় কখনও হন নাই। শ্রীধরের সোজা চাল চলন ও স্বাভাবিক সরলতার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে অতি বিরল। উহার প্রগাঢ় ভক্তনামুরাগ এবং অসাধারণ গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ঠাকুরের অন্তর্কাননের পর শ্রীধরের আনন্দ উৎসাহ একেবারে নিবিয়া গেল। যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন, দীর্ঘনিখাসই উহার নিত্য সহচর ছিল। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—“শ্রীধর, দিন কি ভাবে কাটাও? শ্রীধর বলিলেন, “ভাই! সকাল বেলা থেকে ভাবতে পাকি কতক্ষণে সন্ধ্যা হ’বে, আবার সন্ধ্যা হ’লে ভাবি কতক্ষণে সকাল হ’বে—এই ভাবেই দিন যায়।”

১৩০৯ সালে শ্রীধর কিছুকাল কলিকাতা বাগুড় বাগানে শ্রীশুক্ত জগবন্ধু মৈত্র মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার ত্রয়োদশী তিথিতে অকস্মাৎ অরে পড়িয়া রাত্রি দশটার পর শ্রীধর কয়েকটি গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—“ওহে, তোমরা আমার নিকটে এসো, আজ আমি দেহত্যাগ কর্ণো।” অরের জ্বালায় মাথা গরম হইয়া শ্রীধর ঐ সব বলিতেছেন ভাবিয়া, গুরুভ্রাতারা কেহ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। ভোর বেলা সকলে শ্রীধরের অস্থখের খবর লইতে গিয়া দেখিলেন, শ্রীধর বিছানা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া উঠাভাবে, মাথার দিকে পা এবং পায়ের দিকে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া রহিয়াছেন। পুনঃপুনঃ ডাকিয়া কোন সাড়া না পাওয়াতে সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিল এবং স্পর্শ ও ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল, শ্রীধর চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সরল ভাবে ভূমিসংলগ্ন ললাট এবং অঙ্গলিষক হস্তদ্বয় সম্মুখের দিকে সুপ্রসারিত দেখিয়া ঐ সময় সকলেরই একপ্রকার ধারণা হইল যে, তিনি কাহারও দর্শন পাইয়া তাঁহাকে ষথারীতি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার পবিত্র দেহ সুসজ্জিত করিয়া নিমতলার ঘাটে লইয়া গিয়া অগ্নিসংস্কার করিলেন। শ্রীধর অপুত্রক ছিলেন, নানা স্থানের গণ্যমান্ত গুরুভ্রাতারা সমবেত হইয়া, সঙ্কীর্ণ মহোৎসবে ১১ই মাঘ রবিবার শ্রীধরের পারলৌকিক ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। শ্রীধরের জীবনের অভূত ঘটনাবলি আমার পূর্বাপর ভ্রাতৃত্বের লিখিত রহিয়াছে।

শ্রীধরও ‘এমন সঙ্গে আর কখনও থাকব না - এখনি যাইতেছি’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া শ্রীধর কান্দিতে কান্দিতে কাতর হইয়া ফিরিলেন ও ঠাকুরের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন—“শ্রীধর, গিয়েছিলে তো আবার এলে কেন?”

শ্রীধর হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—“কি কর্ণো! ছেড়ে যে থাকতে পারি না।” ঠাকুর শ্রীধরের কথা শুনিয়া ছল ছল চক্ষে শ্রীধরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—“তবে যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও।” শ্রীধর যাইয়া অমনি কামিনীবাবুর পায়ে পড়িলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। ধন্ত শ্রীধর! অদ্ভুত তোমার গুরুপ্রেম! অদ্ভুত তোমার গুরুর প্রতি আকর্ষণ!

ঠাকুরের উপর সতীশ ও শ্রীধর উভয়েরই অসাধারণ ভালবাসা, প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল; তাই ইহারা সময়ে সময়ে ঠাকুরের সহিত ঝগড়া করিত এবং মনোমত না হইলে ঠাকুরের কথায় প্রতিবাদ বা বিপরীত কার্য্য করিতেও কিছুমাত্র দৃকপাত করিত না। বহুস্থলেই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। শ্রীধর ও সতীশের এইরূপ বাহ্যিক অবাধ্যতা, যে ঠাকুরের প্রতি উহাদের অসামান্য অহুরাগেরই নিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দুর্দশাগ্রস্ত পরশুরামের প্রতি মাধবের কৃপা।

সম্প্রতি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পরশুরাম আসিয়াছেন। ঠাকুর অনেক সময়ে পরশুরামের কথা বলিয়া বৈশাখ, ১১ই—১৫ই, থাকেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে এই পরশুরামের কথা যেমন শুনিলাম, লিখিয়া এপ্রিল, ২০শে—২৭শে। রাখিতেছি—পরশুরাম ধামরাই গ্রামেরই এক জন বেশ অবস্থাপন্ন তাঁতী ছিলেন; তেজারতী কারবারাদিতে গ্রামে দশজনের উপরে বেশ আধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন। আটটি পুলসন্তান—সকলেই উপযুক্ত, বিষয়কার্য্যে খুব দক্ষ এবং উপার্জনক্ষম ছিলেন; ছয়টি কন্যাও ভাল ঘরে সংপাত্রে পরিণীতা হইয়াছিলেন। স্বখে স্বচ্ছন্দে পরশুরাম দিন কাটাইতেছিলেন। অকস্মাৎ দুর্দশা আরম্ভ হইল। অল্প সময়ের মধ্যে দেখিতে দেখিতে আটটি পুত্রই একে একে দেহত্যাগ করিলেন। ক্রিয়ৎকাল পরে পাঁচটি কন্যারও মৃত্যু হইল। একটিমাত্র যুবতী কন্যা বাঁচিয়া রহিলেন; তিনিও দুরদৃষ্টক্রমে বিধবা হইলেন। পরশুরাম কান্দিতে কান্দিতে অন্ধ হইলেন। অতিবৃদ্ধ পতিকে ত্যাগ করিয়া শোকসন্তপ্তা স্ত্রীও ইহলোক হইতে বিদায় নিলেন। বিধবা একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত, পরশুরামের সংসারে আর কেহই রহিল না। পিতার দুরবস্থা দেখিয়া বিধবা কন্যাটি পরশুরামের নিকটে আসিলেন এবং প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই সময় গ্রামের দশটি লোক ধাহারা পরশুরামের নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন, সকলেই অহুমান করিলেন, পরশুরাম অবিলম্বে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া কন্যাকে দিয়া যাইবেন। পাপিষ্ঠ দুর্বৃত্ত দেনাদারেরা একজোট হইয়া অসহায় কন্যাটির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার

আরম্ভ করিল এবং বিষম কৌশল সৃষ্টি করিয়া অকালে বৃদ্ধ অন্ধের একমাত্র অবলম্বন বালবিধবাটির প্রাণ নষ্ট করিল। কত্বে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, পাঁচগুণ এক দিন রাত্রিতে পরশুরামের গৃহে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া কাগজপত্র যাহা কিছু ছিল লুটপাট করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ অন্ধ শূন্য ঘরে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। গ্রামের একটি সামান্য অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ, পরশুরামের হৃদয় দেখিয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু গ্রামের ঐ দুর্বৃত্তদের তাহা সহ্য হইল না। তাহারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিল—‘নির্বংশে লোককে বাড়ীতে নিয়ে স্থান দিয়েছ, শীঘ্রই তুমিও নির্বংশ হ’বে; তোমার সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব রাখিলে আমাদেরও বংশ থাকিবে না। এখনই তোমার বাড়ী থেকে ওকে তাড়িয়ে দেও, না হ’লে সবাই মিলে তোমাকে একঘরে করব।’ ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পরশুরামকে সকল অবস্থা জানাইলেন; পরশুরাম শুনিয়া বলিলেন—‘আমাকে স্থান দিলে আপনি বিপন্ন হইবেন; শীঘ্র আমাকে মাধবের মন্দিরে রাখিয়া আসুন।’ পরশুরামের জেদ দেখিয়া ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীশ্রীমাধবের বাড়ীতেই রাখিয়া আসিলেন। মাধবজীকে যিনি যাহা ভোগ দিতেন, দয়া করিয়া পরশুরামকে প্রসাদের কিছু অংশ প্রদান করিতেন। পরশুরাম তাহাই মাত্র আহাৰ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। পরশুরামের সকল দিকই শূন্য হইল; এখন আর কি লইয়া থাকিবেন! দিবারাত্র কেবল ‘মাধব মাধব’ নামই জপ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অন্ধ পরশুরামের প্রতি দয়ালু মাধবের রূপাদৃষ্টি পড়িল। একদিন মাধব পরশুরামকে বলিলেন—“পরশুরাম! আমাকে তুমি দেখবে?” পরশুরাম বলিলেন—“ঠাকুর! আমি যে অন্ধ!” মাধব বলিলেন—“আচ্ছা, তুমি একবার আমার দিকে তাকাও না!” পরশুরাম মাথা তুলিয়া মাধবের দিকে চাহিতেই দয়ালু মাধবের অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া অমনি মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিন হইতেই আশ্চর্য্যভাবে উহার বাহ্য দৃষ্টিশক্তিও খুলিয়া গেল। পরশুরাম আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া দিনরাত দয়ালু মাধবের নামে বিভোর! পরশুরাম এখন প্রায় সর্বদাই মাধবের দর্শন পান। সকালে বিকালে প্রত্যহ প্রতিঘরে যাইয়া মাধবের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন। গ্রামের সকলেই এখন উহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সম্মান করেন। এখন আর পরশুরামের কেহই শত্রু নাই, পূর্ব শত্রুগণও এখন পরশুরামের রূপাভিধারী এবং একান্ত অহুগত হইয়া পড়িল। এই পরশুরাম এখন আমাদের গোণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আমাদের ঠাকুরকে ‘মাধব’ বলিয়াই ডাকেন; যখন তখন ‘মাধব’, ‘আমার দয়ালু মাধব’ বলিয়া স্তব স্তুতি করেন। পরশুরামের অবস্থা দেখিয়া আশ্রমস্থ সকলেই অবাক হইয়া যাইতেন।

এক সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“পরশুরাম, এখানে এলে কেন?” পরশুরাম বলিলেন—“আজ্ঞা, জান্তে পার্লাম, মাধব গোণ্ডারিয়ায় আছেন।”

প্রশ্ন।—“তুমি বুড়ো মানুষ, রাস্তা চিনে এলে কিরূপে?”

পরশুরাম বলিলেন—“আমি তো আশ্রম চিনি না; ঢাকাতে আসলাম। একটি কালো মেয়ে,

১৪।১৫ বৎসর বয়স, আমাকে বলিল—‘তুমি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যাও তো আমার সঙ্গে এস।’ আশ্রমের কাছে এসে আমাকে বলিল, ‘এই আশ্রম, যাও।’ তার পর আর সেই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না। তখন সকলই বুঝিলাম। সে তো আর মেয়ে নয়! আমি আশ্রমে এসে দেখি—“আমার ‘মাধব’ এখানে।”

পরশুরামের বয়স আশীর উপরে। তিনি সর্বদাই মাধবের নামে দিশাহারা। গুরুভাই শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় আহ্বারের সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“পরশুরাম! ভাল কেমন লাগে?”

পরশুরাম চমকিয়া অমনি বলিলেন—“আজ্ঞা হ! যা কইলেন, কিষ্টনাম বড় মিঠা।” পরশুরামের অনেক কথায়ই এইপ্রকার আত্মহারা ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পরশুরাম সর্বদাই সকলের নিকট বলিয়া থাকেন—“মাধব আমার বড় দয়াল! তিনি আমার ছেলে মেয়ে সমস্ত জঞ্জাল নিয়া তাঁর চুলভ চরণ আমাকে দিয়াছেন। এত দয়া মাধব না করলে আমার কি সাধ্য ছিল মাধবের নাম লই?” পরশুরাম এসব কথা বলিতে বলিতে কান্দিয়া অস্থির হন, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। ‘মাধব আমার বড় দয়াল’, পুনঃপুনঃ এই কথাই তিনি বলিতে থাকেন।

পরশুরামের সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রশংসাবাদে আমাদের একটি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ‘ঠাকুর তো প্রায় সকলেরই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহার সম্বন্ধেও বোধ হয় তাহাই হইবে।’ সন্ধ্যাকীর্তনের কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি আমতলায় ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন, কীর্তন হইতেছে—ইতিমধ্যে পরশুরাম তাঁহার কাণে তিন বার “গুরু সত্য”, “গুরু সত্য”, “গুরু সত্য” এই কথা বলিয়া পিঠে কয়েকটি চাপড় মারিলেন। ঐ সময়ে কুঞ্জ বাবু অকস্মাৎ কেমন হইয়া গেলেন। তাঁহার ভিতরে এক অদ্ভুত শক্তির খেলা হইতে লাগিল। তিনি হাত পা আছড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন।

ঠাকুর যখন ধামরাই গিয়াছিলেন, তখন পরশুরামের সহিত মাধবের মন্দিরে তাঁহার দেখা হয়। পরশুরাম ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, “আমি যেন মাধবের দর্শন পাই।” ঠাকুর তখন বলিলেন, “আপনি ত মাধবের দর্শন পেয়ে থাকেন, তিনি ত আপনার নিকটেই রয়েছেন।” তাহাতে পরশুরাম বলিলেন—“এই মাধব নয় ইহার ভিতরে যে আর এক মাধব আছেন, তাঁকে নিয়ত দেখতে চাই, তিনি মধ্যে মধ্যে উকি দিয়ে থাকেন।”

স্বপ্ন, প্রারব্ধ এবং বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

আজ কাল অরুণোদয়ে নান করিয়া আসি। আসনে বসিয়া স্থিরভাবে একশত আটবার গায়ত্রী

বৈণাধ,

জপ করিয়া হোম করিয়া থাকি। পরে প্রাণায়াম কুন্তকের সহিত কিছুক্ষণ

১৬ই হইতে ১৭শে।

নাম জপ করিয়া গীতা এক অধ্যায় পাঠ করি। তৎপরে ১১টা পর্য্যন্ত

ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসিয়া থাকি। ঠাকুর এগারটার সময় শোচে যান। শ্রীধর ঐ সময়ে কুয়া হইতে

জল তুলিয়া, লেঙ্গটি ও বহির্কাস লইয়া ঠাকুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকেন। ঠাকুর পাযখানা হইতে আসিয়া গা ধুইয়া আসনে গিয়া বসেন। আহার বারটার মধ্যেই শেষ হয়। আহারের পর আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমতলায়ই বসিয়া থাকেন। ঠাকুর আমতলায় বসিলে পর, দুই ঘণ্টা ৮ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ করি; পাঠ শেষ হইলে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটেই বসিয়া থাকি এবং অবসর বুঝিয়া সময়ে সময়ে নানা সংশয়যুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করি। এক দিন কথায় কথায় ঠাকুরকে আমার কয়েকটি স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলাম।

ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন—“সকল স্বপ্নই অলীক নয়। অতীত জীবনের চিত্র অনেক সময় স্বপ্নে দেখা যায়। ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনারও কখন কখন স্বপ্নে আভাস পাওয়া যায়। মাথা বা পেট গরম হ'লেও অনেক সময়ে এলো মেলো স্বপ্ন দেখা যায়। যে সকল স্বপ্ন দেখেছ, তার কতকগুলি জীবনে পরিণত হ'চ্ছে, আর কয়েকটি ভবিষ্যতে বুঝবে।” এই বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন। ভাগলপুরে ১২২৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে * অর্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় যে দৃশ্য বা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা ঠাকুরকে বলিলাম, শুনিয়া কহিলেন—“প্রকৃতিকে তৃপ্ত কর্তে হবে। প্রকৃতিই এসে তোমাকে ঐরূপ বলেছিলেন। দুই উপায়েই প্রকৃতির তৃপ্তি সাধন করা যায়। এক বৈধ ভোগদ্বারা, আর এক সাধনদ্বারা। সাধনদ্বারাই তোমাকে প্রকৃতির তৃপ্তিসাধন কর্তে হবে। তোমার পক্ষে সাধনই একমাত্র উপায়।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবার পর মানুষ যে সকল কর্ম ক'রে থাকেন, তাহা কি শুধু পূর্ব পূর্ব প্রারব্ধের প্রভাবে,—না স্বাধীন ইচ্ছায়? আর এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তি কর্ম ক'রে নূতন কর্মফলের সৃষ্টি কর্তে পারেন কিনা?”

ঠাকুর বলিলেন—“বাস্তবিক সদগুরুর আশ্রয় একবার নিলে মানুষ কখনই আর নূতন কর্মের সৃষ্টি কর্তে পারে না। পূর্ব পূর্ব কর্মের ভোগই মাত্র কর্তে থাকে। সদগুরুর আশ্রয় নিয়ে মানুষ দুর্কর্ম কর্তে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল দুর্কর্মে কখনই আবদ্ধ থাক্তে পারে না। দুর্কর্ম করবার সময়ে, সেটা দুর্কর্ম ব'লে বুঝ্তে পারে এবং তা থেকে বিরত থাক্তে একটা চেষ্টাও ভিতরে ভিতরে থাকে। শুধু প্রারব্ধই যেন বাধ্য ক'রে ঐ সব কর্ম করায় নেয়। সদগুরুর আশ্রয় নিয়ে যে নূতন কর্ম কর্তে পারে না—এও তার একটি প্রমাণ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“ভোগ কার হয়? আর এই ভোগের শেষই বা কোন্ সময়ে, কিসে হ'য়ে থাকে?”

* ১ম খণ্ড—কে তুমি?

ঠাকুর বলিলেন—“সংস্কারবশতঃ ভোগটি দেহেরই হ’য়ে থাকে। শরীরটি যখন মানুষের একেবারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখনই ভোগের শেষ হ’য়ে থাকে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ মানুষ কি উপায়ে লাভ করতে পারে?”

ঠাকুর বলিলেন—“বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ এক মাত্র নাম-সাধন দ্বারাই লাভ হ’য়ে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করলেই দেহটি সাত্ত্বিক হ’য়ে যাবে। দেখ, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই দেহ রক্ষিত হতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য দেহের প্রতি পরমাণুতে হতেছে। রক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসেই বিশুদ্ধ হ’তেছে, এবং দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হ’তেছে। এক কথায় দেহের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই চল্ছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটি যখন গৌণে যাবে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই যখন আপনা আপনি নাম চল্তে থাকবে, তখন যেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সমস্ত দেহে হবে, তেমনি নামের কার্য্যও প্রতি পরমাণুতে হবে। নামটি শ্বাস-প্রশ্বাসে মিলিত হ’য়ে গেলে ক্রমে দেহটিও নামময় হ’য়ে যাবে। দেহ নামময় হ’লে উহা দ্বারা আর অন্য কার্য্য হওয়া সম্ভব হবে না। শুধু সাত্ত্বিক কর্ম্মই হবে। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম কর। চেষ্টা করতে করতে সমস্তই সহজ হ’য়ে আসে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“শ্বাস-প্রশ্বাসে যাদের নাম অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাদের শরীরে কি বিশেষ কোনও চিহ্ন প্রকাশ পায়? যদি কেহ বলে যে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হয়, তাহ’লে তার বাহিরের কোন লক্ষণ দ্বারা উহা সত্য বলে বুঝব?”

ঠাকুর বলিলেন—“মুখে বললেই ত আর হবে না! শরীরেও যে তাদের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাবে। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম গৌণে গেলে শরীরের চর্ম্মের উপরে এইপ্রকার চিহ্ন পড়বে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে।”

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের অঙ্গুলির পৃষ্ঠভাগে একপ্রকার চক্রাকার চিহ্ন দেখাইলেন। দুই হাতেরই সমস্ত অঙ্গুলির পৃষ্ঠে ঐ প্রকার কৌকড়া কৌকড়া ওঙ্কারবৎ চিহ্ন দেখিয়া অবাক হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“অস্থি মাংস রক্তে যখন নাম হইতে থাকে তখন ঐ সকলে কি নামের ছাপ পড়ে?”

ঠাকুর বলিলেন—“বৃক্ষের শিরায় নামের স্বাভাবিক ছাপ তো শ্রীবৃন্দাবনে চক্ষু দেখে এসেছে। মানুষের শরীরের প্রতি পরমাণুতে যখন নাম হ’তে থাকে, তখন অস্থি, মাংস, রক্তেও নামের ছাপ প’ড়ে যায়। মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থে একটি ফকির সম্বন্ধে লেখা আছে যে, যখন তাঁহার রক্তপাত হ’ল, প্রত্যেক ফোঁটা রক্তে “আয়েতুল্ হক্” এই শব্দ অঙ্কিত রয়েছে দেখতে পাওয়া গেল! এবার অর্দ্ধকুন্তসময়ে ৩শ্রীবৃন্দাবনে, যমুনার চড়াতে এক

দিন সাধুদের দর্শন করতে গিয়েছিলাম, বালির উপরে একখানা হাড় দেখে তুলে নিলাম, দেখলাম সমস্ত হাড়খানিতে দেবনাগর অক্ষরে “হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ” লেখা রয়েছে। হাড়খানা আমি সাধুদের দেখালাম, তাঁহারা খুব আশ্চর্য্যাব্বিত হ'লেন। কোনও বৈষ্ণব মহাপুরুষের অস্থি স্থির ক'রে তাঁরা সেখানি নিলেন এবং খুব সমারোহের সহিত মহোৎসব ক'রে যমুনার চড়াতেই উহা সমাধিস্থ করলেন।”

এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ পরে শ্রীধর ও সতীশের নিকটে বিষয়টি আগাগোড়া জানিবার জন্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভমেলায় যমুনার চড়ায় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও সাধুরা আসন করিয়াছিলেন। একদিন সকালে ঠাকুর অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, যমুনার চড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুদের নিকটে না যাইয়া, না বসিয়া, সোজা চড়ার উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। একস্থানে পহুঁছিয়া অল্প বালির ভিতর হইতে একখানা অস্থি বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন—“দেখ, কোনও মহাপুরুষের অস্থি, ‘হরেকৃষ্ণ’ নাম লেখা রয়েছে।” ঠাকুর অস্থিখানি আনিয়া সাধুদের দেখাইলেন। সাধু সন্ন্যাসীরা অস্থিখানি “হরেকৃষ্ণ” নামে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিকট হইতে ঐ অস্থিখানি চাহিয়া লইয়া, খুব আনন্দের সহিত সমস্ত সাধুরা মিলিয়া, সঙ্কীৰ্ত্তন-মহোৎসব করিয়া, মহা সমারোহে কেশীঘাটের সন্নিকটে যমুনার চড়ায় সমাধিস্থ করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে আমি শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতে না পারায় তৎসাময়িক অনেক ঘটনাই আমার জানা নাই। ঠাকুর সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঘটনার উল্লেখ করিলে, তাহা যেমন শুনি লিখিয়া রাখি। অতি সজ্ঞেপে ঠাকুর যাহা বলিয়া যান, তাহা পরিষ্কাররূপে জানিতে শ্রীধর, সতীশ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান সময়ের অনেক অদ্ভুত ব্যাপার এখন শুনিতেছি।

ধার্মিকেরা সর্বদাই বিনয়ী।

আজ ঠাকুর কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। আমি ঐ সময়ে অল্পপস্থিত থাকাতে ছোট্ট দাদা (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার ডায়েরীতে উহা তুলিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ প্রণেয় উপরে এই সকল উপদেশ, তাহা আমি জানি না। লেখা যেমন পাইলাম তেমনই তুলিয়া রাখিলাম।

ঠাকুর।—“ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রপথ ধ'রে সর্বদাই চলতে হবে। যদি কোন সাধুবাক্য ঋষিবাক্য থেকে অন্য প্রকার হয়, তবে ঋষিবাক্যই গ্রহণ করতে হবে। লোভ-মোহ-ইন্দ্রিয়-দমনাদি নিয়মগুলির উপরে সর্বদাই দৃষ্টি রাখবে। না হ'লে সাধনে বিস্তর অনিষ্ট হবে। যে সকল নিয়ম পদ্ধতির উপরে মনুষ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার কিছুমাত্র

ব্যতিক্রম কখনও করা উচিত নয়। কোনও প্রাণীর, এমন কি উদ্ভিদেরও কষ্টের কারণ হবে না। হরিদাসকে সকলের সঙ্গে একত্র ভোজন করতে মহাপ্রভু কত অহুরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করেন নাই। বরং নিজেকে অত্যন্ত নীচু মনে ক'রে সর্বদা তফাৎ তফাৎ থাকতেন। রূপ সনাতন যদিও ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন, তথাপি সমাজের ও সকলের মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলতেন। কখনও সাধারণের সঙ্গে একত্র ভোজনাদি করেন নাই। প্রকৃত ধার্মিক কিনা, স্বভাব দিয়েই ধরা যায়। ধার্মিকেরা সর্বদাই বিনয়ী।”

দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর একটি গল্প বলিলেন—“একদিন পোপ্ দেখলেন বহু লোক একটি স্ত্রীলোকের কাছে যাচ্ছেন। ঐ স্ত্রীলোকটির উপর খৃষ্ট আবির্ভূত হ'য়েছেন, এইরূপ প্রচার। পোপ্ বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। পোপ্কে তাঁহার কার্ডিনেল্ বল্লেন—‘আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি একবার দেখে আসি।’ স্ত্রীলোকটির নিকটে কার্ডিনেল্ উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন—‘ওরে! আমার জুতোটা খুলে দে তো?’ কার্ডিনেলের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা শুনে স্ত্রীলোকটি গ্রাহ্যই করলেন না। দর্শকমণ্ডলীও ঐ প্রকার ব্যবহার দেখে অবাক হ'লেন। কার্ডিনেল্ স্ত্রীলোকটির অগ্রাহ্যভাব দেখে অমনি চ'লে এলেন, এবং আত্মপূর্বিক পোপের নিকটে জ্ঞাপন ক'রে বল্লেন—‘ঐ স্ত্রীলোকটি ভণ্ড, কখনই খৃষ্ট উহাতে আবির্ভূত নন। যদি খৃষ্টই আবির্ভূত হ'তেন, তা হ'লে নিশ্চয় তিনি বিনয়ী হ'তেন এবং যা বলেছিলাম করতেন।.....”

১১. ঠাকুর বলিলেন—“জ্ঞানের সম্যক ব্যবহার করবে। কাকেও সহজে বিশ্বাস করবে না। আবার বিশ্বাস ক'রেও সহজে তাকে অবিশ্বাস করবে না। জ্ঞান ও ভক্তি এ সকলই প্রকৃতির। দেখ, রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজে নিরঙ্কর ছিলেন। অথচ মহা জ্ঞানী লোকে তাঁর নিকটে ব'সে জ্ঞানলাভ করতেন। আবার মহাভক্ত লোকেরাও তাঁর চরণতলে বসে কত ভক্তির উপদেশ শুনতেন। তাঁকে জ্ঞানারা মহাজ্ঞানী এবং ভক্তেরা মহাভক্ত মনে করতেন।”

আদান ও হোম বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

১লা বৈশাখ হইতে নিত্য হোম করিতে ঠাকুর আদেশ করিয়াছেন। প্রত্যহ সকালে স্নানান্তে নাম প্রাণায়াম করিয়া আমি হোম করিয়া থাকি। ১০৮টি ত্রিপত্র বিষপত্র এক ছটাক ঘূতের সহিত মিলাইয়া মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া—“অয়্যে স্বাহা” বলিয়া আহুতি দেই। ঠাকুর বলিয়াছেন—“বেল,

বট, অশ্বথ বা যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠে হোম করবে। এই মন্ত্র প'ড়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে 'অগ্নয়ে স্বাহা' ব'লে আহুতি দিবে।" এই বলিয়া হোমের মন্ত্রটি বলিয়া দিলেন। গেণ্ডারিয়া আশ্রমের পুকুরের দক্ষিণপূর্ব কোণে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় বনের মধ্যে একখানা ঘর করিয়াছেন। ঐ ঘরে কেহই কোনও সময়ে থাকে না। নির্জন পাইয়া কুঞ্জবাবুর সম্মতি অনুসারে ঐ ঘরেই আমার আসন করিয়াছিলাম। উপস্থিত সেই স্থানে বড়ই বিষ দেখিতেছি, আশ্রম হতেও একটু তফাৎ; কি করিব জানি না।

আজ ঠাকুর আহারের পর আমতলায় গিয়া বসিয়া নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন—“উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ হ'য়ে আসন ক'রে হোম করবে। ভগবৎপ্রীতি-ইচ্ছায় বা নিকাম হ'য়ে যা কিছু করবে তা উত্তরমুখ হ'য়ে ক'রো, আর সকাম বা সঙ্কলিত কার্য্য পূর্বমুখ হ'য়ে করা ব্যবস্থা। হোম করবার সময়ে হোমধুম শরীরে লাগাতে হয়। না হ'লে দেহেতে হোমের ক্রিয়া তেমন হয় না।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“এই হোমের উপকারিতা কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“হোমের উপকারিতা অনেক আছে, তাহা এখন জেনে প্রয়োজন নাই। ঠিক মত হোম ক'রে যাও, উপকারিতা নিজেই অনুভব করতে পারবে। হোম ক'রে হোমের ফোটা কপালে দিও। হোমের বিভূতি দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র করতে হয়। মধ্যে উর্দ্ধপুণ্ড্র ও ব্রাহ্মণের করা ব্যবস্থা।”

আমি হোম বিভূতিদ্বারা সকালেই ত্রিপুণ্ড্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া হোমাস্তে হোমের ফোটা ধারণ করি। স্বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় হস্তে পাঁচটি স্থানে এবং উভয় পার্শ্বে, দুইটি স্তনে, নাভি, বক্ষ, কণ্ঠ, কণ্ঠের বিপরীত মেরুদণ্ডের উপরে ও পৃষ্ঠে নাভিমূলের বিপরীত স্তনে, সর্পির্দেহে দিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠ।

মহাপ্রভুর ধর্ম ও আধুনিক বৈষ্ণবধর্মে স্ত্রীলোকের সংশ্রব।

আমাদের দেশে হীন জাতি ছোট লোকদের ভিতরে, মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের নামে, স্ত্রীলোকসংশ্রবে যে সকল বীভৎস কাণ্ড অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে বৈরাগী বৈষ্ণব কথাটার উপরেই যেন সাধারণ লোকের একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। উপস্থিত ভদ্রসমাজেরও দুই এক জন লোক এ সকল সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাতে, সাধারণ লোকসমাজের যে কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, বলা যায় না। আজ কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়, ইতর শ্রেণীর বাউল বৈষ্ণবদের ভিতরে স্ত্রীলোক নইয়া যে সাধন ভজনের ব্যবস্থা আছে শুনিতে পাই, তাহা কি মহাপ্রভুর ধর্ম?”

ঠাকুর শুনিয়া কানে হাত দিয়া বলিলেন—“রাম! রাম!! মহাপ্রভু শাস্ত্র-সদাচারবিরুদ্ধ কোন অতুষ্ঠানই করেন নাই, বলেনও নাই। ‘হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরনুথা॥’ মহাপ্রভু মাত্র ইহাই প্রচার করেছেন। নাম কি ভাবে কর্তে হ’বে তাও বলেছেন—‘তুণাদপি স্মৃনীচেন তরোরপি সহিষ্মণা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥’ স্ত্রীলোক হ’তে মহাপ্রভু কত তফাৎ থাকতেন এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের ঐ সংশ্রব থেকে কত সাবধানে রাখতেন, চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করলেই তা বেশ বুঝা যায়। শুধু এদিকে কেন? প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, স্ত্রীলোকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রেখে বৈষ্ণবসমাজে ধর্মবিষয়ে বিষম অধোগতি হয়েছে। শ্রীবৃন্দাবনেও দেখলাম—সংযোগী না হ’লে কারো ওখানে থাকা সহজ নয়।”

এই বলিয়া ঠাকুর একটি ঘটনার কথা বলিলেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনে বাস-সময়ে আমিও তথায় ছিলাম। এই ঘটনাটি আমার সাংক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা আছে; হুতরাং তৎকালীন ডায়েরী হইতে এই স্থলে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে একদিন একটি ভদ্র ঘরের যুবতী ব্রাহ্মণরমণী ব্যস্ততার সহিত আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—“প্রভো! আমি এ সময়ে কি করিব বলুন।” ঠাকুর তাঁহাকে বিষয়টি কি জিজ্ঞাসা করায়, স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিলেন, “অল্প বয়সে বিধবা হইয়া ধর্মোন্নততা বশতঃ আমি তীর্থপর্যটনে বাহির হইয়াছিলাম, চারিধাম পরিক্রমা করিয়া কিছু কাল হইল শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছি। এতকাল বেশ ছিলাম, কিছুদিন হইতে কতকগুলি বৈষ্ণব আমার পিছনে বড়ই লাগিয়াছে। তাহারা দিনরাত আমাকে জ্বালাতন করিতেছে। ভেক্ গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব নিয়া সংযোগী হইয়া, নাকি যুগল উপাসনা করিতে হয়, না হ’লে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করা নাকি মহা অপরাধ! সকলে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। অনেক বৈষ্ণবই নিয়ত আমার নিকট আসিতেছেন, আর ভেক্ দিতে চাহিতেছেন। আমি ব্রাহ্মণের কণ্ঠা, কিছু কাল হইল বিধবা হইয়াছি। এখন কি বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া যুগল উপাসনা করিতে আপনি আমাকে বলেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“দুষ্ট লোকেরা আপনার সর্বনাশ কর্তেই এসকল পরামর্শ দিতেছে। শাস্ত্রে বরং ইহার বিরুদ্ধেই আছে, যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের অধোগতি হয়। সংযোগী না হ’লে যুগল উপাসনা করা যায় না, এরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই। যুগল উপাসনা বরং নাই হ’বে; এসব দুষ্ট লোকের পাল্লায় প’ড়ে, স্ত্রীলোকের সার সতীত্ব ধর্ম্মে কিছুতেই জলাঞ্জলি দিবেন না।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া জ্বীলোকটি খুব সন্তুষ্ট হইলেন। বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব না রাখিয়া আপন মনে সাধন তজ্জন করিবেন সংকল্প করিলেন।

সতীর রক্ষাকর্তা স্বয়ং ভগবান্।

যৌবনাবস্থায় এই জ্বীলোকটি যখন একাকিনী চারিদাম পর্যটন করিয়াছিলেন, তখন কোনও প্রকার ছুট লোকের উপদ্রবে পড়িয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, জ্বীলোকটি তাহার এক দিনের অদ্ভুত একটি ঘটনার বিষয় বলিয়াছিলেন। ঠাকুর অনেক সময়ে এই ঘটনাটি বলিয়া থাকেন। যথার্থ সতীর সহায় ভগবান্। তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন। এই ভদ্রমহিলা বাঙ্গালা দেশের কোন গ্রামের একটি বদ্ধিষ্ণু পরিবারের কুলবধু। স্বামিপুত্রাদি বর্তমানেই ধর্মের আকর্ষণে ইনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন। পদব্রজে তীর্থপর্যটনে বাহির হইবার প্রত্যাশায়, স্বামীর চরণে পড়িয়া কিছুদিন অল্পমতি প্রার্থনা করেন। স্বামী তাহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া কিছুকাল ঘরে রাখিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে পাগলের মত ছুটিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পথে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত তীর্থ দর্শনমানসে নিতান্ত অসহায় অবস্থায়ও মনের আবেগে তিনি একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র অবলম্বন করিয়া একাকী ছুটিতে লাগিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে ভগবৎরূপায় নীলাচলে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া পরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে চলিলেন। সেতুবন্ধের পথে তাহাকে যে আকস্মিক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের নিকটে যে কথোপকথন হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

শ্রীধর জ্বীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “একাকী যৌবনাবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণকালে কোথাও কোন প্রকার বিপদ ঘটে নাই তো?” জ্বীলোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবান্ যাহার সহায়, তাহার আবার বিপদ কি! তবে এক দিনের একটি ঘটনার কথা আপনাদিগের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি— শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ভাল সঙ্গী না জুটতে, একাকীই দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলাম। একদিন সমস্ত রাস্তা চলিয়া বিশ্রামের কোনও নিরাপদ স্থান না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পথ অতিশয় দুর্গম, একান্ত নির্জন; একটানা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই কোনও নির্জন স্থানে সাধুদের একখানি কুটার দেখিতে পাইলাম। নিকটে যাইয়া দেখি কয়েকটা শাস্ত্রমুগ্ধি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। উহাদিগকে দেখিয়া ভরসা হইল। তাই ঐ স্থানে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু রাত্রি একটু অধিক হইতেই সন্ন্যাসীরা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অগ্ৰ একটি আড্ডায় চলিয়া গেলেন। একটিমাত্র বলিষ্ঠ যুবক সন্ন্যাসী ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গভীর নিশীথে যখন চারিদিক অন্ধকারময়, নিস্তব্ধ, তখন সাধুটি

নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং নানা প্রকার কথা বলিতে বলিতে ভিতরের দুঃখভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমি তখন বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম। কিছুক্ষণ আমি অবাক হইয়া রহিলাম। অবলা নারী নির্জন স্থলে নিশাকালে অতিবলিষ্ঠ কামুকের হাতে পড়িয়া কি উপায়ে রক্ষা পাইব, ভাবিতে লাগিলাম। সাধুকে দু'চার বার হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া তাহার চেষ্টা থামাইতে প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। সাধু মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমাকে টানটানি করিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করিব! “মা জগদম্বে! মা জগদম্বে!” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। সাধু মহাবলিষ্ঠ বিষম উত্তেজনার অবস্থায় সজোরে আমাকে যেমনি মাটিতে টানিয়া ফেলিল, অকস্মাৎ একটি প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া লাফাইয়া উহার ঘাড়ে পড়িল এবং মুখে করিয়া পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইল। পরদিন নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিলেন, কিছু তফাতে এক স্থানে সাধুর মৃত দেহ ঘাড়-মটকান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা বলিলেন, আর কখনও তাঁহারা এই গ্রামে বাঘ আসিতে দেখেন নাই অথবা বৃদ্ধদের মুখেও কখনও এই গ্রামে কোন কালে বাঘ আসিয়াছিল এমন কথা শুনে নাই। ঐ সাধু বহুকাল ঐ কুটিরেই বাস করিতেছিলেন। জগদম্বার রূপা অতি অদ্ভুত!

স্ত্রীলোকটি যখন এই কথা ঠাকুরের কাছে বলিয়াছিলেন, আমি তখন সেখানেই থাকিয়া ঐ সমস্ত কথা শুনিয়াছিলাম। ঐ প্রকারের আরও একটি ঘটনা ঠাকুর সেই সময়ে বলিয়াছিলেন; তাহা সেই সময়ের ডায়েরী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

যথার্থ সতী বিপন্না হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করেন, ইহার প্রমাণ দেখাইতে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোনও এক গ্রামে একটি ভদ্রলোকের বাস ছিল। যৌবনাবস্থায়ই রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি আফিং ধরিয়াছিলেন। একদিন স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি নিজ যুবতী স্ত্রীকে মাত্র সঙ্গে লইয়া পদব্রজে রওয়ানা হইলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে পথিমধ্যে আফিমের অভাব হইল, ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া পড়িলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধরাশায়ী হইয়া ঘন ঘন হাই তুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে দুঃসহ ক্লেশ প্রকাশপূর্বক স্ত্রীকে বলিলেন—“ওগো! আমি আর সহিতে পারি না, শীঘ্র আফিং আনিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাও।” স্বামীর ঐ অবস্থা দেখিয়া বিষম বিপদ আশঙ্কা করিয়া, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং কোথায় আফিং পাওয়া যাইবে অনুসন্ধান করিয়া অস্থিবিচিতে বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন, ঐ গ্রামে এক ব্যক্তির নিকট আফিং আছে; কিন্তু তিনি ভয়ঙ্কর মাতাল। যুবতী অগত্যা মাতালের দ্বারেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। আফিমের অভাবে স্বামীর জীবন সংশয়াপন্ন জানাইয়া অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত হইয়া, করযোড়ে অতি কাতরভাবে মাতালের নিকট আফিং প্রার্থনা করিলেন। মাতাল বলিল—“ওগো, স্বামীর জন্ত যদি যথার্থই দরদ থাকে, তবে আফিং নিতে পার; মদ, গাঁজা যাহা চাহিবে দিতে পারি, কিন্তু মূল্য নিয়া দিব না; কিছুক্ষণের জন্ত তোমার দেহটি আমাকে দান করিতে হইবে, না হ'লে দিব না

নিশ্চয় জানিও ।” স্ত্রীলোকটি বড় অল্পনয় বিনয় করিলেও মাতাল কিছুতেই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না । যুবতী নিরুপায় হইয়া স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার স্বামীকে জানাইলেন । স্বামী তখন আফিমের অভাবে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন ; সুতরাং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, “ওগো ! আমার প্রাণ যায়, যেখান থেকে যে ভাবে পার, আফিং আনিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাও ।” যুবতী বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন । একদিকে স্ত্রীলোকের সার ধর্ম সতীত্বের নাশ, আর একদিকে স্ত্রীর আরাধ্য দেবতা পতির অপমৃত্যু । সতী ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে মাতালের নিকট উপস্থিত হইয়া, মাতালের চরণ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, “আপনি আমার এই দেহ গ্রহণ করিয়া ইহার বিনিময়ে আমার স্বামীর জীবন দান করুন । আমাকে এই পাপে নরকে যাইতে হয় আপত্তি নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু শীঘ্র আফিং দিয়া আমার মরণাপন্ন স্বামীকে রক্ষা করুন ।”

ভগবানের কি অদ্ভুত দয়া ! সতীর কি অদ্ভুত শক্তি ! যুবতীর করস্পর্শে মাতালের কি এক অবস্থা হইল, মাতাল চমকিয়া উঠিল । সে তৎক্ষণাৎ যুবতীর চরণে মস্তক রাখিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, “মা, আমার ক্ষমা কর ; তোমার রূপায় আজ আমার পূর্নজন্ম লাভ হইল । আমি অত্যন্ত দুরাচার, মদ, গাঁজা, আফিং সমস্ত নেশাই করিয়া থাকি, কিন্তু আজ হইতে আমি সমস্ত নেশা ত্যাগ করিলাম, তোমার বত ইচ্ছা আফিং লইয়া যাও । মা, তোমার মত হৃদিশা আমার স্ত্রীরও তো ঘটিতে পারে । জীবনে আর নেশা বস্ত্র স্পর্শ করিব না ।” যুবতী আফিং নিয়া স্বামীর নিকটে পহুছিলেন ; দেখিলেন, স্বামী বলিয়া খুব কান্দিতেছেন । স্বামীর হাতে আফিং দিতেই তিনি উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, “আহা ! আমার জন্ম তোমার সার সতীত্ব-ধর্ম তুমি অনায়াসে বিসর্জন দিলে ! ধিক্ আমার জীবনে ! এ জীবন যাওয়াই তো ভাল । আর কখনও আফিং স্পর্শ করিব না, প্রাণ যায় যাক্ । তুমিই ধন্য তুমিই যথার্থ সতী ।” স্ত্রী তখন কান্দিতে কান্দিতে স্বামীর চরণে ধরিয়া, ভগবানের অদ্ভুত রূপায় তিনি যে ভাবে এই বিষম সঙ্কটে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা জানাইয়া স্বামীকে শান্ত করিলেন ।

হোমের উপকারিতা ও প্রার্থনায় অনুতাপ ।

আজ মাসাধিক কাল হইল নিয়মিতরূপে অল্পদয়ে বৃত্তীগঙ্গায় স্নান তর্পণ করিয়া আশ্রমে আসি এবং বেলা নয়টা পর্য্যন্ত আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকি । বাড়ী হইতে যজ্ঞডুম্বরের কাষ্ঠ ও বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধ আনিয়া রাখিয়াছি । সকালে কিছুক্ষণ গায়ত্রীজপান্তে, অথগুহিত বিষ্ণুপত্রদ্বারা ঠাকুরের আদেশ অনুসারে প্রজ্জলিত অগ্নিতে ১০৮টি আহুতি দেই । আহুতি দিয়াই হোম ধূম শব্দে পাখা করিয়া লাগাইয়া থাকি, এবং খুব উত্তমের সহিত প্রাণায়াম ও নাম করি । কিছুদিনযাবৎ পবিত্র হোমগন্ধ, আসন ছাড়িয়াও সময়ে সময়ে অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু আজকাল হোমগন্ধ আমাকে

আর ছাড়িতেছে না। প্রায় সর্বদাই যেখানে সেখানে এই অদ্বুত হোমগন্ধ পাইয়া, আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি। নিয়ত হোমগন্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। এই পবিত্র হোমগন্ধের প্রভাবে চিত্তের প্রফুল্লতা, মনের উৎসাহ উত্তম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নাম স্মৃষ্টিভাবে, খুব তেজের সহিত, রসাল হইয়া প্রতিনিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। গন্ধ নামের, এবং নাম গন্ধের, প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছে। মন আর অল্প দিকে যায় না, গন্ধে মাতিয়া নামেতে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অল্পদূরে গমন করিয়া অপরাহ্ন ছয়টা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকি; অবসন্নতা, ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝি না। পূর্বে যাহারা আমার গায়ে ঘর্ষের দুর্গন্ধ পাইয়া সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া তফাৎ থাকিতেন, আজকাল তাঁহারাও এই হোমগন্ধ পাইয়া আমার গা ঘেঁষিয়া বসেন, গায়ে হোমগন্ধ হইয়াছে বলিয়া পরস্পর আলোচনা করেন। আমি কিন্তু গায়ের গন্ধ কিছুই বুঝি না, সর্বদাই সর্বত্র হোমগন্ধ পাইয়া দিশাহারা হইয়া যাইতেছি, ইহাই মাত্র বুঝিতেছি। বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধ খাইতে না বলিয়া, ঠাকুর আমাকে কেন অনর্থক আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন, সময়ে সময়ে আমার এই খটকা উঠিত। আশ্চর্য্য ঠাকুরের দয়া! এই ভাবে না বুঝাইলে আমার কিছুতেই শাস্তি হইত না। ঠাকুর! দয়া কর। এই ভাবেই প্রতি সংশয়ের হাত হইতে রক্ষা করিও। জয় ঠাকুর!!

আশ্রমের পশ্চিম দিকে শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণাংশে পণ্ডিত মহাশয় ও অন্ধের শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের রান্নার ও থাকিবার ঘর আছে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া আহাৰাদি ব্যাপারে আশ্রম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া উহার আনন্দে ভজন সাধন করিতে করিতে দিন কাটাইতেছিলেন। সমস্তি ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহাদের আহাৰাদির বন্দোবস্ত আশ্রমেই হইয়াছে। তাঁহাদের রান্নাঘরটি শূণ্য পাইয়া আমার আসন ঐ ঘরে আনিবার স্বেযোগ পাইলাম। জঙ্গলের ভিতরে দরজা-শূণ্য ফাঁকা ঘরে আসন, বস্ত্র ও হোমের ঘুতাদি সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া ঠাকুরের নিকটে সারাদিন থাকায় উদ্বেগশূন্য হইতে পারিতেছি না। গেগুরিয়ার জঙ্গলে বাঘের অভাব নাই, সাপও বিস্তর; রাত্রিতে ঐ ঘরে যাইয়া একাকী আমাকে থাকিতে অনেকে নিষেধ করিতেছেন। একটু তফাৎ থাকি বলিয়া, রাত্রিতে যে আনন্দ সকলে ঠাকুরকে লইয়া ভোগ করেন আমি তাহাতে বঞ্চিত।

আর একটি ঘটনায় আমার চিত্তকে বিষম অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে একদিন আমি আশ্রমে রান্নায় নিযুক্ত আছি, ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনসহ অকস্মাৎ বড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমার হোমের কাঠগুলি একটু ভিজা ছিল বলিয়া, ভালরূপে শুকাইয়া লইবার মানসে উহা আসনঘরের উত্তর দিকের একটা অনাবৃত স্থানে রৌদ্র পাইবার জন্ত রাখিয়া আসিয়াছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই, ‘হায় ঠাকুর কি হইল! কাঠগুলি ভিজিয়া গেল,’ ভাবিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কল্যা ভিজা কাঠে কি প্রকারে হোম করিব চিন্তায় অস্থির হইয়া মনে মনে ঠাকুরকে জানাইলাম; ‘তাঁর দয়া হ’লে সবই সম্ভব, না হ’লে আর উপায় নাই’, বুঝিয়া অগত্যা স্থির হইলাম। আহাৰান্তে রাত্রে বৃষ্টি থামিলে আসনে বসিয়া দেখি, সমস্তগুলি কাঠ ঘরের মধ্যস্থলে সাজান রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া

রাত্রির অধিকাংশ সময় ভাবিতে লাগিলাম, কাঠগুলি কে ঘরে আনিয়া রাখিল! পরে ২৩ দিন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, কে উহা ঘরে লইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সকলেই বলিলেন, “জানি না।” পণ্ডিত দাদা বলিলেন, “এ বিষয়ে আর অনুসন্ধান কেন? অনুদ্বারা হ’লেও উহা তো ঠাকুরই করাইয়াছেন।” সাধারণের নিকটে ঘটনাটি সামান্য বোধ হইলেও এই ব্যাপারে আমার চিত্তটিকে অত্যন্ত আলোড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! হায়! আমার ব্যস্ততা দেখিয়া ঠাকুরেরই এই কর্ম।

পণ্ডিত দাদাদের রান্নাঘরেই আমার আসন করিলাম। বেশ সুবিধা হইল। আশ্রমের অন্তর্গত হওয়ায় আর কোন প্রকার অসুবিধাই রহিল না।

কৰ্ম্ম কিসে হয়?

আজ নির্জন পাইয়া পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“শুনিতে পাই, কর্ম্মই মানুষের বন্ধন। এই কর্ম্ম কিসে শেষ হয়? কর্ম্ম করিয়াই কি কর্ম্মকে শেষ করিতে হয়?” ঠাকুর বলিলেন—“তা কি কখনও হ’য়ে থাকে! কর্ম্ম ক’রে কেহই কর্ম্মকে শেষ করতে পারে না। কর্ম্ম কর্ত্তে কর্ত্তে মানুষ আরও কর্ম্মে জড়িত হ’য়ে পড়ে। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম শেষ করা যায় বটে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। উহা অভ্যাস করা সহজ নয়। সাধনদ্বারা কর্ম্ম শেষ করাই সহজ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“সদগুরুর আশ্রয় নিলেও কর্ম্ম শেষ হ’তে এত বিলম্ব হয় কেন? সদগুরুর আশ্রয়াদি নিয়াও কি আবার সাধন ভজন ক’রে প্রারম্ভ কর্ম্ম শেষ করতে হবে?”

প্রশ্নটি শুনিয়া ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—“সদগুরুর আশ্রয় পেলে কর্ম্ম আপনা আপনি শেষ হ’য়ে আসে। আগুনের উপরে রাশীকৃত কাঠ চাপায়ে রাখলে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ধীরে ধীরে যেমন উহা দগ্ধ হ’তে থাকে, পরে একটু বাতাস পেলেই একেবারে দপ্-ক’রে জ্বলে উঠে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাঠ জ্বালায়ে দিয়ে একেবারে ভস্ম ক’রে ফেলে, সেইরূপ গুরুপ্রদত্ত শক্তিও, বহুজন্মের কর্ম্মরূপ আবর্জনার নীচে থেকে ধীরে ধীরে কার্য্য কর্ত্তেছে এবং ঐ সমস্ত আবর্জনা ধীরে ধীরে নষ্ট কর্ত্তে কর্ত্তে গুরুকৃপায় যখন উহা একবার দপ্-ক’রে জ্বলে উঠবে তখনই সমস্ত কর্ম্মরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে নষ্ট ক’রে প্রকৃত শান্তির অবস্থাতে নিয়ে যাবে। গুরুশক্তি আপনা আপনি কার্য্য করে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“যে সকল দুর্কার্য্য প্রারম্ভহেতু করা হয়, তাহা যে প্রারম্ভেরই কার্য্য, তাহা কি প্রকারে জানা যায়?”

ঠাকুর বলিলেন—“একটি কার্য্যে নিতান্ত অনিচ্ছা থাকলেও এবং পুনঃপুনঃ বিরত হ’তে

চেষ্টি ক'রেও যখন অবশ হ'য়ে তা ক'রে ফেলে, তখন উহা প্রারব্ধ বশতঃই হ'ল জান্বে।
ঐ প্রকার কার্য্য হওয়ার পরে যথার্থ অহুতাপ এলেই ঐ প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যায়। প্রতি
শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করতে পারলে সমস্ত প্রারব্ধই খুব শীঘ্র নষ্ট হয়। এত
সহজে আর কিছুতেই হয় না।”

জীবমুক্তের কর্ম ; প্রারব্ধক্ষয়ের উপদেশ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩ই—৩১শ।

জুন, ১৮৯১।

আজ জিজ্ঞাসা করিলাম— “মানুষ যখন একেবারে নিঃস্বার্থ হ'য়ে যায়, জীবমুক্ত
হ'য়ে যায়, তখনও কি তার কর্ম থাকে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“মানুষের যত দিন স্বার্থ আছে, তত দিন আর তার কর্ম কোথায় !
মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখনই তার যথার্থ কর্ম আরম্ভ হয়। স্বার্থ নষ্ট হ'য়ে মুক্তাবস্থা
লাভ করলে, সমস্ত সংসারের জন্ম অবিশ্রান্ত খাটতে হয়। নিঃস্বার্থ না হ'লে প্রকৃত
কর্মের আরম্ভই হয় না। জীবমুক্ত হ'লেই যথার্থ কর্মের আরম্ভ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম— “প্রারব্ধে ঘাটা আছে, তাহা ভোগ না ক'রে কি উপায় নাই ? সমস্ত
প্রারব্ধই কি ভুগে শেষ করতে হবে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“ভগবান্ যেটুকু প্রারব্ধ ভোগ করাবেন, তাহা কোন প্রকারেই ছাড়াতে
পারবে না। তবে যাহারা প্রফুল্লমনে কর্ম ক'রে যায়, কাঁ ক'রে তাদের কর্ম শেষ হ'য়ে
যায়। আর বেগারের মত কর্ম করলে, ক্রমে অনেক কর্মে জড়িয়ে ধরে। কর্মকে
কখনও উপেক্ষা করতে নাই। কর্তব্যবোধে প্রফুল্লমনে কর্ম ক'রে যাও, তা হ'লেই খুব
শীঘ্র প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।”

কিছুদিন হইল ঠাকুর বলিয়াছিলেন—“কর্ম করিয়া কর্ম শেষ করা যায় না, সাধন দ্বারাই কর্ম শেষ
করা সহজ।” আবার এখন বলিলেন—“ভগবান্ যেটুকু প্রারব্ধ ভোগাইবেন কিছুতেই ছাড়াইতে
পারিবেন না। প্রফুল্লমনে কর্ম করিয়া যাও শীঘ্র প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।” এই দুই প্রকার কথা
সামঞ্জস্য করিতে গিয়া আমি এই বুঝিলাম যে, ভগবান্‌ই সকলের কর্তা। তাঁরই ইচ্ছায় প্রারব্ধভোগ।
সাধন ভজন করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, তাঁহার রূপায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত প্রারব্ধ শেষ
হইতে পারে। সুতরাং একান্তপ্রাণে তাঁকেই ডাকি। কিন্তু ভগবান্‌ যে কি, তাহা তো কিছুই জানি
না। অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী ভগবান্‌কে কি ভাবে ডাকিতে হয়, পূজা করিতে হয়, তাহা তো
বুঝিতেছি না। শূন্তে ঢিল মারিবার মত, লক্ষ্য স্থির না করিয়া নাম করিতেছি মাত্র। মনে এই খটকা
উপস্থিত হইলে, নির্জন পাইয়া ঠাকুরকে প্রাণ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী
ভগবান্‌কে কিছুতেই তো ধারণা করিতে পারিতেছি না। তাঁর পূজা আর কিরূপে করিব ? শূন্তে যেন

ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইতেছি। গুরুর ধ্যানে ও পূজার ভগবানের পূজা হয় না কি ? আমাকে পরিস্কাররূপে ইহা বুঝাইয়া দিও।”

গুরুই ভগবান্ ।

ঠাকুর বলিলেন—“অগ্নি তো সকল স্থানেই আছে ; কিন্তু সেই অগ্নি কি কেউ ধরতে পারে ? না তাহা দ্বারা কোনও কাজ হয় ? আগুনের আবশ্যক হ'লে সর্বত্র যে আগুন আছে, শূন্যে যে আগুন র'য়েছে, তা হ'তে কেহ উহা নিতে পারে না। প্রদীপ, ধুনি, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল স্থানে ঐ অগ্নি জ্বলন্তভাবে বিশেষরূপে প্রকাশিত র'য়েছে সেখানেই যেয়ে আগুন নিয়ে থাকে। সে রকম ঈশ্বর সর্বব্যাপী হ'লেও, কেউ তাঁকে ধরতে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎ শক্তির প্রকাশ দেখে তথায়ই পূজা করতে হয়। গুরু তো আর মানুষ নহ্ন। গুরুই ভগবান্, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।”

সাধকজীবনে শুদ্ধতার আবশ্যিকতা।

অনেক সময় নাম করিতে করিতে অত্যন্ত নৈরাশ্য, উদ্বেগ ও শুদ্ধতা আসিয়া উপস্থিত হয় ; তখন নাম করিতে জালা হয়। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“সাধনের সময়ে কখনও কখনও বড়ই নিরাশ হই, শুদ্ধতা ও জালা আসিয়া অস্থির করে, সাধন ভঙ্গন এই সময়ে ভাল লাগে না। কত কাল এই শুদ্ধতা ভোগ হবে ? এইরূপ হয় কেন ?”

ঠাকুর বলিলেন,—“দেখ, এই বর্তমান গ্রীষ্মকাল কেমন ভয়ানক ! পুকুর, খাল, বিল, সমস্ত শুখায়ে গেছে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে সবাই অস্থির হতেছে, সকল প্রাণীই হাহাকার করিতেছে। গাছপালাও পূর্ব্বের মত নাই, দেখলেই মনে হয় যে, কি এক বিষম অবস্থা ! বাস্তবিক প্রকৃতির পক্ষে এমন দারুণ অবস্থা আর কখনও হয় না। কিন্তু ভেবে দেখ, এই গ্রীষ্মকাল না হ'লে বর্ষা আসে না, প্রকৃতি আবার নূতন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীষ্মকালই প্রকৃতির নূতন সৌন্দর্য্যের কারণ। গ্রীষ্ম হয় ব'লেই আমরা বর্ষার এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য অনুভব করি। সাধনের অবস্থাও ঠিক এইপ্রকার। সাধনের সময়ে শুদ্ধতা, নৈরাশ্য, জালা ইত্যাদি বিবিধপ্রকার ছুঃখের অবস্থা ভোগ করতে হয় ব'লেই, ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নৈরাশ্য বা শুদ্ধতা না এলে ধর্ম্মের আনন্দই থাকত না। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষ যখন ধর্ম্মের উচ্চতম শৃঙ্গে উপনীত হয়, তখনই যথার্থ শান্তি লাভ করে। তা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল অবস্থা হ'তে মানুষ কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন এ সকলই প্রয়োজন। যদি শান্তির অবস্থা একবার লাভ হয়, তা হ'লে আর কিছুতেই তা নষ্ট হয় না।”

অসময়ে শাস্ত্রপাঠের ও সাধুসঙ্গের অপকারিতা ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে এবং অনেক সাধুর সঙ্গ করাতে ধর্মজীবনের কল্যাণ হয় না অনিষ্ট হয় ?”

ঠাকুর বলিলেন—“সমস্ত কার্যেরই তো একটা প্রণালী আছে । অসময়ে অনিয়মে কোন কার্যেরই সুফল লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয় । শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ করারও একটা সময় আছে, অবস্থা আছে । অসময়ে এলো মেলো ভাবে ওসব করলে কোন উপকারই হয় না, বরং অনিষ্ট হয় । শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ আছে । প্রকৃতির অনুযায়ী পন্থা ধ’রে কিছু দূর অগ্রসর হ’লে, অবস্থানুরূপ শাস্ত্র পাঠ করতে হয় । নিজের সাধনপথে একটা নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও শাস্ত্রপাঠ বা কোনও সাধুসঙ্গ করাই ঠিক নয় । অনেক সময়ে দেখা যায়, ওরকম করায় লোকের বিঘ্ন ক্ষতি হয় । আপন সাধন ভজনের পথে নিষ্ঠা একেবারে নষ্ট হ’য়ে যায় ।”

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে নিত্য সঙ্কীৰ্ত্তন ও ভাবাবেশ ।

গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে নানা দিক্ হইতে গণ্য মাণ্ড বহু গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে দর্শন করিতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়াছেন । আজকাল সাধু সন্ন্যাসী, বাউল, উদাসী এবং মুসলমান ফকিরেরাও আশ্রমে আসিতেছেন, যাইতেছেন, কেহ বা থাকিতেছেন । গুরুভ্রাতারা আপন আপন রুচি অনুযায়ী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দলে, স্থানে স্থানে বসিয়া, কোথাও স্থির ভাবে নাম, প্রাণায়াম করিতেছেন, কোথাও উৎসাহের সহিত ধর্ম্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন, কোথাও বা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সময় কাটাইতেছেন । ঠাকুরের সেবার কার্য লইয়া কাহারও কাহারও ভিতরে প্রতিযোগিতা এবং ঝগড়া বিবাদও চলিতেছে । সকলেই একই ভাবে মত্ত ; উদয়াস্ত যেকি ভাবে যাইতেছে কাহারও লক্ষ্য নাই ; কেমন যেন একটা নেশাতে দিনরাত চলিয়া যাইতেছে । প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে সকলে একত্র মিলিত হইয়া ঠাকুরের নিকট কখনও আশ্রমের পূর্বের ঘরে কখনও বা আমতলায় খুব উৎসাহের সহিত সঙ্কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । এই সঙ্কীৰ্ত্তন এক মহাব্যাপার । বরিশাল, বানরিপাড়া, ঢাকা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা একত্র হইয়া খোল করতাল লইয়া যখন উচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভ করেন তখন সকলেরই দৃষ্টি একমাত্র ঠাকুরের উপরে । ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকেন, পুনঃপুনঃ চাপিতে চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠেন ; উদ্দগ্ধ নৃত্য করিয়া “হরিবোল, হরিবোল” ধ্বনি করিতে থাকেন । ঠাকুরের হুকুমে, হরিবোল

ধ্বনিতে চারিদিকে জ্বীলোক পুরুষের ভিতরে যেন কি এক অদ্ভুত শক্তি প্রবেশ করে। দেখিতে দেখিতে দুই চারি মিনিটের মধ্যেই মহা হলস্থল ব্যাপার আরম্ভ হয়, সকলে যেন কেমন এক প্রকার হইয়া যান। কেহ কেহ “জয় রাধে, জয় রাধে” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, কেহ কেহ “হরিবোল, হরিবোল” ভীষণ রব ছাড়িয়া নিনিমেষে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহির্কীর্ষ উড়াইয়া ঠাকুরকে পরিক্রমা করিতে থাকেন, কেহ বা “নিতাই, নিতাই” বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জনে করিয়া হুকার করিতে করিতে মল্লবেশে ঠাকুরের সন্মুখীন হইতে থাকেন, আবার কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎকাল নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়ান থাকিয়া ঠাকুরের দিকে একটানা দৃষ্টি রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। সকলেই কোনও না কোনও ভাবে মাতোয়ারা, ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দিশাহারা! খোলের ধ্বনি ও সঙ্কীর্ণনের রব, গুরুভ্রাতাদের হুকার ও গর্জনে মিলিত হইয়া, অদ্ভুত তড়িৎপ্রবাহে দর্শকমণ্ডলীকেও কাঁপাইয়া তুলে। এই সময়ে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পদার আড়ালে স্ত্রীমহলেও বিধম কান্নার রোল উঠিয়া পড়ে। বাহুজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কেহ কেহ নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকেন, কেহ কেহ মুচ্ছিতাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াও গড়াইয়া গড়াইয়া ঠাকুরের চরণসমীপে আসিয়া লুটাইতে থাকেন, আবার কেহ বা পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরকে ধরিতে যাইয়া বাধা পাইয়াই মুচ্ছিত হইয়া পড়েন ও ছটফট করিতে থাকেন। আমরা কয়েকটি গুরুভাই সাধারণের স্পর্শ হইতে ঠাকুরকে বাঁচাইয়া রাখিতে ঠাকুরের চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; এবং ভাবাবেশে উন্নত, মুগ্ধ, মুচ্ছিত ও ঠাকুরের দিকে ধাবিত, জ্বীলোকপুরুষদিগের, অবস্থা বুঝিয়া সরাইয়া দেই। আশ্রমে আজকাল প্রত্যহই এইরূপ মহা আনন্দ, মহা উৎসব! ধন্য ঠাকুর! ধন্য ঠাকুর!! তোমার সঙ্গলাভে আমরাও ধন্য!

সাধন কি—সাধকের ও সিদ্ধের কর্তব্য কি?

ধর্ম হইল কিনা কিসে বুঝিব?

আহারান্তে ঠাকুর যখন আমতলায় বসেন, কিছুক্ষণ লোকের ভিড় তেমন থাকে না। পাঠান্তে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—“মানুষের অশান্তির মূল কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“মানুষের সমস্ত অশান্তিই ধৈর্যের অভাবে। ধৈর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির একমাত্র কারণ।”

একটু থামিয়া ঠাকুর নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—“মানুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যখনই যা ক’রবে, স্থির ভাবে বিচার ক’রে করা উচিত। হঠাৎ কোনও কাজই করা সঙ্গত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈর্য্য ধ’রে কার্য্য করতে হয়। ধৈর্য্যই ধর্ম, ধৈর্য্যই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আমাদের সাধন কি ? নামজপ করাই কি সাধন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“সদগুরুপ্রদত্ত নাম জপ করাকে সাধন বলে না। সদগুরুপ্রদত্ত নাম গুরুশক্তিপ্রভাবে আপনা আপনি অনন্ত কাল চলবে। সকল বিষয়েই চঞ্চলতা পরিত্যাগ ক’রে অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত বিচার ক’রে সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করাই যথার্থ সাধন। সকল বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করাই সাধন।”

বিচারপূর্বক কার্যের কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“সাধক সাধনের অবস্থায় তো সমস্ত কার্যই বিচারপূর্বক করবে। সিদ্ধ হ’লে কি আর বিচার ক’রে কার্য করবে না ?”

ঠাকুর বলিলেন—“সিদ্ধ পুরুষের কাছে যে সকল বিষয় আসবে তিনি তা ভগবানের সম্মুখে নিয়ে ধরবেন। যেসব বিষয়ে ভগবানের জ্যোতিঃ স্পৃষ্টরূপে পড়েছে দেখতে পাবেন, তাহাই কর্তব্য ব’লে স্বীকার করবেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সমস্ত কাজই ভগবানের ইচ্ছিত অনুসারে করেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নিজ ইচ্ছায় কিছুই করেন না। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে নিশান ধরেন মাত্র।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“ধর্ম যথার্থই প্রকৃতিগত হয়েছে কিনা কিসে বুঝবে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“আগুন যেমন সকল অবস্থাতেই একপ্রকার থাকে, কোন অবস্থায়ই উহার উত্তাপ নষ্ট হয় না, সেইপ্রকার আপদে বিপদে, আনন্দে উল্লাসে, কোন অবস্থায়ই যাহার ধৈর্য নষ্ট না হয়, সত্য ও ধর্ম একই রকম থাকে, বিনয় ও সমতার কিছুমাত্র ভাবান্তর না হয়, তাহারই ঐসকল ধর্ম প্রকৃতিগত হয়েছে জান্বে। সকল অবস্থাতেই ধর্ম, ধৈর্য, বিনয় ও মিত্রতা ঠিক থাকলে যথার্থ ধর্মলাভ হয়েছে বুঝ্বে। বিপদে সম্পদে, নিন্দাতে ও প্রশংসাতেই মানুষের যথার্থ ধর্মলাভ হয়েছে কিনা পরীক্ষা হয়।”

এই সকল উপদেশের সময়ে ঠাকুর অনেক গল্প ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। ধর্ম সহজ জিনিস নয়, এ জীবনে কি আর তাহা লাভ হইবে।

ভাব বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য উপদেশ।

নিষ্ঠাবান হিন্দু, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্রাহ্ম, এমন কি মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্য মান্য অবস্থাপন্ন লোকসকলও ইতিমধ্যেই সাধন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইহারা সকলে কিছুকাল একস্থানে বাস করায়, সময়ে সময়ে আচার ব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে তর্ক, কলহ, বাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ও নানা বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। এই সমস্ত মতামতের ও আচার ব্যবহারের বিরোধ মীমাংসার জন্ত, সময়ে সময়ে

উভয় পক্ষই স্পর্ধার সহিত ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হন। সাধারণের সাধারণ অন্তর্ধানের উপরে কেহ কিছু করিলেই তাহা আমার প্রতিপন্ন করিতেও ঠাকুরের নিকটে কত সময় কত প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু সমস্তার ভিতরে উভয় পক্ষকেই সম্ভষ্ট রাখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যভাবে প্রতি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন।

আজ ঠাকুর সকলকে বলিলেন—“সকলেরই অবস্থার সহানুভূতি করতে হয়। অন্নের মতের সঙ্গে অনৈক্য বা অবস্থার সঙ্গে অমিল হ'লেই, তাহা একেবারে উড়ায়ে দিতে নাই। অন্নের অবস্থার বিচার করতে হ'লে, ঐ অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব করতে হয়, এক ইঞ্চি তফাৎ থাকলেও একজনের অবস্থার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, দোষ বা গুণ অন্য জনে ঠিক বুঝতে পারে না। মতের অনৈক্য, অবস্থার পার্থক্য, এ সমস্ত তো সংসারে চিরকালই থাকবে। ভগবানের রাজ্যে কোনও দুটি বস্তুই ঠিক একমত নয়। কোন না কোন অংশে কিছু পার্থক্য থাকবেই। এই নানা বিচিত্রতার মধ্যেও একটি সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। যত দিন মানুষ তাহা দেখতে না পায়, ততদিনই গোলমাল করে। বাস্তবিক সকলেই একপ্রকার হ'লে প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য্যই থাকে না। নানা প্রকারের ফুলগাছে বাগানের যেমন একটা চমৎকার শোভা হয়, শুধু এক প্রকারের গাছে সেই রকমটি কখনও হয় না। এ সংসারও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশে এক সুন্দর শোভা ধারণ করেছে। মানুষ যখন তা দেখতে পায়, তখন সমস্ত বিরোধই ছুটে যায়, প্রকৃতির বিচিত্রতার ভিতরে ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টিশীলতা ও অদ্ভুত কৌশল দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যায় ও পরমানন্দ লাভ করে। কিছুতেই তারা আর বিচলিত হয় না; অশান্তি ভোগ করে না। নিজের স্থানে নিজে ঠিক থেকে অন্নের অবস্থা মাত্র দেখে যেতে হয়; তবেই ক্রমে শান্তি।

“সব্ধে রসিয়ে সব্ধে বসিয়ে, সব্ধে লীজিয়ে কাম,
হাঁ জী, হাঁ জী করতে রহিয়ে, বৈঠিয়ে আপনু ঠাম্।”

দুর্গাচরণ বাবুর প্রতি ফকিরের অত্যাচার। সম্পূর্ণ ক্ষমাতে ভগবানের দণ্ড।

আমাদের গুরুভ্রাতা গেণ্ডারিয়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাহা মহাশয় ফকিরদের সঙ্গে কিছু দিন মিশিয়া কতকগুলি বুজবুজ শিখিয়াছেন। সময়ে সময়ে দুর্গাচরণ ঠাকুরের নিকটেও ঐসকল বুজবুজী দেখাইয়া খুব আনন্দ করেন। আমরাও খুব আনন্দ পাই, তামাসা করি। গাজা খাইতে আমাদের সকলের নিষেধ থাকিলেও, ফকিরদের চক্রে পড়িয়া দুর্গাচরণ গাজা খাইতে বেশ অভ্যাস করিয়াছেন। আমাদের পণ্ডিত মহাশয় একদিন দুর্গাচরণকে বলিলেন, “দুর্গাচরণ, গাজাটা কেন খাও?” দুর্গাচরণ

একটু গভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, “আপনারা সাধারণতঃ যেসব স্থলে বিচরণ করিতেছেন, তাহা হইতে একটু উপরে উঠিতে হইলেই, গাঁজায় একটু দম দিয়া নিতে হয়।” গাঁজা খাইলেও দুর্গাচরণ অভিশয় বিনীত ও নিরীহ প্রকৃতির ভাল মানুষ। গেণ্ডারিয়ার একটি প্রভাবশালী ফকিরকে দুর্গাচরণ প্রত্যহ দু’চার পয়সার গাঁজা দিয়া থাকেন। দিন দুই হইল দুর্গাচরণের হাতে পয়সা না থাকায় তিনি নির্দিষ্ট সময়ে ফকির সাহেবকে গাঁজা দিতে না পারিয়া ভীত হইলেন এবং আশ্রমে আসিয়া আমতলায় ঠাকুরের নিকটে চূপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ফকির সাহেব সময়ে গাঁজা না পাইয়া দুর্গাচরণকে তালাস করিতে করিতে অপরাহ্নে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের নিকটে দুর্গাচরণকে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া পড়িলেন। হাতে একখানা বেত ছিল, তাহা দ্বারা অতি নিষ্ঠুরের গ্রায়া সজোরে দুর্গাচরণের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “আরে শালা! গুরুকা সাম্নে আয়কে বৈঠা হয়। তুমি কোন্ মাঝনেছে তেরা গুরু হামারা ক্যা করেগা?” দুর্গাচরণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ফকির সাহেবকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু কোনও প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া, মার খাইয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ঠাকুর দুই একবারমাত্র ফকিরের দিকে তাকাইয়া দ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন। ফকির সাহেবও খুব দণ্ডের সহিত হাতের বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া দুর্গাচরণকে বলিলেন—“দুর্গাচরণ, ফকির সাহেব অন্যায়াসে তোমাকে এত প্রহার করলেন, আর তুমি চূপ ক’রে র’লে? একেবারে কিছুই বললে না?”

দুর্গাচরণ বলিলেন—“প্রভো! আপনার মাফাতে আমি কিরূপে উহাকে বলব! আমি তো ঠাকুরের-ই উপরে সব ছেড়ে দিয়েছিলাম।”

ঠাকুর বলিলেন—“আহা! গুরুপ করতে নাই। প্রতিফল দিতে সমর্থ হ’য়েও অত্যাচার ভোগ ক’রে যাঁরা ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দেন, তাঁরা অত্যাচারীর দফা শেষ করেন। আশ্রম হ’তে বাহির হ’য়েই ফকির সাহেব কি বিষম বিপদে প’ড়েছেন, অনুসন্ধান নিলেই সমস্ত জানতে পারবে।”

দুর্গাচরণ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া, ফকির সাহেবের অনুসন্ধান নিলেন; পরে আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “ঐদিন ফকির সাহেব বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে লোহার পুলের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তিকে অনর্থক গালাগালি করিতে থাকেন। নিকটে পাহারাওয়াল ছিল, সে ফকির সাহেবকে গালাগালি করিতে নিষেধ করায় ফকির সাহেব কাণ্ডাকাণ্ড জানশূণ্য হইয়া হস্তস্থিত বেত্রদ্বারা পুলিশকে কয়েক ঘা আঘাত করেন; পরে দু’চার জন পাহারাওয়াল একত্র হইয়া উহাকে ধরিয়া নিয়া

যায়। আজ শুনিলাম, ফকির সাহেব পাগল হইয়াছেন অল্পমানে, তাঁহাকে ঐ দিন পাগলা গারদে দেওয়া হয়। জেলের দারোগা এবং ডাক্তারের নিকট নীত হইলে, ফকির সাহেব নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষায় তাঁহাদিগকে গালি দেন। এই অপরাধে সেইদিন হইতে তাঁহার উপর প্রত্যাহ সকালেও বিকালে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশ ঘা বেতের আদেশ হইয়াছে। প্রতিদিন ফকির সাহেব বেত্রাঘাত ভোগ করিতেছেন। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং ফকির সাহেবের মুক্তির জন্ত কয়েকটি ভদ্রলোককে চেষ্টা করিতে অহরোধ করিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল পদস্থ লোকের চেষ্টায় অচিরেই ফকির সাহেব কারামুক্ত হইবেন।

দুর্গাচরণ ফকির সাহেবের প্রতিশোধ নিলে, তাঁহার আর এই বিষয় হৃদশা ঘটিল না অল্পমানে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেহ অত্যাচারে অত্যাচার করিলেই কি তার প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত?”

ঠাকুর প্রশ্ন শুনিয়া শিরিয় উঠিয়া বলিলেন—“রাম! রাম!! প্রতিহিংসা কি আর মাহুষে নেয়! অত্যাচারীকে সর্বদাই ক্ষমা করবে; অত্যাচারীর মঙ্গল আকাজক্ষা করবে। তবে যিনি অত্যাচার করেন, তাঁরই কল্যাণের জন্ত, ভিতরে সম্পূর্ণ ক্ষমা ও শান্তি রেখে, বাইরে একটু কৃত্রিম ক্রোধ দেখায়ে ছুঁচার কথায় কিছু শাসন ক’রে দিতে হয়। ইহাতে প্রতিকলও দেওয়া হ’ল, অত্যাচারীকে বিষম দণ্ড হ’তে রক্ষাও করা হ’ল। সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা ক’রে ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দিলে, অত্যাচারীকে অত্যন্ত দণ্ড পেতে হয়। গয়াতে একরূপ একটি ঘটনা হয়েছিল। গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, তখন কিছুদিন একটি পরমহংসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একদিন পরমহংসের একটি শিষ্য একাদশীতে নিরম্ব উপবাস ক’রে, দ্বাদশীর দিনে সকালে উঠে ফল্গুতে যেয়ে স্নান করলেন; বিষ্ণুপদ দর্শন করতে একটু বিলম্ব হ’ল। সঙ্গে তিনি একটি গোপাল ঠাকুর সর্বদাই রাখতেন। দ্বাদশীর পারণের সময় অতীত হ’য়ে যেতেছে দেখে ব্যস্ত হ’য়ে পড়লেন, এবং তাড়াতাড়ি একটা ময়রার দোকানে উপস্থিত হ’য়ে দোকানদারকে বললেন—‘পারণের সময় চলে যেতেছে, আমাকে একটু মিষ্টি দেও, গোপাল ঠাকুরকে ভোগ চড়ায়ে আমি একটু জল খাব।’ দোকানদার তাঁর কথায় কর্ণপাতই করলে না। সাধু তিন চারবার চেয়েও, ‘হাঁ, না’ কোনও উত্তর না পেয়ে ব্যস্ত হ’য়ে একখণ্ড বাতাসা নিতে যেমনি হাত বাড়ালেন, অমনি দোকানদার ও তার ছেলে, দোকান থেকে লাফায়ে রাস্তায় প’ড়ে সাধুকে ধরে দারুণ প্রহার করতে লাগল। পূর্বদিন নিরম্ব উপবাস ক’রে সাধু কাতর ছিলেন, তার উপরে এইরূপ প্রহার, একেবারে প’ড়ে গেলেন। রাস্তার লোকেরা বহু চেষ্টায় সাধুকে ছাড়ায়ে দিলেন। সাধু দোকানদারদের একটি কথাও না বলে উদ্ধৃদিকে দৃষ্টি

অপরান্ধে সহরের অনেক গণ্যমান্ত লোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হন। আমতলা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্তায় সন্ধ্যাপর্যন্ত কাটাইয়া দেন। আমি এই সময় আহারের চেষ্টায় থাকি; সুতরাং এই সময়ের কোন ঘটনাই বিশেষরূপে সাক্ষাৎভাবে জানি না। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে হরিসকীর্তন আরম্ভ হয়। রাত্রি প্রায় নয়টা পর্যন্ত মহা আনন্দ উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় দশটার সময়ে ঠাকুরের রুটি তরকারি হালুয়া প্রভৃতি ভোগ হয়। আহারান্তে রাত্রি চারিটা পর্যন্ত ঠাকুর একভাবে একাসনে বসিয়া থাকেন। চারিটার পর অর্দ্ধঘণ্টাকাল শয়ন করেন। যোগজীবন-প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুভ্রাতা রাত্রিকালে ঠাকুরের ঘরে থাকেন। প্রায় পাঁচটার সময়ে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া ভোরসকীর্তন করেন। দিন রাত্রি ঠাকুর এইভাবে অতিবাহিত করিতেছেন।

আষাঢ়।

পরমহংস গৌর শিরোমণির দৃষ্টান্ত—দোষে গুণদর্শন।

আষাঢ়,

১লা—১৫ই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“পরমহংস কাহাকে বলে?”

ঠাকুর বলিলেন—“ছুধে জলে মিলায়ে হংসের নিকটে ধরলে, হংস জলের অংশ ত্যাগ ক’রে শুধু ছুধের অংশই গ্রহণ করে। সেইরূপ এই অনিত্য মিথ্যা সংসারে যাঁহারা কেবল সার সত্যই গ্রহণ করেন, তাঁহারাই পরমহংস। পরমহংসেরা কেবল সারই গ্রহণ করেন, গুণই দেখেন; দোষ কখনই তাঁহারা দেখেন না। পরমহংসেরা সর্বদাই গুণগ্রাহী হ’ন।

পরমহংসদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিলেন— শ্রীবৃন্দাবনে একটি বিষয়-বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বহুকাল নির্জনে ভজন সাধন ক’রে পরমাত্মা-দর্শনে ছিলেন। ভগবানের চক্র! একবার তাঁর শ্রীসঙ্গ হ’লো। বৈষ্ণবসমাজে এই কথা প্রচার হয়ে পড়ায়, সর্বত্র তাঁর নিন্দা আলোচনা হ’তে লাগল। পতিত হয়েছেন ব’লে, বৈষ্ণবসমাজ ঘৃণার সহিত তাঁর সংস্রব ত্যাগ করলেন। গৌর শিরোমণি মহাশয় এই কথা শুনতে পেলেন। একদিন শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে মহোৎসব। সমস্ত বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হলেন। সেই সময়ে তিনি ঐ বৈষ্ণব সাধুটিকেও নিমন্ত্রণ করলেন। সেবার সময়ে আর বৈষ্ণবদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে ঐ সাধুটিকেও তিনি অনুরোধ করলেন। তখন সমস্ত বৈষ্ণবেরা শিরোমণি মহাশয়কে বললেন, “প্রভো! আপনি যা বলবেন বা করবেন

তাই আমাদের শিরোধার্য। তবে আমাদের প্রার্থনা যে, এঁর সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে বসতে আদেশ করবেন না। ইনি বিষম কুকর্ম্য ক'রে পতিত হয়েছেন।” শিরোমণি মহাশয় করযোড়ে সকলকে নমস্কার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “আপনারা এরূপ কথা আর বলবেন না। ইনি মহাত্মা। আমাদের প্রতি ইঁহার বড়ই দয়া। এইরূপ একজন মহাত্মা পুরুষও যদি এরূপ একটা গর্হিত আচরণ করেন, সমাজে তাঁকেও যে কত লাঞ্ছনা, নিন্দা, অপমান ও ঘৃণা ভোগ করতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের প্রতি দয়া করেই, ইনি এই বিষম ভোগ স্বীকার করেছেন।” এই বলে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে ঐ দীনভাবাপন্ন কাতর বিরক্ত সাধুকে নমস্কার করলেন এবং সকল বৈষ্ণবকে বলতে লাগলেন, “আমাকেও আপনারা ত্যাগ করুন; সত্যি সত্যি বলছি, আমি এঁর চেয়েও অনেক অপরাধের কার্য্য করেছি।” এই বলে তিনি নিজ জীবনের অতীত ঘটনা সকল বলতে আরম্ভ করলেন। তখন সকল বৈষ্ণবেরা কাণে হাত দিয়া “প্রভো! থামুন থামুন” বলতে বলতে সাধুকে নিয়ে এক পংক্তিতে সেবা করতে বসলেন। কেহ গুণেও দোষ দেখেন; কেহ বা গুণকে গুণ, আর দোষকে দোষ দেখেন; কারও চক্ষে আবার দোষই পড়ে না; দোষেও গুণই দেখেন। সকলই অবস্থাতে হয়।

সাধকজীবনে দুর্দশা। অসারত্ববোধই নির্ভরতার হেতু।

একদিন পাঠাস্তে ছোট দাদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন—“রাধাকৃষ্ণসংবাদে রাধা কি জীবাত্মা, না অস্ত্র কিছু?”

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—“এ সকল বিষয় অত্যন্ত ছুরাহ, এখন বল্লে এ সব বিষয় কিছু বুঝতে পারবে না। অসময়ে বল্লে, অবস্থা না হ'লে, ভাবার্থ কেহ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; কথার বিকৃত অর্থ ধ'রে নিয়ে, আত্মার অনিষ্ট করে আর বর্ণিত বিষয়ও দূষিত করে। দেখ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃত লিখে জীবগোস্বামীকে নিয়ে দিলেন। জীবগোস্বামী মহাশয় ঐ গ্রন্থ পাঠ ক'রে, উহা প্রচার করতে নিষেধ ক'রে বললেন—যদিও এ গ্রন্থদ্বারা ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে, তথাপি ইহা দ্বারা সাধারণ জনসমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছুই হবে না।

সর্বদা নাম করতে থাক, ভাব, লীলা প্রভৃতি সমস্তই খুলে যাবে। তখন চৈতন্য কে,

খুঁট কে, লীলা কি, আপনা আপনি প্রকাশ হবে। সাধন করতে করতে ধীরে ধীরে পাঁচটি অবস্থা লাভ হয়। শাস্ত, দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর। এই সকল অবস্থা লাভ করতে হ'লে প্রথম কর্ম করতে হয়, খুব সাধন করতে হয়। এ সময় লোভমোহাদি রিপুসকল দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে সাধক পুনঃ পুনঃ বিসম পরীক্ষায় পড়তে থাকেন; কখনও পরীক্ষায় পরাজিত হন, আবার কখনও বা জয়লাভ করেন। সমুদ্রমধ্যে নাবিক একখানি নৌকা নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকলে, সে যেমন কখন উর্দ্ধে কখন বা নীচে তরঙ্গের সঙ্গে উঠে নেবে চলতে থাকে, সাধকও সেইরূপ নানা অবস্থার পরীক্ষাতে উঠে প'ড়ে চলতে থাকেন। এই পরীক্ষার সময়ে অনেক সাধকই সাধন ভজন একেবারে ছেড়ে দেন। নানা-প্রকার ক্রেশ, অশান্তি, শুষ্কতা ও নৈরাশ্যে প'ড়ে একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে যান, কিন্তু সারা-দিনে যদি এই সময়ে অন্ততঃ চার পাঁচটি বারও নাম করতে পারেন, কোন না কোন-প্রকারে উদ্ধার পান। এই বিষম দুঃসময়ে নামস্মরণই উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এইরূপ পরীক্ষা প্রলোভনে পতিত হওয়াও উন্নতির একটি লক্ষণ। অনেকের দুই তিন জন্ম পর্য্যন্ত এসমস্ত পরীক্ষাই জীবনে আসে না। দীক্ষাগ্রহণের পরে সাধনের অবস্থাতে এ সকল প্রলোভন পরীক্ষায় না পড়লে নিজেকে শোচনীয় অবস্থাপন্ন মনে করতে হয়। এই সকল পরীক্ষায় প'ড়েই মানুষের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়। ক্রমে এই সব ছুরবস্থায় প'ড়ে নিজেকে যখন একেবারে অপদার্থ জ্ঞান হয়, 'নিজের কোন ক্ষমতাই নাই, নিজ শক্তিতে একটি সামান্য তৃণও তুলতে পারে না' মানুষে বুঝে, ভক্তি তখন হ'তেই বিকসিত হ'তে থাকে। “আত্মশক্তি” অসার হ'তেও অসার; একমাত্র “ভগবৎশক্তিই সার” বুঝলে তখন সে ভগবানের উপরই নির্ভর করে এবং ভগবানের কৃপায় তখন তার হৃদয়ে “ভগবৎ-তত্ত্বও প্রকাশিত হ'তে থাকে।” কিছুকাল পরে নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন— “অহঙ্কারটি নষ্ট হ'লে শীত, গ্রীষ্ম, মান, অপমানাদি কিছুই আর বোধ থাকে না; কারণ আমিত্ব থাকলেই এই সব থাকে। মানুষ যখন ভগবানে যুক্ত হ'য়ে যায়, তখন সুখ দুঃখ যা কিছু তাদের উপস্থিত হয়, সে সমস্ত ভগবানই গ্রহণ ক'রে থাকেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তদের সে সব কিছুই ভোগ করতে হয় না। এই নিয়মেই প্রহ্লাদ অগ্নি, জল, হস্তী প্রভৃতি হ'তে অনায়াসে রক্ষা পেয়েছিলেন। ভগবন্তেরা ইচ্ছা করলে অনায়াসেই সমস্ত ভোগ হ'তে মুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কখনও তা করেন না। ভক্তেরা সমস্ত ভোগ নিজেরাই করেন। প্রকৃতির মধ্যেও এই একটি সাধারণ নিয়ম দেখা যায় যে, যদি পরস্পর

এক জনে অণ্ড জনকে যথার্থ ভালবাসে, তবে একের কষ্ট হ'লে অণ্ডও তা ভোগ করে। একের শরীরে বেত মারলে অপরের শরীরেও তার চিহ্ন পড়ে।”

ঐকান্তিক ভালবাসার পরিণাম শুভ—দুইটি দৃষ্টান্ত।

এক দিন মহাভারত পাঠের সময়ে অনেক লোক উপস্থিত হইলেন। পাঠান্তে অনেক কথা বার্তা হইতে লাগিল। সরলপ্রাণে একান্তভাবে সমস্ত চিন্তা একটি স্থানে বসাইতে পারিলে, তাহা হইতেই ক্রমে পরমবস্তু লাভের উপায় হয়। এমন কি একটি স্ত্রীলোককে ধরিয়াও জীবনের যথার্থ কল্যাণ লাভ হইয়াছে, দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে ঠাকুর দুইটি গল্প বলিয়াছিলেন, যথা—

কলিকাতা তালতলায় কোনও ষ্টুডেন্টস্ মেসের পাশে একটি সাহেবের বাসা ছিল। সাহেবের একটি অবিবাহিতা যুবতী কণ্ঠা ছিল। মেসের কোনও ছেলের নজর তাহার উপরে পড়িল। কিছু দিন উভয়েই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া একে অন্নের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল। এক দিন ছেলেটি স্থির থাকিতে না পারিয়া সাহেবের বাড়ীতেই প্রবেশ করিল। সে দিন সাহেব টের পাইয়া উহাকে খুব ধমকাইয়া দিলেন। কয়েক দিন পরে আবার এক দিন ছেলেটি সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করায় ধরা পড়িল। সেই দিন সাহেব দারোয়ান দ্বারা কিছু অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মেয়েটিরও ভাব-গতিক দেখিয়া সাহেব বুঝিলেন অবস্থা সহজ নয়। মেয়েটিকে অবিলম্বে তফাৎ করা আবশ্যক মনে করিয়া সাহেব এক দিন মেয়েটিকে লইয়া অন্ত্র যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ছেলেটিও তাহা বুঝিতে পারিয়া রাস্তায় যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব গাড়ী আনাইয়া মেয়েটিকে লইয়া যেমন তাহাতে চাপিতে চেষ্টা করিলেন অমনি ছেলেটি দৌড়িয়া গিয়া মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিল। সাহেব তখন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হস্তস্থিত ষষ্টিদ্বারা ছেলেটিকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিলেন। মেয়েটি তখন সাহেবের লাঠি ধরিয়া মার থামাইয়া দিয়া পিতাকে বলিল, “তোমার ব্যবহার তো ভয়ানক কসাইয়ের মতন দেখিতেছি! কি দোষ পাইয়া উহাকে এরূপ দারুণ প্রহার করিলে! বহুকাল উনি আমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছেন, আমিও উহাকে মনে প্রাণে ভালবাসি। ওঁর কোনও অপরাধই নাই।”—ইত্যাদি বলিয়া মেয়েটি সাহেবের সঙ্গে খুব ঝগড়া করিতে লাগিল। সাহেব আর অপেক্ষা না করিয়া কণ্ঠাটিকে লইয়া ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন, এবং সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিলেন।

এদিকে ছেলেটি সাহেবের প্রহারে মুর্ছিত হইয়া রাস্তায় অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল; পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ‘সে কোথায় গেল, সে কোথায় গেল?’ বলিতে বলিতে চারি দিকে উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে একটি ভাল ফকির ঐ অবস্থায় উহাকে দেখিতে পাইয়া উহার পিছন ধরিলেন। অবসর বুঝিয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইলেন। ছেলেটি কাদিতে কাদিতে ফকির সাহেবকে বলিল, ‘ফকির সাহেব! আমাকে দয়া করুন। তাকে পাই আর না হারাই, এমন উপায় বলিয়া দিন।’ ফকির সাহেব ঐ সময়ে ছেলেটির কাণে একটি

মন্ত্র দিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা, এই মন্ত্র তুমি অবিশ্রান্ত জপ কর, আর মনে মনে সেই মেয়েটির মূর্তি ধ্যান কর।’ এই বলিয়া ছেলেটিকে বাজারের মধ্যে একটি বটগাছের তলায় বসাইয়া দিলেন। ছেলেটি তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিত্রায় একাসনে থাকিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া মন্ত্রজপসহ মেয়েটির রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। ওদিকে মেয়েটিও ছেলেটির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের মত হইয়া এক দিন বাহির হইয়া পড়িল এবং খোঁজ করিতে করিতে অচুসন্ধান পাইয়া ছেলেটির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটি তখন ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল, “ওহে! খার জন্তে এত ক্লেশ পাইয়াছ, সে যে আসিয়াছে, এখন চোখ মেল।” ছেলেটি কণ্ঠস্বর শুনিয়া একপাশে তাকাইয়া তাহাকে দেখিল, আবার সম্মুখের দিকে চাহিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে ব্যস্ততার সহিত দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল, “এ আবার কি! তুমি? না, তুমি? (সম্মুখে চাহিয়া) আমি ত দুটি একই আকৃতি দেখিতেছি। কাল থেকে সর্বদাই তো তুমি আমার নিকট রহিয়াছ (পাশ্বে তাকাইয়া) আবার তুমি কে?” সাহেবের মেয়েটি কিছুক্ষণ উহার ভাবগতিক দেখিয়া অবশেষে ছেলেটি পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া চলিয়া গেল। ফকির সাহেবের মন্ত্রপ্রভাবে এবং ছেলেটি একান্তচিত্তে ধ্যান ও মন্ত্রজপ করাতে ভগবানই তাহার নিকট মেয়ের রূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন।”

এই গল্পটির পরে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—“স্ত্রীলোকেই হউক, আর যাতেই হউক, সমস্তটি প্রাণ একটা স্থানে ঢেলে দিয়ে, একান্তপ্রাণে একচিন্তে বস্তুতে পারলেই তো হয়! তা কি আর সহজ কথা! তা আর হয় কই! প্রকৃত সৌহার্দ আজকাল বড়ই দুর্লভ। এক জনে অগ্ন জনকে সর্বাস্তঃকরণে ভালবাসে, এ বড় দেখা যায় না। অনেকদিন হ’ল শাস্তিপুরে একটি ঘটনা দেখেছিলাম। সেরূপ ঘটনা এখন আর শুনা যায় না।”

ঠাকুর এই বলিয়া, ঘটনাটি এইরূপ বলিতে লাগিলেন—“শাস্তিপুরের এক পাড়ার ভিতরে অল্পবয়সে একটি ছেলে ও মেয়েতে ভালবাসা হয়। যেমন উহাদের বয়স হইতে লাগিল ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাড়ার সকলে উহাদের অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া নানা কুকাণ্ড বলিতে লাগিল। মেয়েটি এক দিন ছেলেটিকে বলিল, ‘দশ জনে নানা কথা বলিতেছে, আর তুমি আমার নিকটে এরূপ এস না।’ ছেলেটি ঐ কথা শুনিয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেল; দিনরাত বিষম যন্ত্রণা পাইতে লাগিল। অবিলম্বে মেয়েটির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে মেয়েটি যখন স্বশুরবাড়ী চলিল, ছেলেটিও কাঁদিতে কাঁদিতে তার পিছনে পিছনে চলিল। সকলে উহাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী ছেলেটিকে দেখিয়া বলিলেন—‘আহা! তুমি যদি কোনও দেবতাকে ঐরূপ ভালবাসতে, তা হ’লে এতদিনে উদ্ধার হ’য়ে যেতে। তুমি কোন দেবতাকে ভালবাস?’

ছেলেটি বলিল, ‘হাঁ, আমি রামকে বড় ভালবাসি।’ সন্ন্যাসী তাহাকে দীক্ষা দিয়া, রামনাম জপ করিতে বলিয়া গেলেন। পাড়ায় এক বাড়ীতে রামমূর্তি আছেন ; ছেলেটি প্রত্যহ সেখানে গিয়া ঠাকুরের নিকট বসিয়া বসিয়া জপ করিত। জপের সময় ছেলেটির দরদর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইত। রামজীকে ভোগ লাগাইয়া সে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। এমন দেখা গিয়াছে খাবার নিয়া দুই তিন দিন রামজার সম্মুখে বসিয়া কান্দিতেছে, তথাপি রামজী প্রসাদ করিয়া না দিলে আহার করে নাই। ঐ ছেলেটি বেশী দিন আর টিকিল না, কিছুকাল পরেই মরিয়া গেল।”

প্রকৃতিতে আসক্তির ছাপ ।

আমাদের গুরুভাই বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাবু শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিবার সময় একটি পিতলের কমণ্ডলু লইয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আহ্বারান্তে ঠাকুর আসনকূটরে আসিয়া বসিবার পরে রাজকুমার বাবু কমণ্ডলুটি লইয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, “এটি আপনার জন্ত আনিয়াছি, আপনি এটি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।”

ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়া সেটা হাতে নিলেন, এবং এদিক ওদিক দেখিয়া উহা মাটিতে রাখিয়া বলিলেন—“আমার একটি কমণ্ডলু র’য়েছে, এটি নিয়ে অশ্বিনীকে দিন। অশ্বিনীর বোধ হয় জলপাত্র নাই। আমার আর আবশ্যক নাই।”

রাজকুমারবাবু আর জেদ না করিয়া কমণ্ডলুটি লইয়া গেলেন। আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—“গ্রহণ করিলেন এই ভাব দেখাইয়া হাতে লইয়া আবার ফিরাইয়া দিলেন কেন? অশ্বিনীর বোধ হয় জলপাত্র আছে।”

ঠাকুর বলিলেন—“থাক্লেও ওটি অশ্বিনীকে দেওয়া ভাল। অশ্বিনীর ওটি নিতে ইচ্ছা হ’য়েছিল।”

আমি বলিলাম—“নেওয়ার ইচ্ছা শুধু অশ্বিনীর কেন, অন্য লোকেরও ত হ’য়ে থাকতে পারে।”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তা হ’তে পারে। তবে একটি জিনিষ দেখে সাধারণ ভাবে নেওয়ার ইচ্ছা এক, আর তাতে আসক্তি হওয়া স্বতন্ত্র কথা।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“কোন বস্তুতে কারও একটা আসক্তি হ’লে বস্তুটি মাত্র দেখে তাহা কি প্রকারে জানা যায়?”

ঠাকুর বলিলেন—“যার যে বস্তুতে আসক্তি হয়, ঐ বস্তুতে তার একটা আকৃতির ছাপ পড়ে। বস্তুটির দিকে তাকালেই ঐ আকৃতিটি বেশ দেখতে পাওয়া যায়।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনি যে কি বললেন, কিছুবুঝলাম না। স্বচ্ছ বস্তুর উপরে শুধু মানুষের

কেন সকল বস্তুই তো প্রতিবিম্ব পড়ে। বস্তুটি সরিয়ে নিলে আর তো প্রতিবিম্ব থাকে না। খুব স্বচ্ছ নির্মল না হ'লে প্রতিবিম্বও তো পড়ে না। আর প্রতিবিম্ব পড়লেও তাহা স্থায়ী হয় কই ?”

ঠাকুর বলিলেন—“স্বচ্ছ বস্তুতে শুধু নয়। মানুষ যে কোনও বস্তু দেখে, তাতেই তার একটা আকৃতি পড়ে। স্বচ্ছ বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা সাধারণে চক্ষু দেখতে পায় মাত্র। আয়নার কাছে দাঁড়ালে চেহারা পড়ে, আর স'রে গেলে তা থাকে না সত্য ; কিন্তু ফটো তুলবার সময়ে, কাঁচে যে ফটো পড়ে, তাহা বন্ধ হ'য়ে যায়, আর উঠে না। তার কারণ কাঁচে যে আরক থাকে তাতেই আকৃতি বন্ধ হ'য়ে পড়ে। সেইপ্রকার সাধারণ ভাবে সকল বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে তাহা স্থায়ী হয় না। আসক্তিরূপ আরক যে বস্তুতে লেগে থাকে তাতে চেহারা পড়লে আর উঠে না, থেকে যায়। চোখ, ষাঁদের একটু পরিষ্কার হ'য়েছে, দৃষ্টি মাত্রেই তাঁরা তা দেখতে পান। এসকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হ'লেই মাত্র জানা যায়, না হ'লে শুনে কিছুই বুঝা যায় না। যে কোন বস্তুতে লোভ হবে, তাতেই আকৃতি বন্ধ হ'য়ে পড়বে, জেনো।”

আমি এসকল কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, “আসক্তিতে ক'রে বিষয়েতে যে চেহারা পড়ে, তাহা কতকাল স্থায়ী হয় ?”

ঠাকুর বলিলেন—“যত কাল যে বিষয়েতে আসক্তি থাকবে, তত কালই তাতে আকৃতি স্থায়ী হবে। আসক্তি নষ্ট হ'লে, আকৃতিও আর থাকে না ; ফটোর আরক নষ্ট হ'য়ে গেলে, যেমন আকৃতিও আর থাকে না।”

জিজ্ঞাসা করিলাম “শাস্ত্রে নাকি আছে যে, বিষয়ে আসক্তিই সংসারাবৃত্তির কারণ ? বিষয়ে আসক্তিহেতু যে আকৃতি পড়ে, তাহাতেই কি পরলোকগত জীবকে সংসারে টানিয়া আনে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তাও বটে। সংসারে আসবার আরও গুরুতর কারণ থাকে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“যে বিষয়ের সহজে মনের যে প্রকার ভাব হয়, ঐ বিষয়েতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা কি সেই ভাবেরই অহরূপ ?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, ঠিক সেইরূপ।”

আমি বলিলাম—“তবে তো বড় বিষম ! গোপন ত কিছু করা যায় না।”

ঠাকুর বলিলেন—“সাধ্য কি যে গোপন করবে, প্রকৃতিতে যে চেহারা আপনা আপনি নিয়ত পড়ছে তাতে আর কারও কি হাত আছে ! যার চোখ আছে প্রকৃতির দিকে তাকালেই তো মুহূর্তমধ্যে সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র দেখে নিবে। গোপন কি আর কেউ কিছু করতে পারে !”

সাধনের অবস্থায় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ।

অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“যথাসাধ্য সাবধানে থাকিয়া নিয়মমত সাধন করিয়া যাইতেছি --অথচ রিপুর উত্তেজনার ক্রমণঃ বৃদ্ধিই তো দেখিতেছি । এইরূপ হইতেছে কেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“তা হয় । যখন যে রিপু একেবারে নষ্ট হবার উপক্রম হয়, তখন তাহা খুব প্রবল হ'য়ে উঠে ; নিরীক্ষণের পূর্বে প্রদীপের মত । ঐ সময়ে রিপুর উত্তেজনা এতই বৃদ্ধি হয় যে, অনেকের সাধন ভঞ্জেও অবিশ্বাস এসে পড়ে । এই সময়টি বড়ই বিষম । সর্বদাই প্রায় উন্মত্তের মত থাকে । এই সময়ে গুরুদত্ত নাম যদি একেবারে ত্যাগ না করে, তা হ'লে কিছু কালের মধ্যেই সাধক নিরাপদে উত্তীর্ণ হ'য়ে, উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে ; না হ'লে বিষম ছুরবস্থায় প'ড়ে যায় । নাম সর্বদা করলে আর কোন ভয়ই থাকে না । কত অবস্থাতে পড়তে হ'বে, তখন নামই একমাত্র অবলম্বন ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনাই যখন থাকে না, কোন প্রকার কল্পনাও যখন মনে একেবারে আসে না, তখন অকস্মাৎ ইন্দ্রিয় বিষম উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে কেন ? এরূপ অবস্থায় কি করা যাইবে ?”

ঠাকুর বলিলেন - “স্নায়ুগুলি খুব দুর্বল হ'লে, অনেক সময়ে ঐরকম হ'য়ে থাকে । ঐ সময়ে কখনও এক স্থানে ব'সে থাকতে নাই, বেড়াইও ; না হয় কারও কাছে যেয়ে গল্প ক'রো । আমার যখন ঐ রকম হ'ত, আমি কয়েক ঘড়া জল অম্লি মাথায় ঢেলে দিতাম ; কখনও বা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায়ে হযরান্ হ'লেই ব'সে পড়তাম । তোমার ঐ সময় স্নান বা দৌড়ান সহ্য হবে না, আসন হ'তে উঠে বেড়ায়ো, তা হ'লেই তোমার আর কোনও ক্ষতি হবে না ।”

গুরুদক্ষিণা, গুরুর আনুগত্য ও গুরুর সঙ্গ বিষয়ে প্রশ্ন ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“পূর্বকালে উপনয়নের পরে গুরুগৃহে থাকিয়া আপন আপন সঙ্কল্প বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন শিষ্য গৃহে ফিরিতেন, গুরুদক্ষিণা দিয়া যাইতেন । আমাদেরও কি কোনও সময়ে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“মোক্ষার্থীদের আর গুরুদক্ষিণা নাই । বঁারা গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন করতেন, তাঁরাই অধ্যয়ন শেষ ক'রে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতেন । সদগুরু দীক্ষা দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনার ক'রে নেন । তাঁকে আর গুরুদক্ষিণা দেবে কি ! আমাদের ওসব নাই ।”

দীক্ষাদান মাত্রেই সদগুরু তো শিষ্যকে আপনার ক'রে নেন, কিন্তু শিষ্য যদি গুরুর সঙ্গে সঙ্গ না রাখেন, তা হ'লে আর বিশেষ লাভ কি হইল ! গুরুর অহুগত হ'লেই গুরুর সঙ্গে সঙ্গ । তা না হ'লে আর গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যোগ কি ? নানাপ্রকার সংশয়ে সর্বদাই তো গুরুতে মতি চঞ্চল করিয়া দিতেছে, সুতরাং এখন আর উপায় কি ? - এইরূপ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“গুরুর অহুগত কি উপায়ে হওয়া যায় ?”

ঠাকুর বলিলেন—“গুরুর অহুগত কি প্রকারে হওয়া যায়, তা বলা যায় না । বৃক্ষ কি উপায়ে বড় হয়, ফুল ফলে সুশোভিত হয়, তা কি কেউ বলতে পারে ? জল, উদ্ভাপাদি এসব পেয়ে বৃক্ষ যেমন বড় হয়, ফল ফুলে শোভিত হয়, এ পর্য্যন্তই বলা যায় ; সেরূপ যথামত গুরুর আদেশ প্রতিপালন করতে করতে মানুষও তেমনই শ্রদ্ধাভক্তি আহুগত্য লাভ করে, এই মাত্র বলা যায় । ঠিক আদেশমত চলতে চেষ্টা করলেই অহুগত যে কিরূপে হয় বুঝবে ।”

গুরুর নিকটে থাকিয়া গুরুতে নিয়ত ভগবদ্বুদ্ধি রাখা অতিশয় কঠিন । সাধারণ মহাত্মার আশ্রয় গুরুতেও অনেক সময়ে চেষ্টা, কার্য ও ভুল ভ্রান্তি দেখা যায় । বরং তফাৎ থাকিয়া গুরুতে ভগবদজ্ঞান সহজ । এই সংশয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“গুরুর সঙ্গে সর্বদা থাকিয়া তাঁর সেবা গুণগ্রহণ করাতে বেশী উপকার, না তফাৎ থাকিয়া তাঁর আদেশমত সাধন ভজন করাতে জীবনের অধিক কল্যাণ হয় ?”

ঠাকুর বলিলেন—“সকলের পক্ষে একরূপ নয় । এক প্রকৃতির লোক আছে, গুরুর নিকটে থাকলে ক্রমশঃ গুরুর প্রতি তাদের সন্দেহ বৃদ্ধি হয় ; সুতরাং তেমন উপকার হয় না । আবার কারও গুরুর নিকটে থাকতেই বেশী উপকার হয় ; প্রকৃতি বুঝে । সকলের একরকম নয় । তবে গুরুর নিকটে থাকলে ক্ষতি কারোই হয় না ; সেবা গুণগ্রহণ থাকলে, বাৎসল্যভাবই কিছু বেশী হ'তে দেখা যায় ।”

ঠাকুরের কথায় এই বুঝিলাম যে, নিকটে থাকিয়া গুরুতে সন্দেহাদি হ'লেও বাৎসল্য ভাবে যে মমতা ও আকর্ষণ জন্মে, তাহা বড়ই দুর্লভ । গুরুতে মমতা ও ভালবাসাই, তাঁহাতে সমস্ত সম্ভাব-আবোপের হেতু হয় ।

বিধিমাৰ্গ ও চঞ্চলতা বিষয়ে উপদেশ ।

এক দিন নির্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আমায় কি আবার সংসারে আসতে হবে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“দেখ খুব চেষ্টা ক'রে এবার সব সেরে নিতে পারলে আর আসবে

কেন ? বাসনাটি জয় করতে পারলে আর আসতে হবে না। বাসনা থেকে গেলেই আবার আসতে হবে।”

জিজ্ঞাস করিলাম—“মোক্ষই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন বিধিপথে আর চলবার আবশ্যক কি ?”

ঠাকুর বলিলেন—“যতকাল ইন্দ্রিয়দমন না হয়, বিধিমার্গ ধরে চলতেই হবে ; কিন্তু ঐ সাধনের উদ্দেশ্য একমাত্র মোক্ষই থাকবে। ইন্দ্রিয়দমনের জন্যই বিধিমার্গে চলা প্রয়োজন। অবস্থাটি হ’য়ে গেলে আর নিজের জন্য বিধির আবশ্যক হয় না। ওটি না হওয়া পর্য্যন্ত বিধি মেনে চলতেই হবে।”

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“পূর্বকালে সমস্ত যোগী-ঋষিরাই কি মোক্ষের সাধক ছিলেন, না অল্প ভাবেরও ছিলেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, অনেকে মোক্ষের সাধক ছিলেন, আবার অনেকে ত্রিবর্গের সাধকও ছিলেন। সকলে একপ্রকারের ছিলেন না, কত প্রকারেরই ছিলেন।”

এক দিন ছোট দাড়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “নাম করিবার সময়ে মন তো স্থির কিছুতেই হয় না, কি করিব ?”

ঠাকুর বলিলেন—“মন কি সহজেই স্থির হয় ? মন স্থির হ’লে ত হ’য়েই গেল। প্রথম প্রথম মন খুব অস্থিরই থাকে, নাম করতে বিষম বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু এ সময় নাম ছেড়ে দিতে নাই ; ঔষধ গেলার মত অনিচ্ছাতেও নাম করতে হয়। জোর ক’রে এ সময়ে নাম না করলে হয় না। নাম করতে করতে এক বার যদি উহা বেশ অভ্যস্ত হ’য়ে যায়, তা হ’লে আর কোন মুশ্কিলই থাকে না। নাম খুব অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়তে নাই, সর্বদাই খুব চেষ্টা রাখতে হয়। চেষ্টা খুব ক’রে যাও, ভগবানের কৃপায় সময়ে সবই হবে।”

আসনের মর্যাদা।

আহারান্তে পূর্বের ঘরে বসিয়া আজ ঠাকুর আমাকে একটি আসন দেখাইয়া বলিলেন—

আষাঢ় ১৩ই—৩২শে। “এই প্রকার আসন ক’রে সর্বদা বসতে চেষ্টা ক’রো। এটি এমন

অভ্যাস করবে যে, যেখানে সেখানে বসতে হ’লেই যেন এই আসন

ক’রে বসতে পার।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আসন কত প্রকার আছে ? এই আসন কি সব চেয়ে ভাল ?”

ঠাকুর বলিলেন—“চৌরাশি লক্ষ জীব, আসনও চৌরাশি লক্ষ। তন্মধ্যে চৌরাশিটি

প্রধান বলেছেন, এই চৌরাশি আসনের মধ্যে আবার পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধাসন সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার উপকারিতা অসাধারণ। সমস্ত আসনেরই একটা একটা প্রয়োজন আছে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“সাধু সম্রাসীরা যেমন বস্ত্রের স্বতন্ত্র আসন রাখেন, আমরাও কি সাধন ভজনের জন্য সেরূপ আসন রাখতে পারি?”

ঠাকুর বলিলেন—“এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, ইচ্ছা করলে তাঁরা সকলেই স্বতন্ত্র আসন রাখতে পারেন। তবে আসনের মর্যাদা রক্ষা করতে না পারলে তা না নেওয়াই ভাল।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আসনের মর্যাদা কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয়?”

ঠাকুর বলিলেন—“আসন নিয়ম মত একটা স্থানে পেতে রেখে, প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাতে বসে সাধন ভজন করতে হয়। ধর্মবিষয়ে যাহা কিছু অনুষ্ঠান এই আসনে বসেই করতে হয়। অন্য কাকেও ওতে বসতে দিতে নাই। অশুভ বসলেই আসনের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। আসনের পবিত্রতারক্ষাই আসনের মর্যাদারক্ষা। আসন একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখতেই বেশী উপকার। আসন অল্প সময়ের জন্যও তুলতে হ’লে, অন্ততঃ একটি তৃণও এই স্থানে ফেলে রাখতে হয়, আসনের স্থানটি কখনও একেবারে শূন্য রাখতে নাই।”

জীবমুক্তের কথা—মৃত্যু ও অপমৃত্যু।

আজ মহাভারতপাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“যাহারা জীবমুক্ত হ’য়ে যান, তাঁহারা ইচ্ছা করলে আবার কি সংসারে আসতে পারেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, ইচ্ছা করলে আর পারবেন না কেন?”

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“জীবমুক্ত ব্যক্তি সংসারে এলে, সংসারের পাপশ্রোতে প’ড়ে তাঁদের কোনও অনিষ্ট হয় না?”

ঠাকুর বলিলেন—“অনিষ্ট কি তাঁদের আর হ’তে পারে! তাঁরা সংসারে এসে কিছুকাল সংসারের জন্য কার্য্য ক’রে চ’লে যান। সঙ্গদোষে প’ড়ে তাঁদের ভোগের ইচ্ছা হ’লেও, ওতে তাঁরা একেবারে আবদ্ধ হ’য়ে পড়েন না, উপর হ’তেই নানাপ্রকার বাধা আসে। তেমন দেখলে মহাপুরুষেরাই তাঁদের সরিয়ে নিয়ে যান, যেমন লালের হ’য়েছিল।”

আমি বলিলাম—“লাল তো বিষ খেয়ে মরেছিল। অপমৃত্যু ঘটতে কি তাকে দণ্ড পেতে হয় নাই?”

ঠাকুর বলিলেন—“লাল বিষ খেয়েছিল বটে, কিন্তু উহার দেহত্যাগের মুহূর্ত্তেই মহাপুরুষেরা মৃত্যুকে আহ্বান ক’রে, ওর জীবাত্মাকে গ্রহণ করতে বলেন; তাতেই ওর অপমৃত্যু ঘটে নাই। কোন অপরাধেও পড়তে হয় নাই, দণ্ডও হয় নাই।”

এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার বুঝিবার জন্ত প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বলিলেন—“প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মৃত্যু এসে জীবাত্মাকে গ্রহণ করলেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; আর অকস্মাৎ কোনও দুর্ঘটনায় জীবাত্মা দেহে থাকা সত্ত্বেও প্রাণবায়ু বহির্গত হ’য়ে গেলে ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক হয়। উহাই অপমৃত্যু, ওরূপ হ’লেই অসদগতি হ’য়ে থাকে।”

রুদ্রাক্ষধারণের আদেশ; ব্রহ্মচর্যের জন্ত উৎকণ্ঠা।

সকাল বেলা আমার নিত্যকর্ম শেষ করিয়া এগারটা পর্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি। আজ দেবীভাগবত পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—“তুমি রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করলে বিশেষ উপকার পাবে। ভাল পাকাদানা বড় বড় রুদ্রাক্ষ একশ আটটি আনায়ে নেও। কাশীতে ভাল রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। খাঁটি রুদ্রাক্ষ পরীক্ষা ক’রে নিতে হয়। নিত্যহোম যাঁহারা করেন, ‘যোগপাট’ও তাঁদের ধারণ করতে হয়। একটি যোগপাটও আনিয়া নেও।”

• ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কাশীতে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী (তাবাকাস্ত গাঙ্গুলী) মহাশয়কে একশত আটটি বড় বড় খাঁটি রুদ্রাক্ষ এবং একটি যোগপাট পাঠাইতে লিখিলাম। খুব শীঘ্রই তিনি উহা পাঠাইয়া দিবেন আশা করি।

ঠাকুর আমাকে এক বৎসরের জন্ত ব্রহ্মচর্য দিয়াছিলেন। তাহা ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই এক বৎসর কতপ্রকার বিষম প্রলোভন পরীক্ষাতে পড়িয়া ঠাকুরকে ভাকিয়া তাঁরই অসাধারণ রূপায় মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছি; উহা মনে হইলে ভয়ে প্রাণ জড়সড় হয়, আতঙ্কে অস্থির হই। ঠাকুরের দুর্লভ সঙ্গলাভে সম্পূর্ণ নিরাপদে পরমানন্দে দিন যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা ত জ্ঞানি না এই সৌভাগ্য আমার আর কত দিন! যদি কর্মবিপাকে সঙ্গচ্যুত হই, এ বৎসর আবার কোন্ মুখে, কি শাহসে, ঠাকুরের নিকটে ব্রহ্মচর্য লইতে যাইব! এই ব্রতে অটল থাকিতে পারিব, ব্রতদানকালে এরূপ অভয় তিনিই দয়া করিয়া দিয়াছিলেন। এখন একান্তপ্রাণে অহ্নিশ নাম করিতে করিতে এই প্রার্থনাই করিতেছি, ঠাকুর সন্তুষ্টচিত্তে আমার প্রতি প্রসন্ন হ’য়ে এবারও ব্রহ্মচর্য ব্রত দিয়ে চিরকালের জন্ত আমাকে তাঁর শাস্তিপ্রদ শ্রীচরণের অম্লগত সেবক করিয়া রাখুন। আমার নিজের আর কোন ক্ষমতা নাই।

ব্রহ্মচর্যের প্রথম বৎসর অতীত ।

আজ প্রত্যবে স্নানান্তে জপ, হোম, প্রাণায়াম ও পাঠ সমাপন করিয়া বেলা প্রায় নয়টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বলিলাম । নিৰ্জন পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—
 “আজ আমার ব্রহ্মচর্যের এক বৎসর পূর্ণ হইবে ।”

ঠাকুর বলিলেন—“কাল থেকে আবার এক বৎসরের জন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য নিও । নিয়ম যা ছিল তাই থাক্বে, বিশেষ কিছু আর করতে হবে না । ওসব নিয়মই আরও দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালন ক’রে চলতে চেষ্টা কর্বে ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আগামী বৎসরেও কি হোম করতে হবে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“হ্যাঁ, হোমটি প্রতিদিনই কর্বে । ব্রাহ্মণের জন্য ত নিত্যহোমের ব্যবস্থা । গায়ত্রী, হোম কি ত্যাগ কর্তে আছে ?”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“তর্পণ যেমন করিতেছি, এখনও কি তেমনই করিব ?”

ঠাকুর বলিলেন—“হ্যাঁ, তর্পণটি প্রতিদিনই কর্বে । ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এ সব নিত্যকর্ম ; এর একটিও বাদ দিতে নাই । যথাসাধ্য এ সকল প্রতিদিনই কর্তে হয় ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“এ সব যজ্ঞ কি প্রকারে কর্তে হয় ?”

ঠাকুর বলিলেন—

“ব্রহ্মযজ্ঞ—ঋষিপ্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, সন্ধ্যাগায়ত্রীজপ ইত্যাদি ।

পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি, অন্ততঃ প্রতিদিনই তর্পণটি কর্তে হয় ।

দেবযজ্ঞ—হোম, পূজা, যা ক’রে থাক ।

ভূতযজ্ঞ—জীবসেবা—মহুয়া, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সর্বজীব সেবা প্রতিদিনই কর্তে হয় ।

নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবা ।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ ।

হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥

এ সকল প্রতিদিন কেহ নিয়মমত ক’রে গেলে, কিছুদিনই বুঝতে পারে এর কি উপকারিতা ।”

শ্রাবণ ।

দ্বিতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্যের উপদেশ ।

সকাল বেলা ঠাকুরের নিকটে ঘাইয়া বসিতেই ঠাকুর আমাকে বলিলেন—“এবার আবার এক

বৎসরের জন্ম তোমাকে ব্রহ্মচর্য ব্রত দেওয়া হ'লো । এ বৎসরে

১শা শ্রাবণ ।

বিশেষ নিয়ম—পৃষ্ঠ না হ'য়ে কথা বলবে না ; জিজ্ঞাসিত বিষয়েও

প্রয়োজন বোধ হ'লেই উত্তর দিবে ; উত্তরটি যত সংক্ষেপে হয়, ততই ভাল ; খুব

প্রয়োজনীয় বিষয়ই মাত্র জিজ্ঞাসা করবে । এই মত চলতে পারলে খুব উপকার পাবে ।

পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখবে । অঙ্ককারেও ঐদিকে লক্ষ্য রাখবে । তার পর

নিত্য হোম করবে এবং অধিক পরিমাণে গায়ত্রী জপ করবে ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“যে সব গ্রন্থ পাঠ ও যে ভাবে হোম এতদিন করেছি, ঠিক তেমনই কি করব ?”

ঠাকুর বলিলেন—“প্রত্যহ ভোর বেলা স্নান ক'রে এসে চণ্ডী ও গীতা এক অধ্যায়

ক'রে নিত্য পাঠ করবে । পরে কিছুকাল ইষ্টনাম জপ ক'রে অন্ততঃ একশত আট বার

গায়ত্রী জপ করবে । তারপর একটু হোম ক'রো । কাঠের বিশেষ নিয়ম রাখবার আর

আবশ্যক নাই । ঘূতেরও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ না রাখলেও চলবে ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“ব্রহ্মচর্য কি এক বৎসর করেই নিতে হয় ?”

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—“তা কিছু নয় । বার বৎসর ব্রহ্মচর্য করতে হয় । তবে

তোমাকে এবারও এক বৎসরের জন্মই দিলাম । এক বারে বেশীকালের জন্ম দিতে ভরসা

হয় না ; যদি নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ফেল ! এক বার ব্রত ভঙ্গ হ'য়ে গেলে, বড় দোষ । নিয়মটি

ঠিকমত রক্ষা ক'রে চললে, আগামী বৎসরে আবার পাবে । এরূপই ভাল । যেরূপ চলছে

এই প্রকার চলতে পারলে ১২ বৎসরও করতে হবে না—৯ বৎসরেই ব্রহ্মচর্য হয়ে যাবে ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“শ্রীবৃন্দাবনে যে দিয়েছিলেন, এবারও কি তাই, না কিছু বিশেষ আছে ?

আগামী বৎসরে যদি আমি আপনার সঙ্গে না থাকি, তা হ'লে কি করব ?”

ঠাকুর বলিলেন—“শ্রীবৃন্দাবনে যা পেয়েছিলে তাই ; নূতন কিছু নয় । তবে বছর বছর

ব্রত নিয়ে পাঠ বৃদ্ধি করতে হবে । আগামী বৎসরে আমাকে না পেলেও নিজেই টের

পাবে । সেজন্ম ব্যস্ত হ'তে হবে না । এর পর একাদশস্কন্ধ ভাগবত ও যোগবাশিষ্ঠ

পড়তে হবে ।”

আমি আর বেশী কথা না তুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িলাম ।

ক্রোধে স্বপ্নদোষ ।

দ্বিতীয় বৎসর ব্রহ্মচর্যাগ্রহণের পরে মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইল । আহারের চাউলও

ফুরাইয়া গিয়াছে । এক এক বারে চারি পাঁচ সের চাউল আনিলে আমার শ্রাবণ, ১ই—২ই ।

মাসাধিক কাল চলিয়া যায় । বাড়ী যাইয়া কয়দিন নিজেই মাতাঠাকুরাণীর রান্না করিয়া তাঁহার প্রসাদ পাইলাম । আহারের নিয়ম বাড়ীতে কখনও ঠিক রাখিতে পারি না । মাতাঠাকুরাণীর আগ্রহে অসময়ে এবং তাঁহার প্রসাদ বলিয়া মিষ্ট টক ইত্যাদি তিন চারি তরকারিও খাইতে হয় । ঠাকুরকে এ সব বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলাতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন “মা’র প্রসাদ খুব খাবে ; ওতে কোনও ক্ষতি হবে না, উপকারই হয় ।” আমারও বেশ সুবিধা হইয়াছে । যখন ঘাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেই বলি ; তনিও খুব আদর করিয়া সেই সকল আমাকে প্রসাদ করিয়া দেন । আশ্রমে যখন থাকি তখন একমাত্র থিঁচুড়ী ব্যতীত সারা দিনরাত্রিতে আর কিছু খাবার পাই না ; ঠাকুরের প্রসাদ ভাগাভাগি এক গ্রাস মাত্র পাইয়া থাকি । এবার নূতন ব্রহ্মচর্যা লইয়া খুব কড়াকড়ি চলিব স্থির করিয়া মাতাঠাকুরাণীর মিষ্টান্ন প্রসাদও গ্রহণ করিলাম না । মাতাঠাকুরাণীর জেদ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধ হইল, খুব ঝগড়া করিলাম এবং চারি পাঁচ সের চাউল লইয়া আশ্রমে চলিয়া আসিলাম ।

আশ্রমে আসিবার পরে ক্রমাগত তিনরাত্রি স্বপ্নদোষ হইল । মাথা গরম হইয়া গেল । এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্নদোষের উৎপাত কমিল না । ঠাকুরের উপরে অভিমান আসিল । ঠাকুরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“এখন ত আমি ঠিক নিয়ম ধরিয়া চলিতেছি, তবে আবার স্বপ্নদোষ হয় কেন ?”

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—“শুধু আহারের নিয়মই কি নিয়ম ? ব্যবহারের নিয়ম, নিয়ম নয় ? তা কতটা প্রতিপালন কর ? বাড়ী যেয়ে কারও উপর রাগ করেছিলে ? রাগ করলে শরীরের রক্ত বিকৃত হয়, তাতেও খুব স্বপ্নদোষ হয় । শরীরের রক্ত সর্বদা শীতল রাখতে হয় ।”

রাগ করিলে স্বপ্নদোষ হয়, আজ এই এক নূতন কথা শুনিলাম এবং লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম ।

ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার উৎসাহ ও বাধা ।

মহাত্মারতপাঠের পর শ্রীযুক্ত শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কথামত ঠাকুরকে বলিলাম—“আপনার

জীবনের কতকটা ঘটনা ‘আশাবতীর উপাখ্যানে’ বহুকাল হয় লিখেছিলেন

১০ই শ্রাবণ, শনিবার ।

শুনেছি । ঐ পুস্তকে যে পর্য্যন্ত লেখা আছে, তার পরের ঘটনাগুলি জান্তে

অনেকের খুব আকাঙ্ক্ষা । আপনি যদি অবসরমত একটু একটু করে বলেন, আমি লিখে যেতে পারি ।”

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—“তা বেশ । একটা নিয়ম ক’রে নেও ; প্রত্যহ পাঠের পর মধ্যাহ্নে এক ঘণ্টা ক’রে লিখলেই হবে । আমি ব’লে ব’লে যাব ; কাগজ পেন্সিল নিয়ে ব’সো । ইচ্ছা হ’লে কাল থেকেই লিখতে পার ।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল । অপরাহ্নে পণ্ডিতদাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন । গুরুভাতারা অনেকেই খুব আনন্দিত হইলেন ।

আজ মধ্যাহ্নে মহাভারতপাঠান্তে কাগজ পেন্সিল হাতে লইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—“আপনি এখন ১১ই, রবিবার । বল্লেই আমি লিখে যেতে পারি ।”

ঠাকুর একটু সময় স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন—“ওসব থাক্ । আশাবতীর উপাখ্যান বামাবোধিনী পত্রিকায় যখন আমি লিখতে আরম্ভ করলাম, সামান্য একটু লিখতেই চারি দিকে বিষম হৈ চৈ প’ড়ে গেল । ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হ’য়ে ঐপ্রকার সব লিখছি, সাধারণ ব্রাহ্মদের ভিতরে এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন চল্লে । প্রাণের সত্য ঘটনার উপরে লোকের অনাদর অশ্রদ্ধা দেখে, বড়ই দুঃখ হ’ল । অমনই লেখা বন্ধ ক’রে দিলাম । আশাবতীতে যাহা লেখা হ’য়েছে তা ত কিছুই নয়, অতি সামান্য । তার পরের সব ঘটনা আরও অভূত । সে সব কেহ বিশ্বাস করবে না । গুলিখোরের গল্প মনে করবে । তাই ওসকল আর প্রচারিত না হওয়াই ভাল ।”

ঠাকুরের এ কথা শুনিয়া আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল । আমি একটু সময় অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম । ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমার পানে চাহিতে লাগিলেন । আমি ঠাকুরকে বলিলাম—“আমরা প্রচার কর না ; শুধু আমাদেরই মধ্যে রাখ্ । জীবনের ওরূপ আশ্চর্য ঘটনাগুলি চিরকালের জন্ত একেবারে লুপ্ত হ’য়ে যাবে ; কেহ কিছু জান্বে না !”

ঠাকুর আমার প্রাণের ক্লেশ বুঝিয়া খুব স্নেহভাবে বলিলেন—“আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই সময়ে তোমাদের নিকটে প্রকাশ পাবে । সেজন্ত এখন এত ব্যস্ত হ’চ্ছ কেন ? এখন থেমে যাও, সময়ে সবই হবে ।”

ঠাকুরের এই কথার পর আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইল । ভাবিলাম ঠাকুর যখন পরিষ্কার বল্লেন, ‘সময়ে সবই প্রকাশ পাবে’ তখন আর চিন্তা কি ? না হয় দু’দিন পরে হবে ।

ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের কথা ।

মধ্যাহ্নে পাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“সন্ন্যাসগ্রহণ কর্তে হ’লে, সকলকেই কি আগে ১৩ই, শ্রাবণ, মঙ্গলবার । ব্রহ্মচর্য্যাহুষ্ঠান ক’রে নিতে হয় ?”

ঠাকুর শুনিয়ে বলিলেন—“ব্রহ্মচর্য্য না করলে কখনও বৈদিকসন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার হয় না।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“কত কাল এই ব্রহ্মচর্য্য করলে বৈদিকসন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার হয়? ব্রহ্মচর্য্য কি সকলকেই নির্দিষ্ট একটা কালের জন্ত করিতে হয়?”

ঠাকুর বলিলেন—“সকলের পক্ষে এক রকম নয়। কারও ছত্রিশ বৎসর, কারও চব্বিশ বৎসর, কারও বা বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করা আবশ্যিক হয়। আবার কেহ নয় বৎসর, কেহ ছয় বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর ক’রেই সন্ন্যাস নেবার অধিকারী হন। আমাদের তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য করতে হয়েছিল।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনি আবার ব্রহ্মচর্য্য কবে করেছিলেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“দীক্ষাগ্রহণের পরেই আমি সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলাম। পরমহংসজী বল্লেন—‘এমনি তো হবে না, যথাশাস্ত্র সম্ভব করতে হবে! তুমি কাশীতে চলে যাও, তোমাকে সন্ন্যাস দিতে হরিহরানন্দ সরস্বতী সেখানে রয়েছেন।’ আমি গয়া হ’তে হেঁটে হেঁটে কাশী পৌঁছিলাম। হরিহরানন্দ সরস্বতীর দর্শন পেলাম। তিনি আমাকে বল্লেন, ‘তোমাকে সন্ন্যাস দেবার জন্তই আমি এখানে এসেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তোমার আরও করবার আছে। অনেক অনাচার করেছ, এখন মন্তকমুণ্ডন ক’রে প্রায়শ্চিত্ত কর। পরে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর; তার পরে সন্ন্যাস। আমিও অমনি মন্তক মুণ্ডন ক’রে, প্রায়শ্চিত্ত করলাম। পরে উপবীত ধারণ ক’রে ব্রহ্মচর্য্য নিলাম। তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য করার পরই তিনি আমাকে সন্ন্যাস দিলেন।”

আমি বলিলাম—“সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও ত আপনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছেন।”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, সন্ন্যাস নিয়ে আমি আর ফিরব না মনে করেছিলাম। পরমহংসজীকে বলাতে তিনি বল্লেন তা হবে না। সংসারে তোমার অনেক কাজ করতে হবে—যেমন ছিলে তেমনি গিয়ে থাক, সংসারেই সব হবে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার গৈরিক বসন কি তখন থেকে?”

ঠাকুর বলিলেন—“না, গৈরিক আরও পূর্বে। গয়াতে যখন ছিলাম, পাহাড়ে একটি পরমহংস তাঁর গৈরিক বসন আমাকে দিয়ে বল্লেন, ‘আমার এই গৈরিক বস্ত্র তুমি গ্রহণ কর, আর তোমার নামটি আমাকে দেও।’ সেই থেকে আমার গৈরিক।”

ঠাকুরের আরও এরূপ অনেক কথা শুনলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দৃশ্য ।

আজ আমার শরীর অসুস্থ । মধ্যাহ্নে ঠাকুরের নিকট নামমাত্র মহাতারত পাঠ করিলাম । ঠাকুর ধ্যানস্থ হইলেন ; আমিও একপাশে বসিয়া বাতাস ১৪ই প্রাণ, বৃথাবার । করিতে লাগিলাম । ঠাকুর ভাবাবেশে পুনঃ পুনঃ চলিয়া চলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন । প্রায় একটার সময়ে ঠাকুর অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন এবং খুব ব্যস্ততার সহিত ঘরের পশ্চিম দিকের দরজার ভিতর দিয়া পশ্চিমোত্তরে আকাশ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—“আহা ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !! কি সুন্দর !!! সোণার রথ, কি শোভা ! ধন্য ! ধন্য !! ধন্য !!! হলুদ রংয়ের কত পতাকা উড়ছে ! আহা ! সমস্ত আকাশ আজ হলুদ রংয়ের উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝলমল করছে । চারিদিকে কত সুন্দরী সুন্দরী দেবকন্যা ! দেবকন্যারা চামর নিয়ে বীজন করছেন, অঙ্গরাসকল নৃত্য ও গান করছেন ! আহা কত আনন্দ ! আজ গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়া আকাশপথে সকলে আনন্দ কর্তে কর্তে যাচ্ছেন । মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চল্লেন ! হরিবোল ! হরিবোল !”

ঠাকুর আর কথাবার্তা না বলিয়া চোখ বুজিলেন । সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুমূত্র রোগে শয্যাগত, একপাশে একটা কথা কিছু দিন হয় সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল । স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ রটনার বিরুদ্ধে তখনই প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—‘আমার চৌদ্দপুরুষেও বহুমূত্র রোগ নাই, ইত্যাদি । উহা পড়িয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ সুস্থ আছেন এ পর্য্যন্ত এইরূপ সংস্কারই আমার ছিল । সুতরাং ঠাকুরের ভাবাবেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঐ সকল কথা গুলিয়া মনে করিলাম—হয় ত ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ জীবনেরই একটা চিত্র দর্শন করিয়া ঐ সব কথা বলিলেন । কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই খবর পাইলাম দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করিয়াছেন । স্থল কলেজাদি সমস্ত বন্ধ হইল । জয় বিদ্যাসাগর ! ধন্য বিদ্যাসাগর !!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঠাকুর আজ অনেক কথা বলিলেন—তাই একটি মাত্র লিখিতেছি—

ঠাকুর বলিলেন—“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় পুস্তকখানা প্রকাশ হ’তেই সর্বত্র ছেলেদের পাঠ্য হ’লো ! আমি ঐ পুস্তকখানা প’ড়ে দেখলাম, ওতে ভগবানের নাম গন্ধও নাই । আমার মনে বড়ই দুঃখ হ’লো ; আমি অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়ে বললাম, ‘সাধারণ প্রয়োজনীয় সকল বস্তুরই খুব সহজে যাহাতে একটা বোধ জন্মে,

বোধোদয়খানা সেভাবেই লিখেছেন। কিন্তু মানুষের সংসারে সর্বাপেক্ষা যে বিষয়ের বোধ থাকা বেশী আবশ্যিক, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নাই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার কথা শুনে একটু লজ্জিত হ'য়ে বললেন, “হাঁ, গৌসাই ঠিকই ব'লেছে। আচ্ছা আগামী সংস্করণে গোড়াতেই আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লিখ'বো।” পরে দেখলাম বোধোদয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। সকলের কথাই তিনি মন দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে শুনতেন।

তারপর মেডিকেল কলেজের গৌলমাল সম্বন্ধে ঠাকুর বিদ্যাসাগরের দয়া ও সংসাহসের কথা বলিলেন। এ সময়ে আমি দু'একবার আসন হইতে উঠিয়া যাওয়াতে সমস্ত কথা আগা গোড়া শুনিতে পাইলাম না। স্বতরাং গুরুভাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয় ঠাকুরের নিকটে শুনিয়া এ বিষয়ে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বে সেই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বাঙ্গালা বিভাগের একটি ছাত্রকে চোর সন্দেহ করিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করেন এবং ঐ বিভাগের ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ছোট লোক ও অসভ্য বলিয়া প্রকাশ্যভাবে দোষারোপ করিয়া গালাগালি দেন। ইহাতে ছাত্রেরা সকলেই অতিশয় অপমান বোধ করেন, তাঁহার। গোস্বামী মহাশয়কে নেতা করিয়া অনেকেই এককালে কলেজ ত্যাগ করিলেন। সর্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল। চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া খুব আলোচনা চলিল। ইহার একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায় গোস্বামী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে বহুসংখ্যক সহাধ্যায়ীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। দু'চারটি কথা বলিতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ধমক দিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, “যাও যাও, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। ছেলেরা অনেক সময়ে মিছামিছি ওরূপ অনর্থক গোল করে।” এই বলিয়া তিনি কোন কথা শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে গোস্বামী মহাশয় খুব ভেজের সহিত বলিলেন—“আপনি আমাদের কোন কথা না শুনেই একটা স্থির ক'রে নিচ্ছেন কেন? আমাদের দু'টা কথা শুনে পরে যা ইচ্ছা বলুন। বাঙ্গালা বিভাগে যাঁরা পড়েন, তাঁদের কি একটা বংশের বা জাতির মর্যাদা নাই? ইহার। সকলেই কি ইতর, ছোট লোক, চোর, বদমায়েস; আপনিও একথা বলেন?” বিদ্যাসাগর একথা শুনিয়া অমনি চমকিয়া বলিলেন, “কি ব'ল্ছ গৌসাই? এরূপ! কি ব্যাপার বলত?” তখন গোস্বামী মহাশয় সমস্ত ঘটনা আত্মপুর্সিক বর্ণনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন—“বটে, এ রকম ঘটনা? তবে আর তোমরা কলেজে যেও না। দেখি আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি না।” এই বলিয়া তিনি তদানীন্তন ছোটলাট বীডন সাহেবের নিকট সমস্ত বিষয় পরিষ্কার রূপে লিখিয়া জানাইলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যখন শুনিলেন যে অনেক ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, ঐ বৃত্তির দ্বারাই তাহাদের আহারাদি চলিতেছিল, উপস্থিত তাহাদের অতিশয় ক্লেশ

হইয়াছে ; অনেক ছেলে আবার এই বৃত্তির টাকা হইতেই অসহায় বৃদ্ধ মাতাপিতারও কিছু কিছু সাহায্য মাসে মাসে করেন। তখন তিনি সকলের বৃত্তির টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া তিন চারি মাস কাল সকলের প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন। বীডন সাহেবের আদেশে এই বিষয়ের অল্পসন্ধান হইল। কলেজের অধ্যক্ষের দোষেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল। এইজন্ত অধ্যক্ষকে ক্রটি স্বীকার করিতে হইল। এই ঘটনায় কলেজের অধ্যাপকগণ গোস্বামী মহাশয়কে দলের নেতা জানিতে পারিয়া কোন প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের আর কলেজে যাওয়ার প্রবৃত্তি হইল না ; সুতরাং তাঁহাদের আশা ব্যর্থ হইল। কিছুদিন পরে অগ্রতম অধ্যাপক তামিজ খাঁ মহাশয়ের সহিত গোলদীঘির ধারে গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তখন তামিজ খাঁ, গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—“গৌসাই, তুমি কলেজে না যাইয়া বড়ই ভাল করিয়াছ, নচেৎ তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত।”

রুদ্রাক্ষধারণ ; নীলকণ্ঠবেশ।

কাশী হইতে রুদ্রাক্ষের মালা আসিয়াছে, উহা ঠাকুরকে দেখাইলাম। ঠাকুর মালাগুলি ১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার। হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন—“চমৎকার দানা। সমস্তগুলিই ভাল, বেশ পাকা। এসব ঠিকমত গাঁথে নেও।”

আমি কয়েক দিন পরিশ্রম করিয়া ছুঁচ ও শণের দ্বারা রুদ্রাক্ষের প্রতি রক্তে রঞ্জে যে সকল শিকড় ছিল তুলিয়া ফেলিলাম। পরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গেলাম। ঠাকুর দেবীভাগবত খুলিয়া উহা যে প্রণালীতে ধারণ করিতে হইবে শ্লোক পড়িয়া উহা বুঝাইয়া দিলেন—

রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মন্তকে বিংশতি দ্বৈ

ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলকৃতে দ্বাদশ দ্বাদশৈব।

বাহেবারিন্দোঃ কলাভিন্নয়নযুগকৃতে ত্বেকমেকং শিখায়াং

বক্ষস্তৃষ্ঠাধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ ॥

আমি ঠাকুরের আদেশমত কণ্ঠে ৩২টি, মন্তকে ২২টি, কর্ণদ্বয়ে ৬টি করিয়া ১২টি, করযুগলে ১২টি করিয়া ২৪টি, বাহুদ্বয়ে ৮টি করিয়া ১৬টি, শিখাতে ১টি এবং বক্ষে অবশিষ্ট ১টি, মোট ১০৮টি, মালা পৃথক পৃথক করিয়া গাঁথিয়া রাখিলাম।

আজ ১৬ই শ্রাবণ একাদশী তিথিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পূর্বেরপরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রন্থি দেওয়া নূতন উপবীত, যোগপাট এবং রুদ্রাক্ষের মালা ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলাম। ঠাকুর উপবীত হাতে লইয়া দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করিয়া আমার গলায় ফেলিয়া দিলেন। পরে যোগপাট

স্পর্শ করিয়া আমার হাতে দিলেন। তৎপরে রুদ্রাক্ষের মালাগুলি হাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অনন্তর উহা আমাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন—“ইহাই নালকণ্ঠবেশ।”

আমি ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুরের পাশে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আজ আমাকে নীলকণ্ঠ মহাদেবের বেশ দিলেন মনে করিয়া, আমার শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠিল। কাদিতে কাদিতে আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—“ঠাকুর! দয়া করিয়া আমাকে যেমন এই বেশ দিলে, তোমার দয়াতেই যেন এই বেশের মধ্যাদা রক্ষিত হয়। নিয়ত যেন অল্পগত থাকি।” এগারটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। কি ভাবে যে এই সময়টি আমার চলিয়া গেল বলিতে পারি না। ঠাকুর শোচে গেলেন, আমিও আসন হইতে উঠিয়া আশ্রমস্থ সকল গুরুভ্রাতাদের নমস্কার করিলাম। সকলেই প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। মধ্যাহ্নে মহাভারতপাঠের পরে পাঁচটা পর্য্যন্ত পরমানন্দে নামে মগ্ন থাকিয়া কাটাইলাম।

সাধনে দৈহিক উপসর্গ।

দ্বিতীয় বৎসর ব্রহ্মচর্যাগ্রহণের পর নূতন নিয়ম প্রতিপালনের উৎসাহ উত্তম ক্রমঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া সমস্ত নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। এখন দিন দিন শরীরে যষ্ণুণা আমার এতই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কি করিব বুঝিতেছি না। পদাঙ্গুষ্ঠে সর্বদা দৃষ্টি স্থির রাখিবার জ্ঞাত অনবরত একভাবে মাথা হেঁট করিয়া থাকিবার ফলে আজ কয়দিনব্যাবস্য ঘাড়ে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, সমস্ত ঘাড় যেন পাকিয়া গিয়াছে। এই যাতনা সময়ে সময়ে এতই তীব্র হইয়া পড়ে যে কাদিতে ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাসিত না হইলে কথা বলিতে পারিব না এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ না হইলে উত্তর দিতে পারিব না, এইপ্রকার আদেশ করিয়া ঠাকুর আমাকে প্রকারান্তরে মৌনীয় করিয়া রাখিয়াছেন। সারাদিনে রাত্রে দুই চারিটি কথাও বলিতে পাই না। প্রাণ সর্বদা আই চাই করে; মনে হয় নির্জনে কোথাও যাইয়া চীৎকার করিয়া আসি। ঘন ঘন হাই তুলিয়া সময় কাটাইতেছি। গুরুভ্রাতারা আমাকে একবার একটি মাত্র প্রশ্ন করিলেই আমি দশটি কথা বলিয়া উত্তর দিব প্রত্যাশায় যেমনই কারও হাতখানা ধরিয়া টান দেই, সে অমনি কথাটি মাত্র না বলিয়া আমার টিকিটি টানিয়া ছু'এক পাক ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দেয়। প্রশ্ন পাইবার আকাজ্জক্য কোনও গুরুভ্রাতার গা ঘেঁসিয়া বসিলে, সে উঠিয়া নীরবে আমাকে সজোরে ঠাসিয়া ধরে; আমার তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কখনও কেহ বা শুঁতা মারিয়া সরাইয়া দেয়। হায় কপাল! আহা উহঃ শব্দ মাত্র করিয়া ভাগিয়া পড়ি। ঠাকুর আমার অবস্থা বুঝিয়াই দয়া করিয়া সময়ে সময়ে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাই উত্তর দিয়া প্রাণ বাঁচে। আজ ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, “আপনার সঙ্গেও কি ইচ্ছামত কথা বলিতে পারিব না?”

ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, তা ব'লো।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“শুধু আপনার দিকে চাহিতে পারিব ত ?”

ঠাকুর বলিলেন “মাথাটি না তুলে যদি চাহিতে পার, চাইবে।”

স্বপ্নদোষ ; তার হেতু ও প্রতিকারের উপদেশ ।

এবার ব্রহ্মচর্য্য লইয়া বীৰ্য্যধারণের চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছি ; কিন্তু কিছুতেই বীৰ্য্য স্থির রাখিতে পারিতেছি না। ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হওয়াতে চিত্ত অতিশয় চঞ্চল ও অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়ে, কিছুই ভাল লাগে না। বীৰ্য্য কেন স্থির থাকিতেছে না, এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্নদোষ কেন নিবৃত্ত হইতেছে না, এই প্রকার দুর্দশা আমার কি জন্ম হইতেছে, স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর একটু ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন—“দু'দশ দিনের একটু চেঁচায়ই একটা কিছু হ'তে চাও নাকি ? কু-অভ্যাসে ছেলাবেলা বহুকাল বীৰ্য্য নষ্ট করেছ। তার একটা স্রোত কি একবারেই বন্ধ হয় ! এখন খুব নিয়ম ধ'রে কিছুকাল চল্লে, ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আসবে। ব্যস্ত হ'লে হবে কেন ! ওসব দিকে দৃষ্টি না ক'রে নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে চল। চিত্ত-চাঞ্চল্যে স্বপ্নদোষ হয়, ক্রোধ করলে স্বপ্নদোষ হয়, স্বায়বীয় ভ্রবলতায় হয়, পেট গরম ও মাথা গরম হ'লে হয়, আহারের দোষে হয়, আর অতিরিক্ত নিদ্রাতেও স্বপ্নদোষ হয়। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ঘুমায়ে রাত দশটা এগারটার সময় উঠে, সারারাত্রি ব'সে নাম করতে পার না ? ঘুমটি কমাও। ঘুম বেশী হ'লে স্বপ্নদোষ যাবে না। শয়নের পূর্বে দুই হাত কলুই পর্য্যন্ত, দুই পা হাঁটু পর্য্যন্ত ধুয়ে নিও। পশ্চিম বা উত্তর দিকে মাথা রেখে শুতে নাই। শোবার সময়ে বেলপাতায় গায়ত্রী লিখে মাথার নীচে রাখতে পার। তুলসীপাতা রাখলেও কারও কারও উপকার হয়।”

ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলাম, একটু বিরক্তিও আসিল। ভাবিলাম, স্বপ্নদোষের কথা ঠাকুরকে বলিলেই ঠাকুর এক এক দিন এক একটি নূতন হেতু তুলিয়া, নূতন নূতন নিয়ম ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। এও উৎপাত মন্দ নয় ! নিদ্রাটি না হয় কমাইয়া ফেলিব ; কিন্তু শয়নকালে ঘাড়টি সোজা রাখিয়া রাত্রিতে যা একটু আরাম পাইতাম, এবার ঠাকুর যে তাও নারিলেন। এগারটার পরে আসনে বসিতে হইলেই ত মাথাটি গুঁজিয়া বসিতে হইবে। অধিক নিদ্রায় স্বপ্নদোষ হয়, একথা আর কখনও শুনি নাই।’

উর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী ।

ঠাকুরের উপদেশমত চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি । বাক্তি প্রায় বাপটা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া, মারামারি নাম করিয়া কাটাইতেছি । কিন্তু বীৰ্য্য ত কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না । বীৰ্য্যধারণ না হইলে সাধন ভঙ্গন তপস্যা ও ব্রত নিয়মাদি সমস্তই বৃথা মনে করিয়া, অতিশয় অস্থিরচিত্তে ঠাকুরকে 'মাইয়া বলিলাম - "শুনিয়াছি, উর্দ্ধরেতাঃ না হইলে কিছুতেই বীৰ্য্য ধারণ হয় না । কি প্রণালীতে সাধন করিলে উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া যায় ? নিয়মমত চলিলে উর্দ্ধরেতাঃ হইতে কত কাল লাগে ?"

ঠাকুর বলিলেন - "উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া সাধারণের সহজসাধ্য নয় । আবার নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে যে সকলেই হবে, তাও বলা যায় না । এমন লোকও আছেন যে, তিন দিনের মধ্যেই উর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পারেন । কারও তিন মাসে হয়, কারও বা তিন বছর লাগে । আবার বহুকাল চেষ্টা ক'রেও কারও কারও হওয়া অসম্ভব হয় । যারা অভ্যস্ত তাদের একটু সময় লাগে ; শীঘ্র হয় না । তোমার বীৰ্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হ'য়ে গেছে । এজন্ম একটু সময় নেবে । নিয়মমত চলতে থাক, বিশেষ ব্যস্ত হবার কোনও আবশ্যক নাই ।"

উর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার জ্ঞান কি কি নিয়মে চলিতে হয়, ইহা পরিষ্কাররূপে জানিতে ইচ্ছা হইল । আমি সাহস করিয়া আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম । ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন— "ঠিক নিয়ম ধ'রে চলতে থাক ; বেশী সময় তোমার লাগবে না । এখন থেকে সর্বদা পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখতে চেষ্টা কর । কখনও অন্য দিকে তাকাবে না । পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখতে নিতান্ত না পারলে, নাসাগ্রের ও রাখতে পার । তবে তাতে মাথা একটু গরম হয় । পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টিতে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকে । অন্ধকার রাত্রেও এদিক সেদিক চাইবে না । সর্বদাই একভাবে মাথা হেঁট ক'রে থাকবে ।"

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন— "আর একটি কাজ ক'রো । প্রস্রাব এক ধারায় না ক'রে, একটু থেমে থেমে ক'রো । ছ'চার সেকেণ্ড্ প্রস্রাব ত্যাগ ক'রে আবার ছ'চার সেকেণ্ড্ থেমে যেও । এইরূপ ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে ধারণ ক'রে ক'রে ত্যাগ করতে অভ্যাস কর । ধারণের সময়ে খুব কুন্তক ও সঙ্গে সঙ্গে খুব নাম করবে । যতক্ষণ কুন্তক ক'রে থাকতে পারবে, ততক্ষণই ধারণের চেষ্টা রাখবে । অল্প অল্প ত্যাগ ক'রে ক'রে, অন্ততঃ পাঁচ সাতবারে সমস্তটি প্রস্রাব ত্যাগ করবে । এটি

অভ্যাস করতে করতে প্রাস্রাবের রাস্তার মাংসপেশী খুব দৃঢ় হ'য়ে আসবে ; ধারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হবে। এখন থেকে এটি বেশ অভ্যাস কর।”

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—“স্বাভাবিক কুস্তক ক'রে সর্বদা নাম করবে। ধীরে ধীরে প্রতি দমে দমে কুস্তকের সহিত নাম করতে পারলে, এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার পাবে। এ সকল ক্রিয়া যার সঙ্গে শরীরের বিশেষ একটা যোগ আছে হঠাৎ একবারে হয় না, সময় লাগে। নানা কারণেতে নানা অবস্থায় দেহের বীৰ্য্য মথিত হ'য়ে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে উপস্থের দিকে চলে। বীৰ্য্যের উর্দ্ধদিকে যাবারও একটি সঙ্গীর্ণ পথ আছে। নীচের পথটির মুখ একেবারে বন্ধ না হ'লে, বীৰ্য্য কখনও উর্দ্ধপথে যেতে পারে না। বীৰ্য্যের স্রোত উর্দ্ধপথে দিতে না পারলে, কোনও উপায়েই উহা দেহে রাখা যায় না। বীৰ্য্য একস্থানে কখনও থাকবার বস্তু নয়। বীৰ্য্য অধোগামী না হয়, সে জন্ম কত লোকে কত কাণ্ডই করে। শরীরে গরম কমাবার জন্ম কেহ শিরা কেটে ফেলেন ; কেহ মনের উত্তেজনা কমাতে অঙ্গাদি ছেদন করেন। কিন্তু তাতে যথার্থ কোন উপকারই হয় না। ঐ সকল উপায় অবলম্বন করায় ধর্মজীবনেরও কোন কল্যাণ হয় না। সংযম দ্বারা চিত্ত স্থির রেখে, নামযোগে কুস্তক দ্বারা বীৰ্য্য উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করতে হয়। কুস্তক করলেই বীৰ্য্যের নীচের দিকের পথে চাপ পড়ে, আর উপরের পথও প্রশস্ত হয় ; সুতরাং বীৰ্য্যের গতি নিম্নদিকে আর না হ'য়ে উর্দ্ধদিকেই হয়। একবার বীৰ্য্যের গতি উর্দ্ধদিকে হ'লে, উহা আর নীচে যায় না। আমার যখন ঐ রকম হয়েছিল, মনে হ'লো যেন একটা অমৃতের সাগরে আমাকে ডুবিয়ে দিলে। চেষ্টা ক'রে কুস্তকাদিতে কোনও ফলই হয় না। নামের সঙ্গে অবিশ্রান্ত স্বাভাবিক কুস্তক ক'রেই এ সব হয়। অস্বাভাবিক কুস্তকে লাভ নাই। নামের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে এই ভাবে কুস্তক অভ্যাস কর। এসব বিষয়ে সর্বদা খুব একটা চেষ্টাও রাখতে হয়। দৃঢ়তা না থাকলে বেশী দিন চেষ্টাও রাখা যায় না।”

ঠাকুর এ সকল বলিয়া নীরব হইলেন। আমি কতক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—“আমার কি কখনও উর্দ্ধরেতা: হওয়ার সম্ভাবনা আছে? কত অত্যাচার ত এক সময়ে করেছি।”

ঠাকুর বলিলেন,—“অত্যাচার আর এমন কি করেছ? চেষ্টা করলে কেন হবে না? দেখ, আমারও ত ছেলেমেয়ে হয়েছে। আমিও ত তোমাদেরই মত ছিলাম। জীলোক দেখে আমারও কামভাব হ'তো, কত সময় চঞ্চল হ'তাম। এখন কাম যে কি তা কল্পনাতেও আনা যায় না। উর্দ্ধরেতা: হ'লে তোমারও এই রকমই হবে। সর্বদা শ্বাসে

প্রথমে নাম কর, আর স্বাভাবিক কুস্তক অভ্যাস কর। দমে দমে কুস্তকের সঙ্গে নাম করতে পারলে, উর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পারবে। উর্দ্ধরেতাঃ হ'লে শরীরটি সর্বদা বেশ সুস্থ থাকবে। ব্যারাম স্যারাম কিছুই বড় হবে না। অল্প আহার, অধিক আহার, ভাল আহার বা খারাপ আহার কিছুতেই শরীরের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না।”

একটু খামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—“বীর্ঘ্যধারণ করতে হলে, আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান হ'য়ে চলতে হয়। আহারের দোষে অনেক সময়ে উত্তেজনা হ'য়ে থাকে। সকল বিষয়েই খুব সতর্কতার সহিত না চললে, এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া কঠিন।”

আমি অমনই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“আহার সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়মে চলবে?”

ঠাকুর বলিলেন—“আহারটি খুব নির্জনে করবে। আহারের বস্তু কাহাকেও দেখতে দেবে না। আহারের সময় প্রতিগ্রাসে নাম করবে। আহারের সময়ে আহারের বস্তু ব্যতীত আর কোনও দিকে দৃষ্টি করবে না। শুদ্ধ সাম্প্রিক বস্তুমাত্র আহার করবে। অধিক ঝাল, অধিক লুন বা অধিক টক খাবে না। মিষ্টি একেবারেই ত্যাগ করবে। ছুধ খাওয়াও ভাল নয়; আবশ্যক হ'লে সামান্য পরিমাণে একবল্কা ছুধ মাত্র খেতে পার। ঘন ছুধ বড়ই অনিষ্টকর।”

এ সব শুনিয়া আমি বলিলাম—“আরও কি কোন বিষয়ে কিছু নিয়ম আছে?”

ঠাকুর বলিলেন—“আছে বই কি? শয়নেরও নিয়ম আছে। যেখানে সেখানে শুতে নাই। শোবার বিছানা সর্বত্রই পৃথক রাখবে। অন্ত্রের বিছানায় শোওয়া বস। বা অন্ত্রের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা একেবারে ত্যাগ করবে। এই সকল নিয়মে সর্বদা খুব মনোযোগ রেখে চলবে। না হ'লে বিশেষ ক্ষতি হয়। অন্ত্রের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি যেমন ব্যবহার করবে না, নিজের ব্যবহারের বস্ত্রাদিও কখন অগ্নিকে ব্যবহার করতে দেবে না; সমস্তই পৃথক রাখবে। অন্ত্রের স্পর্শ পর্য্যন্ত হ'লে এই সাধনের অবস্থায় অনেক সময়ে ক্ষতি হয়।”

ঠাকুরের আদেশমত উর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী ধরিয়া খুব উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। খিচুড়ি ছাড়িয়া শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত আহার ধরিলাম। সমস্ত দিনে আর কিছুই খাই না। কথাবার্তা বন্ধ করিয়াছি, মাত্র ঠাকুরের সঙ্গে যা ইচ্ছা বলি। শয়নের সময়ে ঘাড় সোজা করিয়া শুইতাম, এখন হইতে ঘাড় বঁকা রাখিয়া শুইতে অভ্যাস করিতেছি। রাত্রি জাগরণ ঠিক ঠাকুরের কথামত হইতেছে না; কখনও বারটা, কখনও বা একটার সময়ে হয়। নিদ্রিত হইয়া পড়িলে যথাসময়ে উঠা ত আর আমার হাতে নয়!

ভাদ্র ।

ঠাকুরকে এক দিন বলিলাম—“যখন ইচ্ছা করি, তখন ত ঘুম ভাঙ্গে না, কি করবো ?”

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, নিজের নাম নিয়ে চীৎকার করে ডেকে ব'লো ‘ওহে ! আমাকে আজ রাত এতটার সময়ে তুলে দিও ।’ এরূপ করে দেখ দেখি !”

আমি বলিলাম—“তা আমি পারবো না । লোকে হাসবে । আমার লজ্জাবোধ হয় ।”

ঠাকুর একটু হাসিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না । ইহা সত্য, না ঠাকুর আমাকে তাহা সা করিলেন—একবার জানিতে হইবে ।

শ্রীধরের বৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ ।

এই বৎসর ভাদ্রমাসে ঝড় বৃষ্টি তুফান খুব বেশী পরিমাণে হইতেছে । এক দিন সকালবেলা

পণ্ডিত মহাশয়ের রান্নাঘরে নিজ আসনে থাকিয়া নিত্যকর্ম করিতেছি, অকস্মাৎ
৭৫—১ ই ভাদ্র । ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল । অন্তর্যক্ষণের মধ্যেই এত প্রবল বেগে মুঘলধারে বৃষ্টি

পড়িতে লাগিল যে, মনে হইল জলে আজ সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে । উঠানে বিস্তর জল দাঁড়াইয়া গেল । দশ বার হাত তফাতে অগ্র ঘরের লোক ছায়ার মত দেখা যাইতে লাগিল । এই সময় শ্রীধর পণ্ডিত দাদার ঘর হইতে ‘হরিবোল, হরিবোল’ বলিতে বলিতে উঠানে নামিয়া পড়িলেন । সৃষ্টিঙ্গ নমস্কার করিয়া করঘোড়ে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন । পরে লেংটিয়াত্র পরিধানে—শ্রীধর উল্লবাহ হইয়া উচ্চ উচ্চ লক্ষ প্রদান করিতে করিতে, ‘জয় রাধে জয় রাধে’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । একঘণ্টা কাল অতীত হইল, শ্রীধরের নৃত্য থামিতেছে না । আকাশ হইতে ভগবানের চরণামৃত পড়িতেছে, এই ভাবে মত্ত হইয়া শ্রীধর পাগলের মত একবার কাদায় গড়াগড়ি, একবার উঠানের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃই শ্রীধরের হৃদয় ও গর্জন বৃদ্ধি পাইতে লাগল । ভাবাবেশে শ্রীধর অবিশ্রান্ত নৃত্য করিতে করিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন । এসব দেখিয়া আমার মনে হইল, শ্রীধরের প্রায়ই সটকজর হয়, তখন তিনি বিষম যত্নপায় অস্থির হন । এখন যে ভাবেই শ্রীধর মত্ত থাকুন না কেন, এত লক্ষবান্ধ ও বৃষ্টি ঐ শরীরে কখনই সহ্য হবে না । যে কোন প্রকারেই হউক উহাকে একবার থামাইয়া দিতে পারিলে হয় । এই ভাবিয়া আমি শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলাম—“শ্রীধর ! আর না, ঢের হয়েছে । এত লাফানি সহ্য হবে না ; এখন থাম ।” শ্রীধর আমার কথা শুনিয়াই একেবারে থমকে দাঁড়াইয়া আমার দিকে কষ্টমুখে করিয়া চাহিতে লাগিল, পরে আবার নৃত্য আরম্ভ করিল । আমি আবার বলিলাম—“শ্রীধর ! এত লাফানি সহ্য হবে না, থাম, থাম ।”

শ্রীধর খুব বিরক্তির সহিত আমাকে গালি দিয়া বলিল—“চুপ্, শালা, চুপ্,!”

আমি বলিলাম—“আচ্ছা আমি চুপ কচ্ছি, কিন্তু জর হ'লে তুমিও চুপ থেকো। তখন চীৎকার ক'রে পাড়ার লোককে অস্থির ক'রো না।”

শ্রীধর আমার কথায় বিষম রাগিয়া গিয়া বলিল—“চুপ কর, শালা! এক লাথিতে তো'র দাঁতগুলি ভেঙ্গে দিব।” এই বলিয়া শ্রীধর আমাকে পা দেখাইল। আমি ক্রোধে ও অভিমানে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম—“এত আত্মপক্ষা, পা দেখালে! আচ্ছা যদি ব্রাহ্মণ হই, ছ'টি মাস ঐ পা নিয়ে পাড়ে থাক্বে। এই লাফানি, এই পা দেখান তখন মনে কর্বে, নিশ্চয় জেনো।”

শ্রীধর মুখ ধারাপ করিয়া গালি দিতে দিতে আমাকে বলিল, “আরে শালা! আমি তো ম'রেই আছি। আমার উপর তো'র বামণালী তেজ দেখিয়ে, এ লাফানি আর কি থামাবি? তো'র উত্তেজনার সময়ে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য যদি থামাতে পারিস, তবেই জানি তুই বামণ!” শ্রীধরের ব্যবহারে অত্যন্ত অভিমান ও ক্রোধ হইল বটে; কিন্তু উহার কণাটি বড়ই মত্যা ইহা মনে করিয়া লজ্জিত হইলাম। জিজ্ঞাসিত না হইয়া নিজ হইতে উপদেশ দিতে গিয়াই আমার উপযুক্ত দণ্ড হইল, পুনঃপুনঃ ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। সারা দিন ক্রেশে কাটিল। অবসরমত ঠাকুরের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“অভিমানটি কিসে নষ্ট হয়?”

ঠাকুর প্রথমটি শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—“অভিমান নষ্ট! বড় সহজ কথা নয়! একে-বারে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্তই অভিমানটি থাকে। সকল অপেক্ষা নিজেকে হীন ব'লে জানতে হয়। যত দিন নিজেকে দীনহীন কাম্পাল ব'লে না বুঝ্বে, ততদিন কিছুই হ'লো না, এটি নিশ্চয় জেনো। মুটে মজুর, এমন কি নিতান্ত জঘন্য ইতর লোককেও, আপনা অপেক্ষা ভাল মনে কর্তে হয়, সকলকেই শ্রদ্ধাভক্তি কর্তে হয়, অভিমানের ভাব অণুমাত্র কোনও কারণে ভিতরে এলে, আর রক্ষা নাই। সামান্য বিষয়ে অভিমান জ'ন্মে কত বড় বড় যোগীরও পতন হয়েছে, দেখেছি। ধর্ম্মলাভ বিষয়ে, অভিমান সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু। সকলেরই নিকটে মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হয়। শুধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে থাকলেই কোনও উৎপাতে পড়তে হয় না।”

আজ কয়দিনযাবৎ শ্রীধর সটকজরে শয্যাগত আছেন। বর্ষার জলে ভিজিয়া বাতজরে শ্রীধর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ছ'টি পা আর নাড়িবার ঘো নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইলে শ্রীধর আমাকে ডাকিয়া বলেন, “ভাই! তো'র শাপেই আমার এ দশা ঘটয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর।” শ্রীধরের অবস্থা দেখিয়া, তার কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হয়। হায়! সকল প্রকার ভোগই মানুষের ভগ্নবদ্বিচ্ছায় হয়, তাঁরই ব্যবস্থামত সমস্তই ঘটিতেছে; বুধা অভিমানে আঘাত পাইয়া একটা কথা বলিয়া আমি কেন অনর্থক নিমিত্তের ভাগী হইলাম!

লোকসঙ্গই ক্রোধ এবং অভিমানাদির হেতু হয় দেখিয়া ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—“লোকালয় ছাড়িয়া পাহাড় পর্বতে থাকিতে পারিলে বোধ হয় অভিমানাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কি প্রকার অবস্থা হইলে পাহাড় পর্বতে নিরুদ্বেগে থাকা যায়?”

ঠাকুর বলিলেন—“লোকালয়ে থাকলে অভিমানের অনেক কারণ উপস্থিত হয় বটে, পাহাড় পর্বতে থাকতে পারলে এসকল দিকে চের নিরাপদ; কিন্তু আহারটি ত্যাগ না হ'লে নির্জন পাহাড় পর্বতে শান্তিতে থাকা যায় না। আহারের জন্য অস্থির হ'য়ে আবার লোকালয়ে আসতে হয়। আহারের চিন্তায় সকলেই অস্থির। আহার চিন্তায় সাধকদের অনেক সময়ে বিস্তর অনিশ্চয় হ'য়ে থাকে। এজন্য অনেক সময়ে সাধুরা কঠোর সাধন ক'রে প্রথমেই আহার ত্যাগ অভ্যাস করেন। আহারটি ত্যাগ হ'লে ইন্দ্রিয়দমনাদির বিষয়েও বিস্তর উপকার হয়। খুব অধ্যবসায়ের সহিত কিছুকাল নিয়ম ধ'রে চললে আহার ত্যাগ করা যায়। সকলের পক্ষেই সহজ নয় বটে, সম্ভবও নয়, কিন্তু কেহ কেহ চেষ্টা করলে খুব সহজেই কৃতকার্য হ'তে পারে। সে চেষ্টা আর কে করে?”

ঠাকুর এই ভাবে উপদেশ দিয়া আহার ত্যাগের প্রবৃত্তি আমার অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। প্রাণী না হইলে নিজ হইতে ঠাকুর কোন বিষয়েই ত প্রায় কিছু বলেন না। তাই খুব আগ্রহের সহিত বলিলাম—“চেষ্টা করলে আমি আহারত্যাগী হইতে পারি কি? যদি সম্ভব হয় নিয়মগুলি আমাকে বশুন, আমি একবার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে দেখি।”

ঠাকুর বলিলেন—“আহারত্যাগ কর্তে ইচ্ছা হ'লে, এখনও তুমি পার। বয়স তোমার বেশী হয় নাই, চেষ্টা করলে সহজেই পারবে মনে হয়। আহারত্যাগ একবারে হঠাৎ হয় না। প্রাণালীমত খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে অভ্যাস কর্তে হয়। যে সকল বস্তু আহার ক'রে থাক, তার মধ্যে অল্পের একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখবে। প্রথম প্রথম আরম্ভেই কম খাওয়া ঠিক নয়। ডাল তরকারি ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস দিয়ে আহার না ক'রে একটি দিয়ে খাওয়া অভ্যাস কর্তে হয়। শুধু ডাল ভাত বা শুধু তরকারি ভাত খাওয়া ভালরূপ অভ্যাস হ'লে, ভাতে সিদ্ধ ভাত ধরতে হয়। এ সময়ে প্রয়োজন হ'লে সামান্য পরিমাণে দুধ ঘি খেতে পার। দুধ না খাওয়াই ভাল। ভাতে সিদ্ধ ভাত অভ্যাস হ'লে ধীরে ধীরে ভাতে সিদ্ধের পরিমাণ কমিয়ে নেবে এবং জল দিয়ে তা পূরণ করবে। ক্রমে জল ভাত ধরবে। এ সময় খুব সাবধান হ'য়ে ধীরে ধীরে ভাতেরও পরিমাণ কমিয়ে, জলের মাত্রা বৃদ্ধি করবে। জল ভাত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নুন ত্যাগ কর্তে চেষ্টা

কর্বে। নুন ত্যাগ হ'লে, জলভাতের সঙ্গে অল্প অল্প ফল খেতে আরম্ভ করবে। ফলের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি করবে, ভাতের পরিমাণও তেমনই কমিয়ে নেবে। ক্রমে শুধু জল আর ফল থাকবে। এ সময় ফলের সঙ্গে ছ'পাঁচটা নিম পাতা, বেল পাতা খেতে আরম্ভ করবে। পরে ফলের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পাতার পরিমাণ বাড়িয়ে নেবে। তৎপরে শুধু জল ও পাতা থাকবে। খুব ধীরে ধীরে এসব অভ্যাস করতে হয়; না হ'লে অসুস্থ হ'য়ে পড়বে। খুব দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল চেষ্টা করলে, আহার ত্যাগ করা যায়। আহার ত্যাগ করতে ইচ্ছা হ'লে, মিষ্টি এখন হ'তে ছেড়ে দেও। মিষ্টির মধ্যে ফলমাত্র খেতে পার। বীৰ্য্যধারণই সমস্ত সাধনের মূল। ওটি না হ'লে এসব কিছুই হবে না। বীৰ্য্যধারণ হ'লে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।”

সমাধিমন্দির আরম্ভ ও গেণ্ডারিয়ার কথা।

মাঠাকুরের দেহত্যাগের পরেই ঠাকুরের আদেশে তাঁহার একখানি অস্থি শ্রীবন্দাবনে সমাহিত হয়। বরিষদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলার সময়ে আর একখানি অস্থি ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাগর্ভে দেওয়া হইয়াছিল। অপর একখানি অস্থি সমাধি দিবার জন্ত গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আনা হইয়াছে। ঢাকার গুরুভাতারা চাঁদা তুলিয়া একটি ছোট মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন। গুরুভাতা রাধারমন গুহ মহাশয় মন্দিরের নক্সা আঁকিয়া দিয়াছেন। আশ্রমের দক্ষিণ সীমায় পুকুরের ঠিক উত্তর পাড়ে, আম গাছের তিন চারি হাত তকাত পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মন্দিরটি উঠিতেছে। মন্দিরের বুনেদ্ খুঁড়িতে সিঁড়ির স্থানে দুইটি মুসলমানের কবর বাহির হইয়া পড়িল।

ঠাকুর বলিলেন—“কিছুকাল পূর্বেও গেণ্ডারিয়া মুসলমান ফকিরদের সাধনস্থান ছিল। গেণ্ডারিয়া জঙ্গলে অনেক স্থানেই মুসলমানদের কবর আছে। ভাল ভাল ফকিরেরা প্রায় অনেকেই চ'লে গেছেন। জঙ্গলে এখনও যে ছ'চারজন আছেন, তাঁরাও শীঘ্রই চ'লে যাবেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“যোগিনীমাইর কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি কি আছেন? তাঁর আসন কোথায়?”

ঠাকুর বলিলেন—“কিছু দিন হ'ল তিনি মণিপুরের জঙ্গলে চ'লে গেছেন। আনন্দ বাবুর বাগানের দিকে যেখানে আমি বস্‌তাম, যোগিনীমাই সেখানেই প্রায় থাকতেন। আসন তাঁর নির্দিষ্ট একটা স্থানে ছিল না। সর্বদা তিনি গাছে গাছে থাকতেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“হৃদয় দেহে যে সকল ফকির মহাত্মা আছেন, তাঁরাও কি গেণ্ডারিয়া ছেড়ে চলে যাবেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“যেসকল বৃক্ষ অবলম্বন ক’রে তাঁরা রয়েছেন, সব কেটে ফেললে আর থাকবেন কেন? আনন্দ বাবুর বাগানের ধারে নবকান্ত বাবুর বাড়ীর সীমাতে একটি বড় গাছ ছিল, তা কেটে ফেলাতে ছুটি মহাত্মা গেণ্ডারিয়া ছেড়ে চ’লে গেছেন। গেণ্ডারিয়াতে বেশী লোকের বাস হ’লে, সকলকেই বোধ হয় স’রে পড়তে হবে।”

গেণ্ডারিয়ার ভূমি বহুকাল হইতে মহাত্মাদের সাধনক্ষেত্র গুনিয়া বড় আনন্দ হইল।

গুরুমর্যাদালঙ্ঘনে সিদ্ধপুরুষের পুনরাবৃতি।

শ্রীমতী শান্তিসুধার ছেলে দাউজীর কথা অনেক সময়ে ঠাকুর বলিয়া থাকেন। দাউজী ঠাকুরের নিকট আসিলেই ঠাকুর কত প্রকারে দাউজীর আদর করেন। দাউজীর মাথায় ফুল দিয়া নমস্কার করেন; ‘জয় দাউজী! জয় বলদেব মহারাজ!’ বলিয়া আনন্দ করেন। দাউজীর এখনও কথা ফুটে নাই। কিন্তু উহার হাবভাব দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতেছি। সঙ্কীর্ণনের সময়ে দাউজী খোল করতালের শব্দ শুনিতেই স্থিরভাবে একদিকে তাকাইয়া থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। কানের ধারে ‘হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ’ বলিতে থাকিলেই ধীরে ধীরে দাউজীর চৈতন্য লাভ হয়।

ঠাকুর বলিলেন—“পূর্বজন্মের সমস্ত কথা দাউজীর স্মরণ আছে। চৌরাশি প্রকার আসন উহার অভ্যস্ত ছিল, কিছুই ভুলেন নাই। দাউজী একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারির কুঞ্জে বলরামমূর্ত্তি দাউজী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দাউজী সেই ঠাকুরেরই সেবা পূজা করতেন, একান্ত ভাবে উপাসনা ক’রে দাউজী সেই বিগ্রহেরই রূপ লাভ করেছেন।”

ঠাকুরের কথায় এখন বুঝিলাম—যথার্থই দাউজীর আকৃতি ঠিক সেই বিগ্রহের অন্তরূপ। অনেক সময়ে ভাবিতাম ছেলের চেহারার সহিত পিতামাতার চেহারার সাদৃশ্য নাই, অথচ এই চেহারা খুব পরিচিত মনে হয়, কোথায় যেন দেখিয়াছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“দাউজী চিরকালই কি জাতিস্মর থাকিবে?”

ঠাকুর বলিলেন—“তা কি আর থাকে? কথা বলতে যেমন শিখবে, স্মৃতিও তেমনই নষ্ট হ’য়ে যাবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“দাউজী এত বড় সিদ্ধপুরুষ হ’য়েও আবার এলেন কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“এক ক্ষেত্রে গুরুর মর্যাদা লঙ্ঘন করাতেই এবারে দাউজীকে সংসারে আসতে হয়েছে। দাউজী পূর্বজন্মে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। গুরুর সঙ্গেই

সর্বদা থাকতেন। গুরু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। শ্রীলোক পুরুষ সর্বদাই তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। এক দিন কয়েকটি শ্রীলোক এই মহাপুরুষের নিকট আসতেই, মহাপুরুষ তাঁদের আদর যত্ন ক'রে বসালেন। একটি ব্রজমায়ী কতক্ষণ থেকে হাসি গল্প আনন্দ ক'রে চ'লে গেলেন। গুরুর নিকটে শ্রীলোক যায় আসে, বসে কথা বার্তা হাসি গল্প করে—দাউজী একেবারে পছন্দ করতেন না; অনেক সময়ে খুব বিরক্তিই প্রকাশ করতেন। ঐ দিন শ্রীলোকেরা চ'লে যেতেই দাউজী গুরুকে খুব ধমক দিয়ে ছ'চার কথা বলতে লাগলেন। দাউজী গুরুর নিকটে ঐ সময়ে একটি মহাপুরুষ ব'সে ছিলেন। তিনি দাউজীকে বললেন, 'আরে বাচ্চা! গুরুজীকো এয়সা মৎ বোল্‌না। চুপ রহো।' দাউজী বললেন, 'কাহে? ওয়াজিব্ কাহে নেহি কহেঙ্গে?' মহাত্মা বললেন, 'আরে হাতী কেত'না খাতা হায়, কেত'না হজম কর্তা হায়, তু ক্যায়সে জানোগে। তু তো বিল্লি হায়।' দাউজীর ক্রোধ হ'লো, অমনি তিনি ব'লে ফেললেন—'হাঁ জী, হাঁ। বহুত বহুত ঐরাবত দেখা হায়।' মহাপুরুষ শুনে বললেন—'হাঁ, এয়সা! আচ্ছা, ফের আউর একদফে দেখ'নে হোগা, লোট'নে পড়েগা।' দাউজীর গুরু অমনই মহাপুরুষের পায়ে প'ড়ে বললেন, 'ও ছেলে মাহুষ, আপনি ওর অপরাধ দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।' মহাপুরুষ বললেন, 'আর একবার ওর আসাতে বিশেষ কল্যাণই হ'বে, কোন অনিষ্টই হবে না। এই জন্তই দাউজীর আসা। পরলোকে থেকে, দাউজী প'চিশ বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন যাতে আর না আসতে হয়। কিন্তু মহাপুরুষের বাক্য কিছুতেই অগ্রথা হ'লো না। মর্যাদা লঙ্ঘন বিষম অপরাধ। দণ্ড ভোগ না ক'রে এই অপরাধ হ'তে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।''

স্বপ্নে লালের সহিত প্রতিযোগিতা।

একটি স্বপ্ন দেখিয়া মনে বড় উদ্বেগ আসিয়াছে। মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে নির্জনে পাইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্তটি বলিলাম—'লাল ও আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধদিকে আকাশ পথে উড়িয়া যাইতেছি। লাল আমার হু'তিন হাত আগে আগে যাইতে লাগিল। লালের উপরে উঠিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই পারিলাম না। মনে অতিশয় দুঃখ হইল; অমনই আপনার নিকট আসিয়া বলিলাম, 'লাল আমার অনেক পরে দীক্ষা পাইয়াছে, বিশেষতঃ সে জাতিতে শূদ্র। আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া লালের উপরে উঠিতে পারিলাম না কেন? লাল কোন চেষ্টা না করিয়া স্বাভাবিক গতিতেই যাইতেছে দেখিতে পাইলাম; তথাপি আমা অপেক্ষা দুই তিন হাত আগে

‘আগে চলিল।’ ইহা কেন হইল আপনাকে জিজ্ঞাসা করায় আপনি বলিলেন—“লালের বৈষ্ণবতাব, আর তোমার শাক্ততাব।” আর কিছুই বলিলেন না। অমনই জাগিয়া পড়িলাম। এই কথা বলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“শাক্ততাব ও বৈষ্ণবতাবে পার্থক্য কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“শাক্ত ও বৈষ্ণবের চরমে একই অবস্থা লাভ হয়। তবে পথে উপাসনার ভাবের পার্থক্য দেখা যায় মাত্র। যাঁরা বৈষ্ণবপ্রকৃতির লোক, তাঁরা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই চান না; ঐশ্বর্য্য তাঁদের ভক্তির অন্তরায় মনে ক’রে, তাঁরা তা বিষবৎ ত্যাগ করেন। একান্তপ্রাণে তাঁরা দাসই হ’তে চান। ভগবদ্ভক্তি লাভ ক’রে তাঁরা অভয় পদ প্রাপ্ত হন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁরা ইচ্ছা না করলেও দাস দাসীর ন্যায় সর্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করে। আর শাক্তদের অন্য প্রকার—শাক্তেরা প্রথমে ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা ক’রেই কঠোর সাধন করেন; পরে ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ ক’রে, পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সাধন করেন; ঐ প্রকারে সর্বজীবের সেবা ক’রে ভগবতুপাসনাদ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। শেষ অবস্থা সকলেরই এক।”

স্বপ্নটি বোধ হয় আমার অলীক নয়, কারণ ঐশ্বর্য্যের দিকেই ত আমার ঝোঁক বেশী। উর্দ্ধবেতাঃ হওয়া আহাৰ ত্যাগ করা ইত্যাদি সকলগুলিই ত ঐশ্বর্য্যের ক্রিয়া। তবে এ সকল চেষ্টার লক্ষ্য যখন ভগবান, তখন ভক্তির সাধন বিনা আর কি বলা যায়? তাঁকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা কিছু করা যায়, সমস্ত ত তাঁরই সেবা!

কালীর অপমানে উৎপাত—পূজায় শান্তি।

কয়েক দিন পূর্ব্বের একটি অতি বিচিত্র ঘটনা আমারই হাতের লেখা একখানা আলুগা কাগজে পাইলাম। ঘটনাটির ঠিক তারিখ বা মাস তাহাতে লেখা নাই এবং আমারও মনে নাই; স্তব্ধতা যেমন লেখা আছে এই স্থলে তুলিয়া দিতেছি।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের একান্ত অল্পগত ও শ্রদ্ধাবান সেবক। ঘোষ মহাশয়ের সমস্ত পরিবারটিই স্বতন্ত্র রকমের। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি হইতে কচি খোকা খুকীটি পর্য্যন্ত কথা-বার্ত্তা চল চলনে আচার ব্যবহারে যেন ঠাকুরের ভাবে মাথা। দেখিলে মনে হয় ঠাকুর ভিন্ন এই পরিবারের কাহারই জীবনে আর যেন কিছুই লক্ষ্য নাই। সহজ ভাবে নিঃসঙ্কোচে ঠাকুরের সঙ্গে মিলামিশি এই পরিবারের ছেলে বুড়োর যেমনটি দেখিতেছি এমন অল্পই দেখা যায়। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! ঠাকুরগতপ্রাণ এই পরিবারের ভিতরেও বিষম উৎপাত আরম্ভ হইল।

একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সকলেই দেখিলাম, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী আশ্রমসংলগ্ন—ঠিক পূর্ব্বদিকে। আর কোথাও একবিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই; কিন্তু

ঐ বাড়ীর উঠানে ঘাসের উপরে ও গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত প্রায় সর্বত্রই পড়িয়া রহিয়াছে।
কুঞ্জ বাবুর স্ত্রী ও ছেলে প্রভৃতি করেক জনের সকাল বেলা হইতে জ্বর আরম্ভ হইল। এই জ্বরের মাত্রা
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া একশত চার পাঁচ ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়িল। রোগীরা সকলেই শয্যাগত, মুচ্ছিত প্রায়।
ঘোষ মহাশয়ের বৃদ্ধা শাশুড়ী একবার ঠাকুরের নিকটে আর একবার নিজ বাড়ীতে ছুটাছুটি করিতে
লাগিলেন। অবসর পাইয়া বৃদ্ধা ঠাকুরকে সমস্ত বিপদের কথা পরিস্কাররূপে জানাইলেন। শুনিয়া,
ঠাকুর নাকি বৃদ্ধাকে খুব ধমকাইয়া বলিয়াছেন যে, তাঁরই অপরাধে এ সকল উৎপাত ঘটতেছে।
বৃদ্ধাকে ঠাকুর অপরাধের হেতু নিজ হইতে বলিবার পূর্বেই, বৃদ্ধা বলিলেন—“কয়দিন থেকে নাম
কর্বার সময়ে কালীমূর্ত্তি আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছিলেন। যতই নাম করি ততই কালী
আমার আরও নিকট হইতে থাকেন। আমি অনেকবার কালীকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছি কিন্তু
তিনি যান নাই। পরে ঘর ঝাঁট দিয়া হাতে ঝাড়ু নিয়া বসিয়া, দরজার ধারে নাম করিতেছি
দেখিলাম কালী সামনে দাঁড়ান। বারংবার সরিয়া যাইতে বলিলাম, গেলেন না; তখন আমার রাগ
হ'লো, হাতে ঝাড়ু ছিল উহাই ছুঁড়িয়া মারিলাম। তার পর থেকে আর কালীকে দেখি নাই।”

ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া খুব ধমক দিয়া বলিলেন—“ক'রেছ কি? কালী কাঁচা-থেকো দেবী,
তাকে তুমি ঝাঁটা মারলে? লোকে কত সাধ্য সাধনা ক'রে একবার যাঁরা দর্শন পায় না,
দয়া ক'রে তিনি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর তুমি তাঁকে ঝাঁটা মারলে?”

বৃদ্ধা বলিলেন—“আমি ভগবানের নাম করি, তাঁকেই ডাকি; কালী আমার কাছে আসেন
কেন? আমি মনে করেছিলাম, কালী আমার সাধনপথের প্রলোভন।”

ঠাকুর বলিলেন—“সে কি? কালী কি ভগবান্ নন্?”

বৃদ্ধা বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণইতো ভগবান্। নাম ত তাঁরই করি।”

ঠাকুর বলিলেন—“দীক্ষাকালে ভগবানের কি কোন নির্দিষ্ট একটি রূপের কথা বলা
গিয়েছিল? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি র'য়েছেন, অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাঁরই ভিতরে র'য়েছে
তিনিই ভগবান্। তিনি কি দিভুজ মুরলীধর, না চতুর্ভুজা, তা ত কিছুই বলা হয় নাই!
তিনি কোন্ রূপে তোমার নিকট প্রকাশ পাবেন, তা তিনিই জানেন। আগে থেকে এ সব
কল্পনা কেন?”

বৃদ্ধা বলিলেন—“তবে এখন কি করব?”

ঠাকুর বলিলেন—“মানসিক ক'রে, গিয়ে কালীপূজা কর। কালীপ্রতিমা এনে ব্যবস্থামত
পূজা করিতে হবে।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আর কিছু না বলিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর তখন কুঞ্জ

ঘোষ মহাশয়কে ভাকাইয়া বলিলেন—“তোমার শান্ত্তী ত শুন্বে না। তুমি শীঘ্র কালীপূজা কর, নচেৎ অকল্যাণ হবে।”

ইহার পরই কুঞ্জ বাবুর বাড়ীতে কালীমূর্ত্তি আসিল। ব্যবস্থামত, যথাশাস্ত্র বেশ সমারোহের সহিত কালীপূজা হইল। এই পূজার দিনে কি কারণে জানি না, বৃদ্ধার প্রতিনিধিরূপেই হউক, অথবা একটি ব্রাহ্মণের উপবাস করা ব্যবস্থা বলিয়াই হউক, ঠাকুর আমাকে নিরঙ্ক উপবাস করিতে বলিলেন। আমিও সারাদিন উপবাস করিয়া রহিলাম।

রাত্রিতে কালীপূজা আরম্ভ হইলে ঠাকুর যাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ণ দর্শন বিষয়ে ঠাকুর পরে এক সময়ে যাহা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

ঠাকুরের সহস্রে লেখা—“প্রথম দেখিলাম, মা কালী নৈবেদ্যের আমটি মাথায় লইয়া বসিয়া আছেন। পরে দেখিলাম, মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রকে স্বন্দে লইয়া দণ্ডায়মান! তদনন্তর দেখিলাম, গরুড়ের স্বন্ধে বিষ্ণু রহিয়াছেন। পরে দেখি, মহাদেবের উপরে কালীমূর্ত্তি। তাহার পরে দেখিলাম, বলরামের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। অনন্ত ভাব, কে বুঝিবে!”

এই পূজায় ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে কুয়াণ্ড ও ইস্কু বলিদান হইল। বহু গুরুভাতায় পূজার পরদিন পরম পরিতোষে প্রসাদ পাইলেন।

কালীপূজা হইয়া গেল, পরে অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার আজ্ঞানুসারেই কি কালী একরূপ একটা উৎপাত ঘটাইলেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“তাকি কখনও হবার যো আছে! কালীকে ঝাঁটা মারতেই কালী এসে আমতলায় বল্লেন—‘দেখ, আমাকে আহ্বান ক’রে অপমান করেছে; আমি ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।’—তার পরেই এই সব।”

আমি বলিলাম—“বৃদ্ধার আর এতে কি শিক্ষা হ’লো?”

ঠাকুর বলিলেন—“যা হয়েছে, তাই যথেষ্ট।”

আমি বলিলাম—“কেন কালী ঐ বুড়ীকে কিছু করতে পার্লেন না?”

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—“ও বুড়ি যে বড় সহজ বুড়ী নয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে বহুকাল থেকে একটি কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ ভদ্রলোকের মাঠাকুরুণ খুব শ্রদ্ধাভক্তির সহিত প্রত্যহ তাঁর সেবাকার্যা করেন। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি বাড়ী গেলেই, কালীর প্রতিমা ফেলে দিতে চাইতেন, আর

মন্দিরের বারেন্দায় নানাপ্রকার অনাচার করতেন। কালী এক দিন বৃদ্ধাকে স্বপ্নে বল্লেন, 'ওগো! সাবধান থাকিস্। তোর ছোট ছেলে যে বড় বিষম অত্যাচার আরম্ভ করেছে। নিষেধ ক'রে দিস্। আবার ঐরূপ করলে, আমি তোর বড় ছেলের ঘাড় মটকাব!' বৃদ্ধা বল্লেন, 'কেন মা, বড় ছেলের ঘাড় মটকাবে কেন? বড় ছেলে ত কোন অপরাধ করে নাই। ঘাড় মটকাতে হয় ত ছোট ছেলেরই ঘাড় মটকাও না কেন?' কালী বল্লেন, 'ওগো, সে যে আমাকে একেবারেই মানে না, কিছুই গ্রাহি করে না! তাকে আমি পার্বো না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“একই স্থানে দীক্ষালাভ ক'রে একই নাম জপ ক'রে, কেহ কালী দেখেন, কেহ বা কৃষ্ণ দেখেন, আবার কেহ কেহ অন্য দেবদেবীও দেখেন, এরূপ হয় কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“যিনি যে বংশের, তাঁর নিকটে প্রথম প্রথম সেই বংশের কুলদেবতাই প্রায় প্রকাশ হন। পরে ক্রমে ক্রমে সবই হ'য়ে থাকে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“নাম করতে করতে যাহা কিছু প্রকাশ হয়, কি প্রকার ব্যবহার করলে তাঁহার মর্যাদা রক্ষা হয়?”

ঠাকুর বলিলেন—“নাম করতে করতে যা কিছু প্রকাশ পাবে, খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রে নমস্কার ক'রে, সেখানেই আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হয়। ওরূপ করলেই কল্যাণ হয়।”

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“কি আশীর্বাদ চাইতে হয়?”

ঠাকুর বলিলেন—“ভগবানের চরণে মতি গতি হউক, তাঁর চরণে ভক্তি হউক, এই মাত্র আশীর্বাদ চাইলে তাঁরাও সন্তুষ্ট হন।”

গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা।

ভাগ
১৮ই—৩১শে

কিছুদিন হইল ঠাকুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে গুরুভাতা শ্রীযুক্ত শ্রীমাকান্ত * পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মন্থননাথ

* পণ্ডিত শ্রীমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।—ঢাকা, বিক্রমপুর, তেজপুর রওনিয়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। সংস্কৃত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে ইঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। ইঁহার উৎসাহপূর্ণ জীবনে সত্যনিষ্ঠা ও সাধনশীলতা দেখিয়া পূর্ববঙ্গের অনেক শিক্ষিত ভক্তসম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্মে আবৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতিমাপূজা মহা অপরাধ বধন মনে হইল, সেইদিন হইতে পূজার সময়ে পাঁছে ঢাকের শব্দ কাণে যায়, এই ভয়ে তিনি সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া বাইতেন।

ঠাকুরের নিকট ইনিই নাকি সর্বপ্রথমে দীক্ষালাভ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি আর ঠাকুরের সঙ্গে ছাড়া প্রায় হন নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী একটানা অসাধারণ সাধনচেষ্টা এবং পবিত্র জীবনের বিশ্বয়কর দুর্লভ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ঠাকুরের অন্তর্দ্বারের পরে, ইনি ঠাকুরের সমাধি আশ্রমেই শেখানদ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালের ২০শে ফাল্গুন তারিখে দোলপূর্ণিমার দিনে ইনি দেহত্যাগ করেন।

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া একটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ককির সাহেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।
এই ককির সাহেবকে সকলেই শা সাহেব বলেন। শা সাহেবের একটি যুবক শিষ্য আছেন তিনিও
মুদলমান। এই শিষ্যটির অদূত অবস্থা ও অসামান্য গুরুভক্তির কথা ঠাকুর সময়ে সময়ে বলিয়া
আনন্দ করেন। ঐ দিনের ঘটনাটি যেমন শুনিলাম লিখিয়া রাখিতেছি—বৃদ্ধ শা সাহেবের এক-
পাশে শিষ্যটি নাড়ুগোপালের মত উপবিষ্ট থাকিয়া করযোড়ে গুরুর দিকে অনিমেঘে চাহিয়া
আছেন; যেন কোন হুকুম পাইলেই তাহা তামিল করিবেন, এই ভাবে ব্যস্ততার সহিত প্রতীক্ষা
করিতেছেন। কখনও কখনও ময়দানের দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিয়া, অমনি হাতে ঠেঁকা
লইয়া বিতৃত মাঠে ছুটাছুটি করেন, শূণ্য স্থানেই দু'হাতে ঠেঁকা চালাইয়া চীৎকার করিয়া
বলেন, ‘আরে, উদার যা হট্; এদার কাহে আয়া? কিষণজীত ওদার গিয়া।’ কখনও বা
শূণ্য মাটির উপরে লাঠি মারিয়া বলেন, ‘আরে শালা! বলাইজীকা বাত নেই মান্তা?
মারেঙ্গে ডাণ্ডা, তো মালুম্ হোই!’ এই শিষ্যটির নিকট অনেক সময়ই ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণের গোচারণ
লীলা প্রকাশিত হয় এবং ইনিও তাহাতে ঘোগ দেন। গরু বাছুরদের বেচাল দেখিলে, সময়ে
সময়ে ঠেঁকা হাতে লইয়া ইনিও গিয়া শাসন করিয়া থাকেন।

ঐদিন শা সাহেব একটু চিন্তাবৃত্ত ভাবে বসিয়া আছেন, কি যেন ভাবিতেছেন; দেখিয়া শিষ্যটি
অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—“শা জী! আপ দুংখী কাহে ভায়া?”

শা সাহেব বলিলেন—“আরে, গুরুজীকা হকুম হয়, শাদি কর্নেকো।” শিষ্য বলিলেন—“বাঃ,
আচ্ছা তো। গুরুজীকা হকুম, ও তো কর্নেই হোণা। আপ্ শাদি কীজিয়ে।” শা সাহেব
বলিলেন—“আরে তুতো কহতে হো, আব লেড় কী হাম্‌কো কোন্ দেয়েগা? মই তো বুঢ়া হো
গয়ি।” শিষ্য বলিলেন—“কাহে গুরুজী, হাম্‌ দে দেতে। হামারা জরুকো আপ্ শাদি কীজিয়ে।”
শা সাহেব বলিলেন—“সো ক্যায়সে হোণা, তুতো জিন্দা হায়। খম্‌ মরুণেসে জরুকো নিকা হো
সেক্তা হায়।” শিষ্যটি একটু সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একবারে লাফাইয়া উঠিলেন, হাতে
তালি দিয়া বলিলেন—“আচ্ছা তো গুরুজী! আচ্ছা তো! উন্মে মুশ কিল কা? আভি হাম্‌ মরু
যাই, হামারা জরুকো আপ্ নিকা কীজিয়ে।” শা সাহেব শিষ্যটিকে অনেক করিয়া থামাইলেন, শিষ্যটি

+ ৩ম অধ্যায় মুখোপাধ্যায়, B. L. নিবাস দমদমার নিকট কেদেটি গ্রাম। ইনি একজন আত্মনিক ব্রাহ্ম ছিলেন।
ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়া কিছুকাল পরেই, ইনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঠাকুর পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রহ ত্যাগ
করার পর, ময়খাবানু উপাচার্যের কাণ্ড করিতেন (পূর্বেও করিয়াছিলেন)। তখন ইঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে
মনে করিতেন, ব্রহ্ম এই ব্যক্তির দ্বারা একেশ্বরত্বের মনোহর প্রকাশ পাইবে। ইঁহার বক্তৃতাকালে প্রত্যেকটি কথার
সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা শক্তি সঞ্চারিত হইত যে, শ্রোতাগণ মস্তকোত্তর মত অভিভূত হইয়া থাকিতেন। কিছুকাল পরে ইঁহার
মনেরও অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, তিনি ব্রাহ্মধর্মপ্রচার কাণ্ড পরিত্যাগ করিলেন; পরে কানপুরে ওকালতি কাণ্ডে বিশেষ
প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়া অবশিষ্ট জীবন তথায়ই অতিবাহিত করিলেন।

এক একবার চমকিয়া উঠিয়া শা সাহেবকে কেবলই বলিতে লাগিলেন, “গুরুজীকা হুকুম, ও তো করুনেই হোগা।” শা সাহেব বোধ হয় শিষ্যের গুরুভক্তি দেখাইতেই উপস্থিত ভদ্রলোকদের নিকট এই খেলা খেলিলেন। অদ্ভুত শিষ্য! অদ্ভুত দৃষ্টান্ত !!

শা সাহেবের সাধন ও আমাদের সাধনে পার্থক্য কি, একটি গুরুদ্বাতা ঠাকুরকে এই প্রশ্ন করিলে ঠাকুর বলিলেন—“এঁদের সাধনে নিজেদের পুরুষকারই প্রধান, গুরুকৃপাও চাই। আমাদের সম্পূর্ণ গুরুকৃপা, পুরুষকারের কিছুই অপেক্ষা করে না। এই মাত্র।”

শ্রীধরের উপহাস ও শিক্ষাদান।

কিছুকালযাবৎ শ্রীধর গীড়িতাবস্থায় আছেন। সময়ে সময়ে সটকজরে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। উপস্থিত শ্রীধরের উপস্থের অগ্রভাগে একটি কোড়া হইয়া বিষম যন্ত্রণা দিতেছে। অনভিজ্ঞ একটি গুরুদ্বাতাকে যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—“বেশ করিয়া কষ্টিক লাগাইয়া দেও, কোড়া সারিয়া যাইবে।” শ্রীধর আর দ্বিধা না করিয়া আচ্ছা করিয়া তাহাতে কষ্টিক লাগাইয়া ভয়ানক ঘায়ের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। এখন শ্রীধর দিনরাত চীৎকার ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। মহেন্দ্র দাদা শ্রীধরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি ভাই শ্রীধর! কি হয়েছে?” শ্রীধর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অমনই সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জবাব দিলেন—“আরে ভাই! আর কি হবে? দুষ্কৃতির ভোগ! সে দিন ঐ কুকুরটা এখানে এসেছিল।—আর কী বল্ব—বেগ সামলাতে পারলাম না, তাই কুকুরের ফল। হায় কপাল!”

মহেন্দ্র দাদা পাগ্লা শ্রীধরের প্রকৃতি জানেন, মাথা গরম হইলে শ্রীধর সবই বলিতে পারেন, সবই করিতে পারেন, তাই আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলেন, এবং অবশর মত শ্রীধরের কথা ঠাকুরকে বলিলেন।

ঠাকুর শুনিয়া খুব হাসিয়া বলিলেন—“রাম! রাম! ওসব কিছু নয়, কিছু নয়। শ্রীধরের মাথা গরম হ’লে ওরূপ ঢের মিথ্যা কথা বলে। ঔষধ দিয়ে ঘা ক’রেছে।”

মহেন্দ্র দাদা ভাবিলেন—মাথা পাগ্লা শ্রীধর দ্বারা সব কাজই ত সম্ভব। শ্রীধর নিজেই ত তাঁর দুষ্কৃতির কথা বলিলেন, শ্রীধরের দুষ্কার্য গোপন করিবার জন্তই ঠাকুর, শ্রীধরের কথা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মহেন্দ্র দাদা একদিন শ্রীধরকে কথায় কথায় বলিলেন—“শ্রীধর! তোমার রোগের কথা সমস্ত গোঁসাইকে যাইয়া বলিয়াছিলাম; তিনি ‘ওসব কিছু নয়, শ্রীধর মিথ্যা কথা ব’লেছে, ঔষধ দিয়ে ঘা করেছে’ বলিয়া, তোমার সব কথা ঢাকিয়া দিলেন।” শ্রীধর শুনিয়া মহেন্দ্র দাদার দিকে একটু চাহিয়াই থলথল করিয়া হাসিয়া বলিলেন—“মিথ্রি! এবার

তুমি ঠাকৈ গেলে। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করলে, আর গোসাইয়ের কথায় বিশ্বাস করতে পারলে না!” মিত্রি দাদার তখন হুঁস্ হইল, তিনি একটু লজ্জিত হইলেন। অনেক সময় গুরুভাতাদের নিকটে এই বিষয় বলিয়া মিত্রি দাদা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। মহেন্দ্রাবুর মত ঠাকুরের একান্ত নিষ্ঠাবান্ ভক্তেরও যখন এই প্রকার মতিলম্ব হয়, তখন আমি আর কোথায় আছি!

শ্রীধরের অবস্থা ও প্রকৃতি।

শ্রীধর ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণের পর, ঠাকুরের সঙ্গছাড়া কখনও হ'ন নাই বলিলেই হয়; বিশেষ প্রয়োজনেও শ্রীধর ঠাকুরের সঙ্গত্যাগে নারাজ, উহা যেন যমযাতনা মনে করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে শ্রীধরকে একান্ত ভজনপরায়ণ, শান্ত, সরল, নিষ্ঠাবান্, বিশ্বাসী এবং অতি মধুর প্রকৃতির একজন ভাবেষণ মহাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। আবার মাথা গরমের অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বিষম পাগল বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের উদয়ের সময় হইতে শ্রীধরের মাথা গরমের সূচনা হয়, আর চন্দ্রবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশঃ চড়িতে থাকে। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীধর কোথায় কি অবস্থায়, কোন্ রূপ ধরিবেন, কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই সময়ে আশ্রমস্থ সকলেই সশঙ্কিত থাকেন, কখন শ্রীধর কার ঘাড়ে চাপেন। কিন্তু এই উন্মাদ অবস্থায়ও শ্রীধর কোন না কোন প্রকারে ধর্ম্মেরই একটা অমুঠান না করিয়া থাকিতে পারেন না। গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী হইতে তাহাদের জাতগারে ঝগড়া করিয়া বা অজ্ঞাতসারে, প্রয়োজনীয় কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জালেন এবং দিনরাত একভাবে বসিয়া ধূনি তাপিতে থাকেন। কখনও একতারা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান করিতে করিতে ভাবে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। আবার কখনও বা অগ্নে পছন্দ না করিলেও, নিজ হইতেই ঘাড়ে পড়িয়া কাহাকেও ধর্ম্ম উপদেশ করিতে করিতে অস্থির করিয়া তুলেন। এ সময়ে শ্রীধর কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম্মবুদ্ধিতেই লৌকাচার-বিরুদ্ধ কার্য্যেরও অমুঠান করিয়া খুব নিভীক ও সরলভাবে দশ জনের নিকট তাহা বলিয়া স্পষ্টা করিতে থাকেন। মধুর প্রকৃতি শ্রীধরকে মাথা গরমের অবস্থায়ও প্রায় সকলেরই মধুর লাগে। যখনই শ্রীধর যেখানে থাকুন না কেন, সকল অবস্থায়ই শ্রীধর আনন্দে ডগমগ। নিতান্ত বিমর্ষ ব্যক্তিও শ্রীধরের সঙ্গলাভে হর্ষ লাভ করেন। তবে মাথা গরমের অবস্থায় যখন শ্রীধর যাহার রাশিতে ভার হ'ন, তখনই তাহার পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়।

গুরুতে অবজ্ঞা দর্শনে শ্রীধরের মাথা গরম।

সম্প্রতি হাই স্কুলের জনৈক প্রসিদ্ধ হেড্‌মাষ্টার জীববিয়োগ শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে তাঁর সমস্ত শোক দুঃখের কথা জানাইয়া বলিলেন—
“মহাশয়! এখন আমার শাস্তি কিসে হয় বলিতে পারেন?”

ঠাকুর তাঁহার হৃৎথে খুব হৃৎথ করিয়া বলিলেন—“শোক অতি বিষম জিনিস ; ইহার শাস্তি কিছুতেই হয় না । সময় যত যাবে, শোক ততই আপনা আপনি ধীরে ধীরে কমে আসবে । এখন রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ, সংসঙ্গ ও যতটুকু পারেন ভগবানের নাম করে সময় কাটাতে চেষ্টা করুন, এতে কতকটা শাস্তি পাবেন ।”

ভদ্রলোকটি ঠাকুরের উপদেশে বোধ হয় তেমন তৃপ্তিলাভ করিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন এবং দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ করিলেন । ঐ ঘরের এক কোণে শ্রীধর নিজ আসনের সম্মুখে ধূনি জালিয়া, স্থিরভাবে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া জপ করিতেছিলেন । কদমলগোড়া লেংটিপয়া শ্রীধরকে একভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া, ভদ্রলোকটির মনে একটা আশা হইল ; তিনি কিছুক্ষণ শ্রীধরের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, “বাবাজী ! কিছুকাল হয় আমার শ্রীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার বড়ই ক্লেশ, একটু আরাম কিসে হয় বলিতে পারেন ?” শ্রীধর শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন—“হাঁ, আরাম কিসে হবে বলতে পারি । ঐ ঘরে যান, গৌসাইয়ের কাছে গিয়ে বসুন, তাঁকে কষ্টের কথা সব খুলিয়া বলুন, আরাম পাবেন ।” ভদ্রলোকটি বলিলেন—“মহাশয় ! এতক্ষণ ত গৌসাইয়ের কাছেই ছিলাম । তিনি যা বলেন তাও শুনলাম । ও সব ত টের শুনা আছে, আপনি দয়া করে কিছু বলুন না ?” ‘ও সব ত টের শুনা আছে’ ঠাকুরের কথায় এরূপ অবজ্ঞাসূচক ভাব দেখিয়া, শ্রীধরের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিল ; শ্রীধর বলিলেন “বিয়ে কর্কেন ?”

মাষ্টারটি বলিলেন—“না মহাশয়, সে সব আর না । আপনি আমাকে এমন কিছু প্রক্রিয়ার উপদেশ বলুন, যাতে একটু আরাম পাই ।” শ্রীধর তখন খুব উত্তেজিত হইয়া হাত নাড়া দিয়া বলিলেন—“আমার কাছে প্রক্রিয়া শিখবেন ! আচ্ছা যান, এখন গিয়ে এই ক্রিয়া করুন, খুব আরাম পাবেন ।” ভদ্রলোকটি শ্রীধরের হাতমুখনাড়া দেখিয়া এবং শ্রীমুখের বচন শুনিয়া চটিয়া আগুন হইলেন । অমনই গৌসাইয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীধরের সমস্ত ব্যবহারের পরিচয় দিয়া বলিলেন—“একে কি আপনি শাসন করবেন না ?”

ঠাকুর এ সব কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্বক শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন—“একি শ্রীধর ! তুমি ত অতি বিষম লোক দেখতে পাচ্ছি ! এই ভদ্রলোকটিকে তুমি কি বলেছ ? এরূপ পাগলামী করলে এখানে তোমার থাকা হবে না । খুব সাবধান হ’য়ে চল, না হ’লে এখনই এখান থেকে চ’লে যাও ।”

শ্রীধরের মাথা আগেই গরম হইয়াছিল, এখন আবার ঠাকুরের ধমক খাইয়া তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “আপনার কাছে ধর্মের উপদেশ শুনে ইহার তৃপ্তি হয় নাই, আরাম হয় নাই ।

আমার কাছে গেছেন শাস্তির উপদেশ নিতে ! আমি কি আচার্য্য ? আমার যখন স্ত্রী মরেছিল, তখন আমি যা ক'রে আরাম পেতাম, তাই বলেছি। আমার যেমন অধিকার, আমি ত তেমনই বলব। এতে আমার দোষ হ'লো ?"—এই মাত্র বলিয়া শ্রীধর অমনই দ্রুতপদে নিজ আসনে চলিয়া আসিলেন এবং চোখ মুখ রাঙ্গাইয়া বলিতে লাগিলেন—শালা ! গোঁসাইয়ের কথা অগ্রাহ্য ক'রে, আমার কাছে এসেছে আরামের উপদেশ নিতে !" সমস্ত দিন শ্রীধর রাগে গমগম করিয়া কাটাইলেন। ঠাকুর ভদ্রলোকটিকে শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থার পরিচয় দিয়া, ক্ষমা চাইলেন এবং খুব মিষ্ট ভাবে উপদেশ দিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। শ্রীধরের কার্য্য মাথা গরম হইলে কখনও কখনও এই প্রকার স্ফটিকছাড়া দেখা যায়।

ঠাকুর আমাদের মত একগুঁয়ে, অসংযত ও উন্মাদ প্রকৃতি শিষ্যদের বুকে রাখিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তায় কি প্রকারে স্থির আছেন এবং সকলের বিয় হজম করিয়া কি ভাবে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এইটুকুই দেখিবার বিষয়। প্রতিপদেই আমাদের অত্যাচার ও অবাধ্যতায় ঠাকুরের দৈর্ঘ্য, বিরোধ বিসংবাদে শান্তি, এবং সকল প্রকার দুর্ব্বাস্থায় ঠাকুরের অসাধারণ দয়া ও সহ্যভূতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বাইতেছি।

শ্রীধরের জঠরানলে আহুতি।

শ্রীধরের আর একটি কার্য্য এস্থলে লিখিয়া রাখিতেছি। শ্রীধরের অস্বস্থ হওয়ার কয়েক দিন পূর্বে একদিন আমাদের আশ্রমের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইল। সকাল বেলা উঠিয়া বুড়োঠাকুর (দিদিয়া) ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছুই তিন বাড়ী ঘুরিয়া ধার করিয়া দু'টি টাকা আনিলেন এবং শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীধর ! এখন ধান ধারণায় চল্বে না, আসন থেকে ওঠ, ভাণ্ডার একেবারে শূন্য, একবার বাজারে যাও, বাজার হ'তে এলে রান্না চড়্বে।"

শ্রীধর বুড়োঠাকুরের কথায় কোন জবাব না দিয়া চোখ বুজিলেন। বুড়োঠাকুর পুনঃ পুনঃ শ্রীধরকে ডাকিতে আরম্ভ করায় শ্রীধর চাঁৎকার করিয়া বলিলেন, "বাজার কি অমনই হয় ? টাকা ফেলুন ; টাকা কই ?" বুড়োঠাকুর টাকা দিতেই শ্রীধর টাকা হাতে লইয়া আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং বাজারে যাইতে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বুড়োঠাকুর শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীধর ! কি কি জিনিস আনবে, তা একবার শুন্লে না ?" শ্রীধর বলিলেন, "আমি কি ভাত খাই না ? কি আনবো তা আর জানি না ? ডাইল আনবো, চাউল আনবো, আবার কি ?" বুড়োঠাকুর আর বেশী কথা না বলিয়া যে সকল জিনিস আনিতে হইবে বলিয়া দিলেন। শ্রীধর বলিলেন, "আপনি যান, গিয়ে উত্তন ধরান, আমি ত যাব আর আসব।" এই বলিয়া শ্রীধর ঝোলা কাঁধে লইয়া বাজারে চলিলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল ; শ্রীধর আসিতেছেন না

খিয়া বুড়োঠাকুরগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বেলা দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীধরের কোন
 ঐজ খবর না পাইয়া, এবাড়ী ওবাড়ী হইতে চাউল ডাইল ধার করিয়া আনিয়া রান্না চাপাইলেন।
 রা হইয়া গেল, তথাপি শ্রীধর আসিলেন না। সকলে ডাল ভাত মাত্র আহাৰ করিয়া বিশ্রাম করিতে
 গিলেন। বেলা সারে বারটা, ঠাকুরের ধূনি আমতলায় জ্বলিল। ঠাকুর আহাৰান্তে আমতলায় ঘাইয়া
 মিলেন। মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল, বেলা প্রায় দুইটা; শ্রীধর একটা বড় পুঁটুলি ঘাড়ে লইয়া
 তপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে আমতলায়, ধূনি সম্মুখে রাখিয়া আসন
 রিয়া বসিয়া পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর অন্তর এক একবার শ্রীধর পুঁটুলি হইতে ধূপ ধূনা,
 দন, গুগ্গুলাদি মুঠে মুঠে তুলিয়া, ‘অগ্নয়ে স্বাহা,’ ‘অগ্নয়ে স্বাহা’ বলিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি
 তে লাগিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া কোন কথাই না বলিয়া খুব আনন্দের সহিত মৃদু মৃদু হাসিতে
 গিলেন। কিছুক্ষণ পরে বুড়োঠাকুরগণ, শ্রীধরের কথাই ঠাকুরকে বলিতে আমতলায় আসিয়া উপস্থিত
 হলেন। ঐ সময় শ্রীধরকে হিরভাবে বসিয়া ধূনির দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, কিছুক্ষণ অবাক
 হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর বুড়োঠাকুরগণকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বুড়োঠাকুরগণ শ্রীধরকে
 লিলেন, “কি শ্রীধর! তুমি বাজারে যাও নাই?” শ্রীধর সে কথার কোন জবাব না দিয়া, খুব
 নোষোগের সহিত পুঁটুলি হইতে ধূনা চন্দনাদি মুঠে মুঠে তুলিয়া ‘অগ্নয়ে স্বাহা,’ ‘অগ্নয়ে স্বাহা’ বলিয়া
 ণ্ডনে আহুতি দিতে লাগিলেন। বুড়োঠাকুরগণ বলিলেন, “পাগল! এ কি কাণ্ড! এতে কি দিন
 বে?” শ্রীধর খুব তেজের সহিত বলিলেন, “আবার কি বলছেন আপনি? জঠরানল ত অনল?
 ণ্ডনে আহুতি দিলে কখনও আবার ক্ষুধা থাকে? শাস্ত্র জানেন?”

শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব হাসিয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাকুরগণকে বলিলেন—“আপনি
 জ্ঞার কর্ত্তে শ্রীধরকে টাকা দিয়েছেন। শ্রীধর ঐ টাকা দিয়ে ধূপ ধূনা এনে জঠরানলে
 মাহুতি দিচ্ছেন।”

সকলেই শ্রীধরের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীধরের তখন বাক্যটি নাই, বুড়োঠাকুরগণ
 ণ করিয়া বাজারের টাকা দিয়েছিলেন, হুতরাং ‘টাকা কি করিলে’ বলিয়া গালাগালি দিতে
 গিলেন। শ্রীধর আর আসনে না থাকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাকুরগণের নিকটে ঘাইয়া
 লিলেন, “হয়েছে, হয়েছে! এখন চলুন, এত বেলা হয়েছে, আমার ক্ষুধা পায় না? খাবার দিন,
 ণালিতে পেট ভরে না।”

বুড়োঠাকুরগণ শ্রীধরের মাথা গরম বুঝিয়া তাড়াতাড়ি সঙ্গে লইয়া গিয়া খাবার দিলেন। শ্রীধরের
 ই প্রকার পাগলামী প্রায় সৰ্বদাই দেখিতেছি। বুড়োঠাকুরগণের ঘাড়েই এ সকল উৎপাত উপদ্রব
 অনেক সময় পড়িয়া থাকে। শ্রীধরের মাথাগরমের পাল্লায় দিদিমার সহিষ্ণুতা ও দয়া দেখিয়া অবাক
 ইতেছি।

আশ্বিন মাস ।

মাঠাকুরুণের সমাধিমন্দির ।

আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে মাঠাকুরুণীর দর্শন আকাজ্জক্য বাড়ী গেলাম । বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিতে দশ বার দিন বিলম্ব হইল । এদিকে দেখিতে দেখিতে শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল । আফিস আদালত স্থল প্রভৃতির ছুটি হইল । দলে দলে গুরুভ্রাতাভগিনীগণ গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিলেন । ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই প্রাণে কত আনন্দ ! মহাষ্টমীর দিনে মহামায়ার পূজা বহুকাল আমরা দেখি নাই । এবার ঠাকুরের রূপায় তাঁরই ইচ্ছায় ঐ তিথিতে ভগবতী যোগমায়ার অস্থি নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে । মাঠাকুরুণের নিত্য সেবা পূজা ঐ তিথিতে আরম্ভ হইবে । ঐ দিনের কল্পনা করিয়া এখন হইতেই আমাদের মনে কত আনন্দ ! গুরুভ্রাতাদের সম্মিলনে ঠাকুরের আশ্রমে একমাত্র ঠাকুরকে নইয়াই আমাদের নিত্য আনন্দ ও মহোৎসব । এবার মহাষ্টমীতে দেশব্যাপী মহাআনন্দের দিনে, ঠাকুর আমাদের স্নেহময়ী মাতা যোগমায়ার স্মৃতি জাগাইয়া তাঁর শীতল বিমল আনন্দপ্রদ শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া থাকিবার অবসর দিবেন । এবার হইতে আমাদেরও প্রতি বৎসর মহাষ্টমী তিথিতে মহামায়া ভগবতী যোগমায়ার মহাপূজা হইবে মনে করিয়া গুরুভ্রাতাভগ্নীদের কতই আনন্দ, কতই উৎসাহ ।

মাঠাকুরুণের অন্তর্দ্বারের কিছুকাল পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে একদিন ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘দেখিবে এবার গেণ্ডারিয়াতে অবিলম্বেই শঙ্খ, ঘণ্টা, কঁাসর বাজিবে ।’ তখন একবার কল্পনাও করি নাই যে ইহা মাঠাকুরুণেরই সমাধিমন্দিরে ঘটবে ।

মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে ; ঠিক নক্সার অনুরূপ হয় নাই । ঠাকুর মন্দির দেখিয়া বলিলেন—“ভগবানের ইচ্ছায় যা হবে, তাতে কি মানুষের আর কোনও হাত আছে ? নক্সা মত প্রস্তুত কর্তে রাজেরা ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু আর এক প্রকার হ’য়ে গেল । মন্দিরটি অনেকটা বিষ্ণুমন্দিরের মত হ’য়েচে ।”

মন্দিরপ্রতিষ্ঠাপ্রণালী ।

পঞ্চমী তিথিতে সকালে নয়টার সময়ে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—“মহাষ্টমীর দিনে প্রতিষ্ঠার কার্যটি তুমি করবে । ঐ দিনে তোমার নিত্যকর্ম মন্দিরে ব’সে ক’রো । চণ্ডীপাঠ ক’রে হোম ক’রো, তা হলেই হবে ।”

আমি বলিলাম—“সমস্ত চণ্ডীখানি পাঠ করিয়া কি হোম করিব ? হোম কি যেমন করিয়া থাকি, তেমনই করিব ?”

ঠাকুর বলিলেন—“সমস্ত চণ্ডী পাঠ না ক’রেও হয়। যে হোম ক’রে থাক, তাই ক’রো, একশত আটটি আহুতি দিও।”

পাছে চণ্ডীপাঠের সময়ে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে চণ্ডীপাঠ ভুল হয়, এই আশঙ্কায় চণ্ডী আবৃত্তি আরম্ভ করিলাম। ভাল দেখিয়া শুক বিদ্যকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। এই প্রতিষ্ঠা কাৰ্য্যে দেখিতেছি, আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ রূপা! জয় গুরুদেব!

সপ্তমী তিথিতে শ্রীমন্দিরের জমির মধ্যস্থলে পাকা চতুষ্কোণ ‘সিমেন্ট’ করা কুণ্ডের ভিতরে যোগজীবন প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা একটি কোঁটায় ভরিয়া মাঠাক্করণের অস্থি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার নামাঙ্কিত সাদা ‘মারবেল’ প্রস্তরে আবৃত করিয়া, সিমেন্ট দিয়া পাকা করিয়া আঁটিয়া দিলেন। পরে উহার উপর একখানি জলচৌকি রাখিয়া, তত্পরি মাঠাক্করণের ব্যবহৃত আসন, বালিশ, বস্ত্রাদি, গদি আকারে পরিপাটীরূপে সাজাইয়া গৈরিক বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। তাঁহার একখানি ‘ফটো’ এবং ঠাকুরের লেখা “নামব্রহ্মের” পট কল্যা উহার উপর স্থাপন করা হইবে।

নানা শ্রেণীর পত্রপুষ্পে মালা গাঁথিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ বেঁধেন করা হইয়াছে। মন্দিরের সিঁড়ির দুই পাশে দুইটি কদলি বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার মূলদেশে দুইটি পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। কল্যা আশ্রপল্লব, নারিকেল ও পুষ্পমালা উহা যথারীতি সাজান হইবে। সন্ধ্যার সময়ে আমতলায় সঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীৰ্ত্তনানন্দে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া আপন আপন আসনে ঘাইয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম।

মাঠাক্করণের সমাধি-প্রতিষ্ঠা।

মহাষ্টমীর দিনে অল্পদয়ে বুড়ীগঙ্গায় স্নান তর্পণাদি করিয়া আসিলাম। মালা তিলক ধারণ করিয়া, ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, সমাধি-প্রতিষ্ঠার অনুমতি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কুতুবুড়ী ও মঙ্গলী প্রতিষ্ঠা কার্য্যের যাবতীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল। দক্ষিণে মাঠাক্করণের আসন রাখিয়া পূর্বাভিমুখে নিজ আসন পাতিয়া বসিলাম। মাঠাক্করণের ‘ফটোকে’ পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া গদির উপরে উত্তরমুখ করিয়া স্থাপন করিলাম। “নামব্রহ্মের” পটখানিকেও ঐ প্রকার নমস্কার করিয়া মাঠাক্করণের গদির উপরেই রাখা হইল। মন্দিরের মেজ্জেতে বালি সাজাইয়া হোমের জগ্গ বিষ্ণু ও উদ্ভূষর কাষ্ঠ ঠিক করিয়া রাখিলাম। আতপ তণ্ডুল, রস্তু, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা সুন্দররূপে প্রস্তুত করা নৈবেদ্য কয়েকখানি আনা হইলে, হোমকুণ্ডের ধারে উহা ধরিয়া রাখিলাম। পরে আচমনান্তে কয়েকবার প্রাণায়াম ও কুম্ভক করিয়া হিরন্ময়ে মাঠাকুরাণীর সেই স্নেহপূর্ণা রূপাময়ী মূর্ত্তিকে ধ্যানে রাখিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম। তৎপরে নির্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপান্তে, ফুল, তুলসী, বিল্বপত্রাদি



ত্রিযুক্তেশ্বরী মাঠাকরণ শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী



দ্বারা মাঠাকুরাণীর পূজা করিয়া, ফটো ও নামব্রহ্মের পট পরিণাটরূপে মালা, তুলসী, পুষ্প ও চন্দনাদি দিয়া সাজাইলাম। অনন্তর মহাষ্টমী পূজার লগ্নে শঙ্খ, ঘণ্টাধ্বনি করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে শঙ্খ, ঘণ্টা, কঁাসর বাজিয়া উঠিল; এই সময়ে ঠাকুর ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনিমেষ নয়নে ঠাকুর, মাঠাকুরাণীর ফটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া, কয়েক শ্লোক চণ্ডীপাঠ শুনিয়াই মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভাবাবেশে দক্ষিণে বামে হেলিয়া দুলিয়া মন্দির পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। গুরুভাইভগ্নীরা আনন্দধ্বনি করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, কঁাসর বাজাইতে বাজাইতে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। মেয়েরা মুহূর্হঃ হলধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার চণ্ডীপাঠ শেষ হইয়া গেল। মাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া হোমায়ি প্রজ্জলিত করিলাম। বিষ্ণু গব্যায়ত সংযোগে অখণ্ডিত বিষপত্র দ্বারা হোম আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের অদ্ভুত রূপা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। হোমায়ি প্রজ্জলিত হওয়া মাত্রই উহা দক্ষিণাবর্ত হইয়া নানাবর্ণের শিখা বিস্তার করিয়া মাঠাকুরাণীর ফটোর অভিমুখে ধাবিত হইল। উজ্জল তায়বর্ণ নখপরিমিত এক জ্যোতির্ময় মূর্তি অতিশয় চঞ্চলভাবে সমস্ত অগ্নিতে ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া ক্ষণে অন্তর্দান, ক্ষণে প্রকাশ হইতে লাগিলেন। মূর্তির দিকে দৃষ্টি কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিলাম না। অথচ অগ্নির যে দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তথায়ই বিদ্যুতের মত অত্যুজ্জল চঞ্চলমূর্তি নৃত্য করিতে করিতে ক্ষণে প্রকাশ, ক্ষণে অন্তহিত হইতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। সে মূর্তিটি আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া আমার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না; আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। হোমকার্য্যে ১০৮টি আহুতিদান সম্পন্ন হইল। নৈবেদ্য মাঠাকুরাণীকে নিবেদন করিয়া দিয়া আরতি করিলাম। পরে বারান্দায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলাম। জয় ঠাকুর, তোমারই জয়! তোমারই জয়!! তোমারই জয়!!!

মধ্যাহ্নে বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পক্কান দ্বারা মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ রহিল। ভোগ সরিলে সকলে প্রসাদ পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে কুতুবুড়ী মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। তৎপরে মন্দিরের প্রাঙ্গণে সঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল। সকলে ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মাতিলেন। কীর্ত্তনের পর ঠাকুর স্বহস্তে ‘হরির লুট’ বিলাইয়া আপন আসনে যাইয়া বসিলেন। আমরাও স্ব স্ব স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম।

হোম করিতে করিতে শেষকালে অকস্মাৎ এক বিষম উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল। কাঁচা সিমেণ্টের উপর হোমায়ি প্রজ্জলিত হওয়ায়, সিমেণ্ট ফাটিয়া চটাচট শব্দে চটা উঠিয়া, জলন্ত কয়লার সহিত চতুর্দিকে ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত ঘরে ও বারান্দায় জলন্ত কয়লা গিয়া পড়িলেও, এক টুকরা সিমেণ্ট বা কয়লা মাঠাকুরাণীর অর্দ্ধহস্ত তফাৎ আসনে বা আমার শরীরে আসিয়া পড়ে নাই।

শক্তিপূজা ও ভগবানের নরলীলা ।

নবমীর দিনে প্রত্যুষে স্নান তর্পণ করিয়া আনিয়া ঠাকুরকে প্রণাম
২৬শে আশ্বিন, সোমবার ।
করিতে গেলাম ।

ঠাকুর আমাকে বলিলেন—“তোমার নিত্যক্রিয়া মন্দিরে ব’সেই ক’রো, চণ্ডীপাঠ ক’রে
হোম ক’রো ।”

গত কল্যা মন্দিরের মেজের চটা উঠিয়া গিয়াছে বলাতে ঠাকুর বলিলেন—“মন্দিরের মেজেতে
হোম না ক’রে পিতলের যে একখানি বড় ধুঁচি আছে তাতে হোম ক’রো ।”

আমি বুড়োঠাকুরের কাছে চাহিয়া ঐ ধুঁচি আনাইয়া লইলাম । নাম, প্রাণায়াম ও গায়ত্রী জপ
করিয়া, গীতা ও চণ্ডী পাঠের পর হোম করিয়া, মাঠাকুরাণীর পূজা করিলাম । তৎপরে মাষ্টাঙ্গ
প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম । বেলা ১২টার সময়ে মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল ।
‘ভোগ দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা আবশ্যক,’ ঠাকুর এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন ।

সন্ধ্যার সময়ে পঞ্চপ্রদীপ, ধূনা, শঙ্খ, বস্ত্রাদি দ্বারা কুতুবুড়ী মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন ।
শঙ্খ, ঘণ্টা, কঁাসরের ধ্বনিতে আশ্রম ঘেঁষন নৃত্য করিতে লাগিল । সন্ধ্যা আরতির পর সকলে মিলিয়া
আমতলায় সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেন । ঠাকুর ‘হরির লুট’ দিলেন ।

(দশমীর দিনে) মাঠাকুরাণীর পূজা নিতাই এক নিয়মে চলিল । আজ সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি
ঠাকুরের নিকট শক্তিপূজা, দুর্গাপূজা, মূর্তিপূজা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন ।

আমি বলিলাম—“শ্রীরামচন্দ্র কি দুর্গাপূজা করেছিলেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“হঁা করেছিলেন । এ সম্বন্ধে বাস্কীকি রামায়ণে কোনও উল্লেখ নাই,
কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অগ্ৰাণ্য স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে ।”

আমি বলিলাম—“শ্রীরামচন্দ্র ত স্বয়ং ভগবান্ । তিনি ত সবই জানিতেন, সবই পারিতেন, তিনি
আবার দুর্গাপূজা করিলেন কেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“এ যে নরলীলা ! এখানে জানা টানার, পারা না পারার কোন কথা
নাই । তিনি যদি পূর্ণব্রহ্মের ন্যায়ই সব করবেন, তা হ’লে আর অবতীর্ণ হ’লেন কেন ?
সেখানে থেকেই ত সব করতে পারতেন । তাঁর আর অসাধ্য কি আছে ! যাঁর ইচ্ছাতে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্ছে, তিনি মুহূর্তে কি না করতে পারেন ! যখন তিনি যে উদ্দেশ্যে
অবতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক সেইরূপই আচরণ করেন । লীলাসময়ে তাঁর আপন মায়া-
শক্তি দ্বারাই তিনি আপনাকে আপনি আচ্ছন্ন রাখেন, যেমন গুটিপোকা আপন সূতায়
আপনি আবদ্ধ হয় । তাঁর লীলা কি বুঝবার সাধ্য আছে ! শুধু তাঁর কৃপা ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“শ্রীরামচন্দ্র যে বালিবধ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেন।”

ঠাকুর বলিলেন—“তাদের কথায় কর্ণপাতও করতে নাই, অনিষ্ট হয়। যাঁরা সমস্ত শাস্ত্র আগাগোড়া পড়েন না, বুঝেন না, তাঁরাই ওরূপ বলেন। যাঁরা শাস্ত্রের কতক অংশ গ্রহণ করেন, কতক অংশ ত্যাগ করেন, তাঁরা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, নিজের মনোমত কথাই বেছে নেন মাত্র। তাঁদের আবার শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রচর্চা কেন? শাস্ত্র বিশ্বাস করলে, আগাগোড়া সমস্ত শাস্ত্রই বিশ্বাস করতে হয়। একটু ক’রে, একটু না করলে চলবে কেন? শাস্ত্রকর্তারা কোন কথাই ত গোপন ক’রে যান নাই, সমস্ত বিষয়েরই পরিষ্কার মিমাংসা ক’রে গেছেন। দুর্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, একান্ত শরণাগত ভক্ত সুগ্রীবকে রক্ষা করবার জন্তই যে শ্রীরামচন্দ্র, ভ্রাতৃদারাপহারী বালিকে বধ করেছিলেন, তাহা ত পরিষ্কাররূপে রামায়ণে লেখা আছে। কোনও শাস্ত্রগ্রন্থেরই আগাগোড়া সমস্ত বিষয় বিশ্বাস ক’রে না পড়লে, একটা অর্থবোধ হয় না। শ্রদ্ধার সহিত যাঁরা শাস্ত্র পাঠ না করেন, তাঁরা শাস্ত্র না পড়ে ইংরাজি পুস্তকে বাঘের গল্প, কুকুরের গল্প পড়লেই ত পারেন। শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস ক’রে না পড়লে, শাস্ত্র পড়া আর না পড়া সমান।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“ব্রজগোপীরা যে ভগবতীর পূজা করেছিলেন, তাহা কি কোনও মূর্তি গড়ে? গোপীরা আবার শক্তিপূজা করলেন কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“শক্তিপূজা না ক’রে কারও কি পার পাবার যো আছে? শক্তির কৃপা না হ’লে কিছুই যে হয় না। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্তই কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। এখনও সেই প্রণালীমত ব্রজমায়ীরা প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে প্রাতঃস্নান ক’রে যমুনার কুলে বালি দিয়ে বেদি প্রস্তুত করেন এবং তাতে কাত্যায়নী পূজা করেন। এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার মূর্তি স্থাপন হয় না। মূর্তিপূজার বহু প্রণালী আছে। বেদীতে পূজা করা বা যন্ত্র এঁকে পূজা করা এই মূর্তিপূজারই প্রকারভেদ মাত্র।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“দুর্গা ও কালী একই ত শক্তি; কারও পূজা রাত্রিতে, আবার কারও পূজা দিনে কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“শক্তিপূজা তত্ত্বমতেও হয়, আবার বৈদিকমতেও হয়। কালীপূজা তত্ত্বমতে রাত্রিতে হয়, আর দুর্গাপূজা বৈদিকমতে দিনে হয়। হিমালয়ের ঘরে প্রথমে শ্যামবর্ণা দ্বিভূজা কালী জন্ম গ্রহণ করেন, তার পরে পার্বতী।”

ব্রহ্মজ্ঞান ও অবতারতত্ত্ব ।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—“নিগুণ পরব্রহ্মই কি আবার সাকার হ'য়ে লীলা করেন ? মহাপ্রলয়ে এই সমস্তই কি সেই পরব্রহ্মে লীন হয় ?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, মহাপ্রলয়ে কিছুই আর থাকে না । ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যা কিছু সমস্তই অদ্বয় ব্রহ্মেরই পরিণাম । ব্রহ্মছাড়া আর কিছুই নাই । শ্রুতিতে বলেছেন—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যতিসংবিশন্তি, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥’ ‘যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে’ ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু ‘যাহা কর্তৃক হইয়াছে,’ এইরূপ বলেন নাই । পঞ্চমীতে রেখে গিয়েছেন ; করণার্থে তৃতীয়া করেন নাই । ‘যাহা হইতে’ যেমন মৃত্তিকা হ'তে ঘট, স্বর্ণ হ'তে কুণ্ডল, সমুদ্র হ'তে তরঙ্গ ইত্যাদি । মৃত্তিকা এবং ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকারই এক প্রকার পরিণাম ঘট, স্বর্ণেরই এক প্রকার পরিণাম কুণ্ডল, এবং সমুদ্রেরই এক প্রকার পরিণাম তরঙ্গ । তা হ'লেও ঘটকে মৃত্তিকা এবং তরঙ্গকে সমুদ্র বল্লে হবে না ; ঘটই বল্তে হবে, তরঙ্গই বল্তে হবে । সেইরূপ ব্রহ্ম অদ্বয়, আর চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই পরিণাম । তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন ; ‘কুন্তকার এবং ঘট’ এই প্রকার দৃষ্টান্ত তাঁরা দেন নাই । যত কিছু সমস্তই ব্রহ্ম । পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা আর এই লাঠিখানি, মালাটি, এই অস্থি, মাংস, আমি, সবই ব্রহ্ম । ইহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান । এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান হ'লেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝতে পারে । নিগুণ অদ্বয়তত্ত্ব স্ফূর্তি না হ'লে, সগুণ সাকারতত্ত্ব বুঝবার কি সাধ্য আছে ! সাকার কি এমনই সোজা কথা ! শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

“বদন্তি তত্ত্ববিদ স্তব্ধং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥”

এই নিগুণ পরব্রহ্মই আবার সাকার হ'য়ে লীলা করছেন । কাক ভুগুণ্ডীর পর্য্যন্ত সংশয় জন্মেছিল । ‘সেই নিগুণ পরব্রহ্মই কি এই দশরথনয় শ্রীরামচন্দ্র ? তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে ?’ এক দিন শ্রীরামচন্দ্র আঙ্গিনায় হাতে ক'রে খাবার খাচ্ছেন ; কণিকা মাটিতে পড়ছে, আবার তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন । কাক ভুগুণ্ডীকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু হেসে ধরবার জন্য শ্রীহস্ত বাড়ালেন, ভুগুণ্ডী ভয়ে পলাল । কিন্তু হাত তার

পেছনে পেছনে চল্ল। কাকভুগুণী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে লাগলেন, শ্রীহস্ত তার পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে, পুনরায় দশরথের আঙ্গিনার সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাসলেন। তখন ভুগুণী শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক, লোকান্তর, চতুর্দশ ভুবন, সমস্ত রামচন্দ্রের শ্রীমুখের ভিতরে বর্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে, এইরূপ কতশত রাম লালা করছেন। নিজেকেও ভুগুণী এরূপ একস্থানে দেখলেন। এ সকল দেখে ভুগুণী ত অবাক! শ্রীরামচন্দ্র তখন আবার একটু হাসলেন, ভুগুণী অমনি মুখ হ'তে বা'র হ'য়ে পড়লেন। প্রত্যক্ষ এ সমস্ত দেখলেন, তথাপি সন্দেহ দূর হ'লো না। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কৃপা করলেন; অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব তাঁর কাছে প্রকাশ হ'ল। তখন ভুগুণী সমস্তই বুঝলেন। খণ্ডপ্রলয়ে একটি ব্রহ্মাণ্ডের লয় হ'লেও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে যায়; কিন্তু মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তুই যখন নাই, তখন কিছু আর থাকে না, এরূপও বলা যায় না, থাকে এরূপও বলা যায় না। ব্রহ্ম নিত্য, স্মৃতিরঃ সমস্তই নিত্য।”

এ সকল উপদেশের পর নানাপ্রকার গল্প আরম্ভ হইল। পাগ'লা শ্রীধর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“ব্রহ্মকে জানিয়াছি তাহাও নহে, ব্রহ্মকে জানি নাই তাহাও নহে; এই কথার অর্থ যিনি জানিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানিয়াছেন। উপনিষদের এই কথা শ্রীধর এ সময়ে বলাতে সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

ভগবানের নরলীলা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“পরমেশ্বরকে ত সকলেই বিশ্বাস করে; তবে তিনি সংসারে যখন অবতীর্ণ হন, তাঁকে ধরা যায় না কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্বত্রই রয়েছেন, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের তাঁর উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ। সাধকেরা প্রথম এই ব্রহ্মজ্ঞানেই উপাসনা করেন। অবতারতত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে বিশ্বাস অনেক পরে। যিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, রোগের যন্ত্রণায় ‘আহা উহ, গেলাম্‌রে, ম'লাম্‌রে’, চীৎকার ক'রে ছটফট করছেন, শোকেতে অস্থির হ'য়ে ‘কোথা গেলরে কোথা গেলে পাবরে’ ব'লে, কেঁদে কেঁদে দেশ দেশান্তরে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও ক্ষুধায় কাতর হ'চ্ছেন, কখনও বা পিপাসায় অস্থির হ'চ্ছেন, ইনিই সেই সর্ববশক্তিমান, সর্বব্যাপী,

আনন্দময়, চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ইহা মনে করা, বিশ্বাস করা কি তামাসার কথা ! তিনি যাঁকে দয়া করেন, সেই মহা ভাগ্যবান্‌ই মাত্র তাঁকে বুঝতে পারেন, না হ'লে কারোই সাধ্য নাই। স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত এতে সংশয় হয়েছিল। ব্রহ্মা ভাবলেন—‘এ কি কখনও সম্ভব ! যিনি মাঠে মাঠে হৈ হৈ ক'রে গরু চরাচ্ছেন, রোদ্দে কাতর হ'য়ে গাছতলায় যাচ্ছেন, বৃষ্টিতে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াচ্ছেন, খেলায় হেরে গিয়ে রাখাল-বালকদের কাঁধে নিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে লাফালাফি ছুটোছুটি করছেন, কখনও কাদায় পড়ছেন, আছাড় খাচ্ছেন, আবার চুরি ক'রে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পালাচ্ছেন, ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, এই গোকুলে ? আচ্ছা, দেখা যাক্‌।’ এই ভেবে তিনি অকস্মাৎ গোবৎস, রাখালগণ, বেণু, যষ্টি ইত্যাদি সমস্ত হরণ ক'রে, পর্বতের এক গুহায় লুকায়ে রাখলেন, দরজায় একখানি পাথর চাপা দিয়ে চ'লে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কৰ্ম্ম বুঝে, তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেই গোবৎস, রাখালবালক, বেণু, যষ্টি, শিক্ষা, সিকা, হাঁড়ি, লাঠি সমস্তই হ'লেন ; কেহই বিন্দুমাত্র জান্তে পারলেন না। বলরাম সেদিন গোষ্ঠে যান নাই ; বৎসগণের প্রতি গাভীগণের, সন্তানদিগের প্রতি গোপীগণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ভালবাসা দেখে বলরাম ভাবলেন, ‘এ কি ! এমনটি ত পূর্ব্বের আর কখনও দেখি নাই ? এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখছি।’ তিনি কিছু স্থির করতে না পেরে ধ্যানে বসলেন ; সমস্ত তখন জান্তে পারলেন। একটি বৎসর এই ভাবে চ'লে গেল ; পরে ব্রহ্মা এসে দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নিয়ে পূর্ব্বেরই মত জীলা করছেন। তখন ব্রহ্মা পর্ব্বতগুহায় যেয়ে দেখলেন, তিনি যে ভাবে ঐ সব রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত রয়েছে। ব্রহ্মা একবার পর্ব্বতগুহায়, আর একবার গোষ্ঠে ছুটোছুটি করতে লাগলেন ; পরে একেবারে অবাক্ হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে এসে পড়লেন ও স্তব করতে লাগলেন—‘প্রভো ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি অবোধ। সন্তান জননীর কোলে থেকে কত অত্যাচার করে, লাথি মারে, তাতে কি জননী ক্রোধ করেন ? তুমিই ধন্য ! ধন্য ব্রজবাসিগণ ! এই ব্রজের বৃক্ষ লতাও ধন্য। কারণ তাঁরা তোমার ও ব্রজবাসীদের চরণধূলি স্পর্শ পায়। দয়া ক'রে আমাকে তোমার ব্রজের বৃক্ষ লতা ক'রে রাখ।’ গ্রন্থাদিতে যেমনটি লেখা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মিত বাস করলে ক্রমে ক্রমে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভগবানের নরলীলা, তাঁর কৃপা না হ'লে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও বুঝবার যো নাই ; মানুষের আর কথা কি ?”

সংশয়সম্বন্ধে উপদেশ ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“সঙ্গে থাকিয়া ত দেখি, সন্দেহ পদে পদে । এর উপায় কি ? বিশ্বাস না হ’লে ত নিস্তার নাই ।”

ঠাকুর বলিলেন—“সংশয়ও হয় আবার বিশ্বাসও হয় ; সবই তাঁর ইচ্ছায় । শাক্যসিংহ যখন সংসারে এলেন, একদিন বাড়ীর বাহির হ’য়েই জরা, মৃত্যু, পীড়ার দৃশ্য দেখে অকস্মাৎ বিষম বৈরাগ্য হ’ল । তিনি গৃহ ত্যাগ করলেন । ছয় বৎসর কাল একটানা কঠোর তপস্বী ক’রে একেবারে স্থাপুর মত হ’য়ে গেলেন । কিন্তু যা চান, তা লাভ হ’ল না । তিনি নিরাশ হ’য়ে আসন হ’তে উঠে পড়লেন ; একটি শবের বস্ত্র পেয়ে তা পরতে উদ্বৃত্ত হ’লেন । দেবতারা ঐ বস্ত্রখানা ধুয়ে এনে দিলেন । বুদ্ধদেব ক্ষুধিত ছিলেন, আহার করতে ইচ্ছা করলেন । সেই সময়ে অভুক্ত অতিথিকে ভোজন করাবার জ্ঞান সুজাতা লোক পাঠালেন ; সে খুঁজে কোথাও লোক পেল না, একমাত্র বুদ্ধদেবকে দেখতে পেল । সুজাতা শাক্যসিংহকে একটি সুবর্ণ বাটিতে মিষ্টান্ন ভোজন করতে দিলেন । নিরঞ্জন নদীতে দাঁড়িয়ে শাক্যসিংহ মিষ্টান্ন খেতে লাগলেন । দেবতারা তখন তাঁর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালেন, কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত যে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন, তাঁরা শাক্যসিংহকে মিষ্টান্ন ভোজন করতে দেখে, পরস্পর বালাবলি করতে লাগলেন—‘দেখেছ ভাই, এ বেটা বিষম ভণ্ড ! এইরূপে মিষ্টান্নই খায়, কিন্তু আমাদের জ্ঞানিয়ে খায় না । চল, এই ভণ্ডবেটার সঙ্গে থেকে আর কিছুই লাভ নেই ।’ এই ব’লে সামান্য কারণে খটকা লাগাতে তাঁরা সকলে চ’লে গেলেন । শাক্যসিংহ ভেজনাস্তে সুজাতাকে বললেন, ‘ভগ্নি, মিষ্টান্ন খেয়েছি, এই বাটি কি করব ?’ সুজাতা বললেন—‘মিষ্টান্নের সহিত বাটিও তোমাকে দিয়েছি ।’ শাক্যসিংহ তখন সেই বাটি নদীমধ্যে নিক্ষেপ করলেন । দেবগণ তখন উহা হইতে প্রসাদ পেতে লাগলেন । ভেজনাস্তে শাক্যসিংহ অভীষ্টলাভের নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক’রে বোধিসত্ত্বমতলে বসলেন । অন্তরেণ সমস্ত রিপুকুল পরাস্ত হ’ল, বাসনা কামনা একেবারে লয় পেল, বোধিসত্ত্ব তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন, তিনি বুদ্ধ হ’লেন । বুদ্ধদেব অবতার, কিন্তু আত্মবিশ্মৃত ছিলেন । তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ ক’রে ভাবলেন, ‘এ বস্ত্র কাকে দেই ;’ তখন সেই পাঁচটি শিষ্যের কথা মনে হ’ল । তাদেরই এ বস্ত্র দিবার জ্ঞান তিনি চল্লেন । পথে ঘাট মাঝিকে নদীপার করিতে বলায়, সে পয়সা চাইল । পয়সা নাই, তখন সঙ্কল্পমাত্রেই দেখলেন অপর পারে পৌঁছেছেন ।

কাশী যেয়ে সেই পাঁচজন শিষ্যকে দেখতে পেলেন ; তাঁরাও দূর হ'তে বুদ্ধদেবকে দেখতে পেয়ে, পরস্পর বলতে লাগলেন, 'আরে ভাই, ঐ দেখ, সেই ভণ্ড বেটা ! আবার সেই বেটা এদিকে আসছে ! ওর সঙ্গে আমরা কোনও আলাপই করব না ।' কিন্তু বুদ্ধদেব যখন তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'লেন, তখন তাঁরা খুব সমস্রমে ভক্তির সহিত আদর অভ্যর্থনা করলেন । তাঁর প্রভাবকে ত আর কারও অগ্রাহ্য করবার সাধ্য নাই । বুদ্ধদেব তখন তাঁদের কৃপা করলেন এবং বললেন—'তোমরা এই বস্তু প্রচার কর ।' তাঁরাও ঐ আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে সকলকে সন্ন্যাসী করলেন । ভগবান্ যখন যা করতে আসেন, তা না ক'রে যান না । তিনি যাদের ধরেন কখনও তাদের ছাড়েন না । তিনি না ধরলে মানুষের কি সাধ্য যে তাঁকে ধ'রে থাকে ! মানুষের কিছুই ক্ষমতা নাই, তাঁর কৃপাই সার ।"

শ্রাদ্ধান্ন ও উচ্ছিষ্টের অপকারিতা ।

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা (পার্শ্বতী বাবু) ঠাকুরকে আশ্রিতলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইলে কি কোনও অনিষ্ট হয় ? আমাদের ত প্রায়ই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হ'য়ে থাকে ।”

ঠাকুর বলিলেন—“শ্রাদ্ধে আহার করলে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে, ভক্তিতাব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায় । শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করলে সকল প্রকার দুর্কার্য্যই তাহা দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে ।”

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুকাল পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন । ঘটনাটি ঢাকা হইতে কয়েক ঘণ্টার পথ তফাৎ, মুন্সিগঞ্জে ঘটিয়াছিল । বেশী দিনের কথা নয় ।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—“কিছু দিন হ'লো, একটি ভাল সন্ন্যাসী এই পথে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন । এক দিন সন্ধ্যার সময়ে মুন্সিগঞ্জে পৌঁছিয়া, একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নেন । ব্রাহ্মণ খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে নিজের ঠাকুর ঘরের বারান্দায় তাঁর থাকুবার স্থান ক'রে দিলেন । সন্ন্যাসী নিজেই রান্না ক'রে ভোজনান্তে বিশ্রাম করলেন । ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি সেই ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন, অনেক সোনার গহনা দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন । সন্ন্যাসী সন্ধ্যা-আরতির সময়ে সে সকল দেখে, খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন । শেষ রাত্রিতে তিনি সেই সকল গহনা ঠাকুরের অঙ্গ হ'তে খুলে নিয়ে চম্পট দিলেন । সকালে ব্রাহ্মণ উঠে দেখলেন, সন্ন্যাসী নাই । ভাবলেন 'উদাসীন সন্ন্যাসী, ওঁদের ত কোন লোক লৌকিকতা নাই,

ইচ্ছে হয়েছে, চলে গিয়েছেন।' ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ঠাকুর পূজা করতে ঠাকুর ঘরে যেমন প্রবেশ করলেন, দেখলেন, ঠাকুরের গায়ে সোনার গহনা নাই। দেখে ত একেবারে অবাক্। তখন সন্ন্যাসীরই এই কর্ম্য বুঝে, গ্রামের সকলকে খবর দিলেন; সকলে চারিদিকে চোরের অনুসন্ধানে লোক পাঠালেন। এদিকে সন্ন্যাসী গহনা নিয়ে, শেষ রাত্রি থেকে উদ্ধ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে, বেলা অপরাহ্নে একটি স্থানে বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে বসলেন। একটু পরে, স্থির হ'তেই, হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, 'ভাল! এ কি করলাম?' তখন মাথা কপাল চাপড়ে হাহাকার করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ আর বিলম্ব না ক'রে, আবার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে দৌড়িতে লাগলেন। সন্ন্যাসী তথায় পৌঁছিবামাত্রই, সকলে নানা প্রকার গালিগালাজ করতে লাগলেন। সন্ন্যাসী গহনার পুঁটলি সম্মুখে রেখে বললেন, 'আপনারা একটু আমাকে স্থির হ'তে দিন; আপনাদের সমস্ত গহনাই আমার কাছে পাবেন। পাড়ার দশটি ভদ্রলোককে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন, আমার কিছু বলবার আছে; সকলের সাক্ষাতেই গহনা দিব।' ব্রাহ্মণ তাই করলেন। গ্রামের দশটি ভদ্রলোক এলে, সন্ন্যাসী সকলকে বললেন, 'দেখুন, আপনাদের সকলের সাক্ষাতে এই ব্রাহ্মণকে আমি কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করছি, ইনি আমার কথাগুলির যথার্থ উত্তর দিবেন। ছেলে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমি দেশে দেশে পর্য্যটন ক'রে কাটাচ্ছি, এরূপ ছুস্মৃতি ত আমার কখনও হয় নাই। এত কাল ভজন সাধন ক'রে যা কিছু আমি লাভ করেছিলাম, আপনাদের গৃহে একবেলা মাত্র অন্ন গ্রহণ ক'রে, আমার সে সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে। আমি জীবনে কখনও কারও এক কপর্দক চুরি করি নাই। আপনার অন্ন গ্রহণের পর, অকস্মাৎ আমার এই ছুস্মৃতি হ'ল কেন? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে যা রান্না করতে দিয়েছিলেন, তাতে কি চোরের কোন প্রকার সংশ্রব আছে? একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখুন দেখি।' ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ ক'রে অনুসন্ধানে জানলেন—চাল, ডাল, ঘৃতাদি যা তিনি যজ্ঞমানের বাড়ী হ'তে পেয়েছিলেন, তাই সন্ন্যাসীর সেবাতে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ এরূপ বলান্তে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি যজ্ঞমানের বাড়ী কি কার্য্য ক'রে ঐ সকল জিনিস পেয়েছিলেন?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'কেন? শ্রাদ্ধ করিয়ে পেয়েছিলাম। তাই আপনাকে দেওয়া হ'য়েছিল।' সন্ন্যাসী চমকে উঠে বললেন—'শ্রাদ্ধাম দিয়েছিলেন? আচ্ছা, যার শ্রাদ্ধ করেছিলেন সে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল?' তখন গ্রামের সকল ভদ্রলোকই

বল্লেন—‘বাবাজী, তার কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। অমন ভয়ানক চোর আর এদেশে জন্মেছে ব’লে আমরা কখনও শুনি নাই। এদেশের লোক তার নামে কাঁপ্ত, সে কয়েকবার জেলও খেটেছিল।’

সাধু বলিলেন—“দেখুন, সেই চোরের শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণেই আমার এই সর্বনাশ। এই আপনাদের গহনা নিন, এখন আমার আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হবে না। আমার সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। এক মাস কাল আমাকে চান্দ্রায়ণ ক’রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গ্রামের সকলে তখন তাঁকে যত্ন ক’রে রেখে, চান্দ্রায়ণের জোগাড় ক’রে দিলেন। সাধু এক মাস মুন্সিগঞ্জে থেকে চান্দ্রায়ণ ক’রে চ’লে গেলেন। শ্রাদ্ধান্ন অতি বিষম জিনিস। খেলে আর রক্ষা নাই; ভক্তির দিক একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘শ্রাদ্ধান্ন ত শ্রাদ্ধের সময়ে যাহা কিছু প্রেতকে দেওয়া হয়, এই জানি। ঐ শ্রাদ্ধবাড়ীর চাল, ডাল দূষিত হয় কেন?’

ঠাকুর বলিলেন—“শ্রাদ্ধসময়ে প্রেতকে আহ্বান করা হয়। ঐ প্রেতের দৃষ্টি যে সকল বস্তুতে পড়ে, সে সমস্তই প্রেতের উচ্ছিষ্ট হ’য়ে যায়। এই জন্য শ্রাদ্ধবাড়ীর কোন বস্তুই খেতে নাই, খেলে ঐ প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়।”

পার্বতী বাবু বলিলেন—‘তা হ’লে আমরা যজ্ঞমানের বাড়ী শ্রাদ্ধ করাইয়া আর কিছু কি নিব না? শ্রাদ্ধের ভোজ্য গ্রহণ, এই নিয়ম ত চিরকালই পুরোহিতদের ভিতরে চলিয়া আসিতেছে।’

ঠাকুর বলিলেন—“ভোজ্য নিবেন না কেন? তবে উহার ব্যবহার নিজেদের কর্তৃত্ব নাই, বিক্রয় ক’রে ফেলতে হয়।”

আমি বলিলাম—‘যিনি খরিদ ক’রে নিবেন, তাঁকে ত উচ্ছিষ্ট বস্তুই গ্রহণ কর্তৃত্ব হবে।’

ঠাকুর বলিলেন—“না, যিনি মূল্য দিয়ে নিবেন, তিনি পবিত্র বস্তুই নিবেন। ‘দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি।’ মূল্য দিয়ে নিলে ওসব জিনিস পবিত্র হয়, কোন দোষই থাকে না। যিনি বিক্রয় করেন, এবং যিনি ক্রয় করেন, কারও ক্ষতি হয় না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ব্যবহৃত সকল সমাজেই আছে। শাস্ত্রেরও ইহাই বিধি বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রাদ্ধবাড়ীতে সকলেই ত নিমন্ত্রণ পায়।’

ঠাকুর বলিলেন—“শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ থাকে না কেন? শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধবাড়ীতে কিছুই খেতে নাই। ব্রাহ্মণভোজনাদি ঐদিনে ত হয় না।”

শ্রাদ্ধদিনে প্রেতকে আহ্বান করাতে প্রেতের দৃষ্টিতে ঐ বাড়ীর যাবতীয় বস্তুই উচ্ছিষ্ট

হয় বলিয়া, শ্রাদ্ধবাড়ীতে ভোজন নিষেধ। প্রেতের কল্যাণার্থে ব্রাহ্মণাদি ভোজন যে সময়ান্তরে হয়, তাহাতে প্রেতের আহ্বান নাই, উচ্ছিষ্ট সম্ভাবনাও নাই।

ঠাকুর এই প্রকারের আরও অনেক কথা বলিলেন।

অপঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার উৎপীড়ন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত কোনও ভদ্রপল্লীর কায়স্থবংশোদ্ভব একটি বালক কিছুকাল হয় ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণের পরই ইহার ভজননিষ্ঠা, ঠাকুরের প্রতি স্বাভাবিক টান এবং সরলতা দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়াছি। এক দিন ঠাকুরের নিকট আসিয়া সে বলিল—“গোসাই, সত্যই তুমি আমাদের উদ্ধার করবে ত?”

ঠাকুর বলিলেন—“তোমাদের উদ্ধার না হ’লে আমার ত নিষ্কৃতি নাই। দেখ না, রাখাল সমস্ত গরু নদীর পাড়ে একত্রিত ক’রে, একটি একটি ক’রে সকলগুলিকে পার ক’রে দেয়; পরে শেষ যেটি থাকে, তার লেজ ধ’রে নিজে পার হয়। আমিও তোমরা সকলে পার হ’লে, শেষটিকে ধ’রে নিজে পার হব।”

কিন্তেছি কিছুদিন যাবৎ নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য ও অস্বাভাবিক ব্যবহার আমাদের এই গুরুভাইটির দ্বারা অমুদ্রিত হইতেছে। মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে বলিয়া, অতিভাবকেরা তাহাকে নাকি দোতারা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন। সে তথা হইতেই রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়া, বিন্দুমাত্র আঘাত না পাইয়া, অন্যাস্থ্যে একদিকে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। আবার কখনও বা কোঠা ঘরে বন্ধ করিয়া বাহিরে শিকল দিয়া আসিবার পর দেখা গিয়াছে, সে রাস্তায় আসিয়া বেড়াইতেছে, শিকল খোলা রহিয়াছে। সাধনপ্রভাবে সে অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই এতদিন আমাদের সংস্কার ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি অল্প প্রকার। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া এখন সে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। উপস্থিত তার অসীম দুঃসাহস, অনাচার ও অত্যাচার দেখিয়া সকলেই অস্থির। কয়েকদিন যাবৎ তার মাছুষ খুন করিবার ঝোঁক চাপিয়াছে। আশ্রমে এখন কাহারও স্থির হইয়া চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্তভাবে বলিবার উপায় নাই; সকলেই তার ভয়ে সশঙ্ক। ঠাকুরের নিকটে সে কখনও যায় না। দূর হইতে সে ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে কখনও বা ভয়ে কাঁপিতে থাকে, কখনও স্তব স্তুতি করে, আবার কখনও, নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষায় ঠাকুরকে গালাগালি করিয়া, ইষ্টকাদি ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিবারও চেষ্টা করে। নিয়তই উহাকে চোখে চোখে রাখতে হয়, এ এক বিষম উৎপাত। মির্জান পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“অকস্মাৎ এ ছেলেটির এই দশা ঘটল কেন? কিছুকাল পূর্বে ত এ ভালমানুষ ছিল?”

ঠাকুর বলিলেন—“একটি প্রেত ওকে আশ্রয় করেছে। এখন ওর সমস্ত কার্বাই ঐ প্রেতদ্বারা হ’চ্ছে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘প্রেত উহাকে ধবুল কেন?’

ঠাকুর বলিলেন—“ওর পূর্বপুরুষ কোনও ব্যক্তি, একটি ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে বিস্তর টাকা ছিল। টাকার লোভ সংবরণ কর্তে না পেরে, তিনি নির্জল পথে সেই ভদ্রলোকটিকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বধ করেন। অপঘাতে মৃত্যু ঘটতে সেই প্রেতের বিষম আক্রোশ জন্মে। ইনি যতকাল জীবিত ছিলেন, এই প্রেতদ্বারা নানা প্রকার অত্যাচার ভোগ করেছেন। দেহত্যাগের পরেও, বংশধর দ্বারা উহার কোন প্রকার সদগতি লাভ না হয় এই অভিপ্রায়ে, সে ওর বংশলোপ করবার চেষ্টায় আছে। এই ছেলেটির দ্বারা তার পূর্বপুরুষের সদগতি লাভ হবে জেনেই, একে আশ্রয় ক’রে, নানা প্রকারে বিপন্ন করবার চেষ্টায় আছে। তোমরা এর সঙ্গে ব্যবহারে সর্বদা সাবধানে থেকো।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘সময়ে সময়ে এমন বিষম কাণ্ড কর্তে চেষ্টা করে যে, তাহা দেখিয়া সহ্য করা যায় না, কখন কাকে খুন করে সর্বদা এই ভয় হয়। সহ্য কর্তে না পারলে কি করব?’

ঠাকুর বলিলেন—“মনে মনে প্রেতকে লক্ষ্য ক’রে, খুব তেজের সঙ্গে নাম কর্তে কর্তে ওকে কিল চাপড় মেরো, তাতে প্রেতকেই মারা হবে; ছেলেকে স্পর্শ করবে না। এরূপ করলে প্রেত ছুটেও যেতে পারে।”

ইহার পর আমরা ছেলেটির অত্যাচার দেখিলেই, কিল চাপড় মারিতে লাগিলাম। ২১৪ দিনের প্রহারের চোটেই ছেলেটির ঘাড়ের ভূত ছুটিয়া গেল এবং সে প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু জানি না কেন, সে বেশী দিন আশ্রমে টিকিতে পারিল না; দিন দুই হয়, কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

অর্থ হইতে কতপ্রকার অনর্থ ঘটে, তাহা বুঝাইতে ঠাকুর বলিলেন—“টাকার জন্যই ত অপঘাত মৃত্যু এবং পরলোকে প্রেতত্ব লাভ হ’লো। আর এক জন, টাকার লোভেই নরহত্যা ক’রে পরলোকে অসদগতি লাভ ও বংশধরদের পর্যাণ্ড বিপন্ন করলে। টাকা বিষম কালকূট, কখনও পুষে রাখতে নাই। টাকা উপার্জন ক’রে, প্রয়োজনমত খরচ কর্তে হয়। অবশিষ্ট যা কিছু থাকবে, ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে ক’রে যার অভাব অকাতরে তাকেই দিতে হয়। বিপদে প’ড়ে কেউ কিছু চাইলে, অমনই দিয়ে দিতে হয়, কোনও দ্বিধা কর্তে নাই। ধর্ম যাঁরা চান, তাঁদের এভাবেই চলতে হয়; দিন কোনও প্রকারে কেটে গেলেই হ’লো।”

প্রেতাত্মার মুক্তির উপায় ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতিতে যাহাদের পরলোকে অসদগতি ঘটে, যৎশব্দধরদের কিরূপ কার্য দ্বারা তাহাদের সদগতি লাভ হয় ?

ঠাকুর বলিলেন—“শাস্ত্রে আছে গয়াতে যথামত পিণ্ডদান করিলেই তাদের সদগতি হ'য়ে থাকে ।”

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—গয়াতে পিণ্ড দিলে সত্যি কি প্রেত তাহা গ্রহণ করে ?

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, ব্যবস্থামত দিলে পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করে । আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলাম, তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাকতাম । ঐ সময়ে একবার একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল । আমার একটি ব্রাহ্মবন্ধু, বিলাতফেরত ডাক্তার সেই সময়ে গয়ায় গিয়েছিলেন । তাঁর পরলোকগত পিতা, তাঁকে একদিন স্বপ্নে বল্লেন—‘বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, আমাকে একটি পিণ্ড দাও ; আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি ।’ তিনি ব্রাহ্ম, ওসব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন । পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখ্লেন, পিতা অত্যন্ত কাতরভাবে বল্লেন,—‘বাবা, তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে একটি পিণ্ড দিয়ে যাও ।’ ছু'বার স্বপ্ন দেখেও তিনি তা গ্রাহ্য কর্লেন না । আমাকে এ বিষয়ে এসে বল্লেন । আমি তাঁকে বললাম—‘পুনঃ পুনঃ যখন একরূপ দেখ্লেন তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত ।’ তিনি আমার উপর বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, ‘আপনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হ'য়ে, একরূপ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন ?’ আমি তাঁকে বললাম, ‘আপনি ত আর আপনার বিশ্বাসমত দিবেন না, আপনার পিতার বিশ্বাসমত দিবেন, তাতে বাধা কি ?’ তিনি তাতেও সম্মত হলেন না । পরে আর একদিন শুয়ে আছেন, সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছে, দেখ্লেন, পিতা জোড় হাত ক'রে বল্লেন—‘বাপু আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না ?’ বন্ধুটি তখন আমাকে এসে বল্লেন, ‘মশায়, আজ আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি করযোড়ে কাতর হ'য়ে বল্লেন—বাপু, আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না ? আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি ।’ শুনে আমার কান্না এল । আমি তখন বললাম, ‘আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধি দ্বারাও ত দেওয়াইতে পারেন ।’ তিনি চুপ ক'রে রইলেন । আমি ছুটি টাকা নিয়ে, একটি পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হ'য়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা ক'রে দিলাম । এই পিণ্ডদানের দিন বন্ধুটিকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে উপস্থিত হ'লাম । প্রতিনিধি পাণ্ডা যখন পিণ্ডদান কর্লেন,

তখন দেখলাম বন্ধুটির চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়ছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়লেন; পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ‘মশায়, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন আমি পরিষ্কার দেখলাম আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত দুই হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ করলেন, এবং হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ ক’রে বললেন—‘বাপু, আমার যথার্থ উপকার করলে, তুমি স্মৃতে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।’ আহা আগে যদি আমি জানতাম পিতা এভাবে এসে পিণ্ড গ্রহণ করবেন, তা হ’লে আমি নিজেই খুব যত্ন ক’রে পিণ্ড দিতাম।’ এ সকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায়?”

ধর্মরূপে অধর্ম।

আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘সকল ধর্মশাস্ত্রেই ত দয়া, সরলতা প্রভৃতিকে ধর্ম বলিয়াছেন; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, দয়া ক’রে লোকের ক্ষতি করা হয়, আবার সরল হ’য়ে এবং বিশ্বাস ক’রেও অহুতাপ ভোগ করতে হয়। সুতরাং যথার্থ ধর্ম ও অধর্ম কিসে বুঝব?’

ঠাকুর বলিলেন—“অধর্ম, অধর্ম-রূপে মানুষের নিকট উপস্থিত হ’লে, লোকে তা সহজেই বুঝতে পারে এবং তাহার আক্রমণ হ’তে রক্ষা পাওয়ারও একটা চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু অধর্ম, ধর্মের আকারে এসে পড়লে, তা বুঝে নেওয়া বড়ই শক্ত। সিদ্ধ পুরুষেরাও সে স্থলে ঠ’কে যান, স্বয়ং ভক্তরাজ মহাবীরেরও মতিভ্রম ঘটেছিল, মানুষের আর কথা কি!”

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তরাজ মহাবীরের কথা বলিতে লাগিলেন—“নিজের ইষ্টদেবতা রাম-লক্ষ্মণকে পাপরূপী মহীরাবণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত, নিজ লেজের কুণ্ডলী দ্বারা গড় প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে রামলক্ষ্মণকে রাখিলেন এবং দরজায় খুব সতর্ক হইয়া রহিলেন, যেন কোন ছলে মায়ারূপী পাপ মহীরাবণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামলক্ষ্মণকে অপহরণ না করে। মহীরাবণ কখন কৌশল্যার, কখনও দশরথের, কখনও বা জনকের, কখনও বা ভরতের আকারে আসিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন কিন্তু ভক্তরাজ সকলকেই করযোড়ে বলিলেন, ‘একটুকু অপেক্ষা করুন, বিভীষণ এখনি আসিবেন, তিনি বলিলেই দরজা ছাড়িয়া দিব।’ মহীরাবণ যখন কোনও প্রকারে হুমানকে ভুলাইতে পারিলেন না, তখন বিভীষণেরই রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—‘মহাবীর, শীঘ্র দরজা ছাড়িয়া দাও, আমি একবার রামলক্ষ্মণকে দেখে

আসি ।’ হনুমানের একবার সংশয় হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে আর মনোযোগ দিবার অবসর পাইলেন না । বিভীষণরূপী মহীরাবণ অমনই বলিলেন, ‘মহামায়াবী মহীরাবণ নিয়ত ঘুরিতেছে, জানি না কখন কোন্ ছলে ভিতরে প্রবেশ করে । তুমি খুব সাবধানে থাক, আমি একবার রামলক্ষ্মণের শিরে রক্ষা বেঁধে আসি ।’ তখন হনুমান দ্বার ছাড়িয়া দিলেন । মহীরাবণও অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত রামলক্ষ্মণকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন ।”

এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—“অধর্ম, যে কোনও রূপে ভক্তের নিকট আসুক না কেন, ধর্মের দিকে দৃষ্টি স্থির থাকলে কিছুতেই তাকে বিচলিত করতে পারে না । কিন্তু ধর্মের আকারে অধর্ম এসে উপস্থিত হ’লে, মহা-সিদ্ধপুরুষকেও মুগ্ধ ক’রে ফেলে । গয়ার আকাশগঙ্গার বাবাজী, দয়া করতে গিয়ে, কি বিষম ছদ্মশাগ্রস্তই না হ’লেন !”

রঘুবর বাবাজীর ঐশ্বর্য্যের কথা ।

আকাশগঙ্গার বাবাজীর কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন “গয়ায় বাবাজীর অদ্ভুত শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখেছি ! রাত্রে বড় বড় বাঘ এসে বাবাজীর পায়ের কাছে মাথা হেঁট ক’রে প’ড়ে থাকতো ; বাবাজী আটার টিকুর প্রস্তুত ক’রে রাখতেন, রাত্রিতে বাঘ এলে হাতে ক’রে তিনি তাই বাঘকে খাওয়াতেন । গোখরো সাপগুলো বাবাজীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো । বাবাজী নিশ্চল হ’য়ে নাম জপে মগ্ন থাকতেন । আকাশের দিকে তাকায় কখনও পাখীদের বলতেন, “আরে তু ভি রামজীকা জীব হো, মৈ’ ভি উনহিকা দাস ; ইহা আয়কে মেরা কাণ সাফা কর্ দে ।” বাবাজী এই কথা বলবামাত্র পাখীরা উড়ে এসে বাবাজীর ঘাড়ে পড়তো এবং কাণ খুঁচে দিয়ে যেতো । এক এক সময়ে তুই তিন শত লোক বাবাজীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হ’লেও, বাবাজী আসন হ’তে না উঠে তাঁদের জুচি মণ্ডা প্রভৃতি দিয়ে ভোজন করাতেন । পাহাড়ে জলাভাবে অনেক সময়ে বিষম ক্রেশ হ’ত । বাবাজী মহাবীরের কাছে তিন দিন ধন্না দিয়ে প’ড়ে রইলেন ; পরে মহাবীরের কৃপা হ’ল ; পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখায়ে মহাবীর বল্লেন—“একখানা লাঠি দিয়ে এই পাথরের উপর সামান্য আঘাত কর পাথরের নীচ হ’তে ঝরণা বেড়িয়ে পড়বে ।” বাবাজী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে একখানা লাঠি নিয়ে যেমনই ঐ প্রস্তরের

উপর আঘাত করলেন, অমনি প্রকাণ্ড একটা পাথরের চটান, লক্ষ মণেরও অধিক, ফ্রম ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেল। আর সেই স্থান হ'তে কল্কল্ রবে জল ছুটল। বাবাজী ঐ ঝরণার নাম যমুনা রেখেছিলেন। এখনও সেই ঝরণা সেই রকমই আছে। কখনও ওখানে জলাভাব হয় না।”

দয়াতে পতন।

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, শুনিতে পাই বাবাজী নাকি খুব ভক্ত ও ছিলেন, সকলেরই প্রতি নাকি তাঁর খুব দয়া ছিল ?

ঠাকুর বলিলেন—দয়া তাঁর অসাধারণ ছিল ; কিন্তু এই দয়াই তাঁর পতনের কারণ হ'ল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—দয়া করিলে আবার পতন হয় নাকি ?

ঠাকুর বলিলেন—তা আর হয় না ?

এই বলিয়া ঠাকুর আকাশগঙ্গার রঘুবর বাবাজীর সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—বাবাজীর একটি গুরুভাই ছিলেন, তিনি কস্তুর অপর পারে রামগয়া পাহাড়ের নীচে একটি গ্রামে বাস করিতেন। তাঁর স্ত্রী এবং দুইটি নাবালক ছেলে ছিল। গুরুভাই পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত হইলে, বাবাজী প্রত্যহ যাইয়া তাঁহার সেবা করিতেন। মৃত্যুসময়ে তিনি নাবালক দু'টি সম্ভান এবং স্ত্রীকে বাবাজীর হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। বাবাজী প্রত্যহ দু'বেলা নিজে রান্না করিয়া, তাহাদের জন্য দুই ক্রোশ পথ খাবার বহিয়া লইয়া যাইতেন ; কিছু দিন এইরূপ সেবা করিয়া বৃদ্ধ বাবাজী হয়রান হইয়া পড়িলেন। তখন ভাবিলেন, অসহায়া বিধবা স্ত্রীলোক ও নাবালক ছেলে দু'টিকে নিকটেই আনিয়া রাখি নাকেন ? ইহাতে আমার ভজনের প্রচুর সময় পাইব, যাতায়াতেও হয়রান হইতে হইবে না ; স্ত্রীলোকটিকে সর্বদা নজরে রাখিতে পারিব এবং ছেলে দু'টিও মানুষ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া বাবাজী ছেলে দুইটির সহিত স্ত্রীলোকটিকে আশ্রমে আনিলেন। পাহাড়ে আসিয়াই একটি ছেলের মৃত্যু হইল। অপর ছেলেটির প্রতি বাবাজীর ক্রমেই মায়া বৃদ্ধি হইল। বাবাজী ছেলেটির ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিলেন। বাবাজীর নিকট অনেক সময় বড় বড় লোক যাইতেন, শত শত টাকা প্রণামী পড়িত ; বাবাজী একটি কপর্দক প্যাস্ত না রাখিয়া, সমস্তই দীনহুয়ীদের দান করিয়া ও ভাণ্ডারা দিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু যে সময়ে স্ত্রীলোকটি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় হইতে দান ও ভাণ্ডার কমিয়া গেল। লোকে অহুমান করিতে লাগিল, ঐ স্ত্রীলোকটির ও ছেলেটির মায়ায় পড়িয়া, বাবাজী অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করিয়াছেন। বাবাজীর একটি প্রিয় শিষ্য পুনঃপুনঃ বাবাজীকে বলিলেন, “মহারাজজী, লেড়কা আউর আউরত কো পাহাড়মে নেহি রাখ্‌না। আপ্‌কা বিপদ হোগা, সহরমে রাখ্‌ দিজিয়ে।” বাবাজী প্রথম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “আমার গুরুভাই মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আমার নিকট যে প্রার্থনা

করিয়াজিলেন, আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; সুতরাং যতটা নিরাপদে ইহাদিগকে রাখিতে পারি রাখিব। ইহারা আমার আশ্রিত, ইহাদিগকে নিয়ত সঙ্গে রাখিয়া বিপন্ন হইলেও, আমি ইহাদের কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ইহারা বড়ই দুঃখী।” ঐ শিষ্টি বাবাজীকে আর এক দিন বলেন, “মহারাজ, পাহাড়ে স্ত্রীলোক থাকিলে আপনার বিষম দুর্নাম হইবে। আর উহাদের জন্ত টাকা পয়সা সংগ্রহ করিতেছেন, সাধারণের এইরূপ একটা সংস্কারও জন্মিবে। এই নির্জন পাহাড়ে গুণ্ডাদেরও উৎপাত হইবে।” বাবাজী তখন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ‘কোন শালা হামারা ক্যা করুনে সেক্তা হায়? আনে দেও।’ শিষ্টিও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শুনিতে পাই, ২৪ দিন পরে ঐ শিষ্টিই গুণ্ডাদের লোভ দেখাইয়া বাবাজীর আশ্রম লুট করিতে যুক্তি দেন। এক দিন গভীর রাত্রিতে সতর জন গুণ্ডা বাবাজীর আশ্রমে মারু মারু রবে আসিয়া পড়িল। বাবাজী একখানা লাঠি হাতে লইয়া বাহির হইলেন; একাকী সতর জন গুণ্ডাকে পিটাইয়া ভাগাইলেন। দ্বিতীয় বারে গুণ্ডারা বাবাজীকে আবার যখন আক্রমণ করিল, বাবাজী পূর্বের মত এবারও হাতের লাঠিখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। ঈর্ষা লাঠিখানি একখানা পাথরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, অমনই গুণ্ডারা বাবাজীকে ধরিয়া ফেলিল, তৎপরে লাঠির উপর লাঠি মারিয়া বাবাজীকে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিল। বাবাজী সংজ্ঞাশূন্য হইলেও গুণ্ডারা নিরস্ত হইল না, পাথরের দ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাবাজীর মাথার, পাজরার ও হাতের হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। অতঃপর পায়ে গামছা বাঁধিয়া ৪।৫ জনে টানিয়া ছেঁচড়িয়া পাহাড়ের উপর তুলিল, এবং একটা স্থানে বাবাজীকে ফেলিয়া বড় একখণ্ড প্রস্তর বাবাজীর বুকের উপর চাপাইয়া চলিয়া গেল। নিত্য প্রভাতে যাহারা পাহাড়ে যাইতেন, ঐ দিন ভোর হইতেই তাহারা যাইয়া দেখিলেন আশ্রম শূন্য, বাবাজী নাই। যেখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। বাবাজী কোথায় আছেন অনুসন্ধান করিতে করিতে, পাহাড়ের উপরে সকলে যাইয়া দেখিলেন, বাবাজী প্রকাণ্ড একখানা পাথর চাপায় পড়িয়া আছেন, রক্তে সমস্ত স্থানটি ভাসিয়া গিয়াছে। তখন বহুলোক একত্র হইয়া, অনেক চেষ্টায় পাথরখানা সরাইয়া ফেলিল, বাবাজীর দেহটি আশ্রমে আনিয়া মহাবীরের নিকট ফেলিয়া রাখিল, এবং পুলিশে খবর দিল; পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজীর সর্বঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং শ্বাস রুদ্ধ দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ বাবাজী গা নাড়া দিয়া মহাবীরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, “জয় মহাবীরজী, তেরা জয়, ধন্য তেরা দয়া! হাম্ য়ায়্‌না করু কিয়া ত্যায় সাই দণ্ড্ দিয়া। তু বড়া দয়াল, তু বড়া দয়াল!” পুলিশ সাহেব বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যাহারা আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও আপনি চিনেন?” বাবাজী বলিলেন, আমি সকলকেই চিনি; কিন্তু তাদের একজনেরও নাম বলিব না। তাহারা ভগবানের দিক হইতেই গুরুতর দণ্ড পাইবে, আপনারা আবার তাহাদের শাস্তি দিবেন কেন? পুলিশ সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাবাজী কিছুতেই তাহাদের নাম বলিলেন

না। এই ঘটনার পর বাবাজীর জ্বর হয়, তিনি পাহাড় ত্যাগ করিলেন ; এখন আর রাত্রিতে তিনি পাহাড়ে থাকেন না, “চান-চউরাতে” থাকেন।

এইরূপ বলিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—“আকাশগঙ্গার বাবাজীর বর্তমান অবস্থা দেখলে, তাঁর অতীত অবস্থা স্বপ্ন ব’লে মনে হয়। আকাশের নক্ষত্র যেমন ছুটে পড়ে, একটু অহঙ্কার জন্মালেই মহা মহা যোগীদেরও সেই প্রকার পতন হয়। অহঙ্কারের হাত হ’তে রক্ষা পাবার উপায়, সর্ববজীবে সেবা। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লতারও সেবা করতে হয়। গুয়ের পোকাকেও ঘৃণা করতে নাই। সকলকেই নিজ হ’তে বড় মনে করতে হয়। প্রাণের সহিত সকলের পায়ে মাথা নোয়ায়ে রাখলেই রক্ষা। মাথা তুললে আর নিস্তার নাই। পরমহংসজী যখন আমাকে কৃপা করলেন, বাবাজীকে আমি সমস্ত বললাম, বাবাজীর শুনে অভিমান হ’ল, তিনি বললেন, “আরে এক জঙ্গলমে দো সের নেহি রহনে সেক্তা ছায়, ইঁহা আউর কোই নেহি ছায় ; তোমারা যো কুচ্ ছয়া, হাম্‌ই কিয়া। দেখো হিঁয়া যমুনা হাম্‌ই লে আয়া, দোসরা কোই নেহি।” আমার তখনই মনে হ’ল, বাবাজীর এরূপ অভিমানেই অচিরে সর্বনাশ ঘটবে। এমন শক্তিশালী পুরুষকেও পতিত হ’তে হ’ল ! পরে তাঁর কি দুর্দশা না ঘটল ! এখন তিনি মুষ্টিভিক্ষার জগু ঘারে ঘারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবাজী কি আর পূর্বাবস্থা লাভ করতে পারবেন না ?

ঠাকুর বলিলেন—“তিনি খুব কঠোর সাধক, স্থির হ’য়ে বসলে, অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত শুধরে নেবেন, পূর্বাবস্থা লাভ করবেন।”

রঘুবর বাবাজীর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক হইলাম, এত বড় মহাত্মারও এরূপ দুর্দশা ঘটে ! জিজ্ঞাসা করিলাম—কামিনী কাঞ্চনে আকর্ষণ কত দিন থাকে ?

ঠাকুর বলিলেন—“যত দিন মন থাকে, তত দিন স্ত্রী-পুরুষে এবং বিষয়-বিষয়ীর আকর্ষণ থাকে। মন লয় হ’লেও কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হ’য়ে থাকে বটে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকার।”

অভিমান কিসে হয় ?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—রঘুবর বাবাজী ত খুব বিনীত সাধু ছিলেন, তাঁর আবার অভিমান কিসে হইল ?

ঠাকুর বলিলেন—“অভিমান ত আর এক প্রকার নয় ? অভিমানও নানা রকমের আছে। অনেক টাকা থাকলে অভিমান হয়, অনেক বিদ্যাতে অভিমান হয়। এরূপ যে অভিমান,

তা সহজেই নষ্ট করা যায়। কিন্তু আর এক রকমের অভিমান আছে, ঠিক এর বিপরীত। তার হাত এড়ান বড়ই কঠিন। নির্ধন ব্যক্তি মনে করে, ধনী তাকে ঘৃণা করেন; সুতরাং ধনীর উপরে তার অভিমান হয়। মূর্থ মনে করে বিদ্বান্ তাকে অগ্রাহ্য করেন, এ ভাবে বিদ্বানের উপরও মূর্থের অভিমান হয়। পাপী সংসারাসক্ত ব্যক্তিও ধার্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর উপর অভিমান করে। এইপ্রকারের অভিমান সত্য যুগ হ'তে চ'লে আসছে। রাজর্ষি জনকের নিকট, অনেক ঋষি তপস্বীও যেয়ে, এই প্রকার অভিমান প্রকাশ করতেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সদগুরুর নিকট যারা সাধন লাভ করেন, তাঁদেরও কি ভগবান্ দয়া করবেন না?

ঠাকুর বলিলেন—“তাঁরা উপযুক্ত সাধন লাভ করেছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দীন হীন কাঙ্গাল ব'লে নিজেকে না বুঝা পর্য্যন্ত কিছুই ত হবে না! কাঙ্গালকেই দীননাথ দয়া ক'রে থাকেন। অভিমানী ব্যক্তি দয়ার পাত্র নয়।”

একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাপুরুষেরা দয়া ক'রে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের সমস্ত কুস্বভাব দূর ক'রে ভাল ক'রে নিতে পারেন নাকি?

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তা পারেন; কিন্তু যিনি প্রণালী মত না ক'রে ঐ প্রকার দয়া করেন, তাঁকে ভুগ'তে হয়, পতিত হ'তে হয়। যেমন গয়ার বাবাজী পরের উপকার করতে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সে আপনি পতিত হন। তাঁর সেই অসাধারণ প্রভাব একেবারেই নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখন দেখ, তিনি ঢাকায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ সকলের কি দরকার ছিল? সুখ ছুঃখ ভোগ মাত্র। ভগবান্‌ই ত সব করেন; আমার কি ক্ষমতা? আমি আর কি করতে পারি? কার কোন্ অবস্থায় প'ড়ে পতন হয়, তা বলা যায় না। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুরই বিশ্বাস নাই। কারও হয় ত মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা বাসনা জন্মে, তাই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও কিছুই বিশ্বাস নাই।”

কার্তিক ।

ঔষধে বাবাজীর আপত্তি ।

আশ্বিন মাস শেষ হইতেই মাতাঠাকুরাণীকে দেখিতে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল ।

আমি ঠাকুরের অমুমতি লইয়া বাড়ী গেলাম । গহনার (খেয়ার) নৌকায় কার্তিক ১লা—১৩ই পর্য্যন্ত । ৪।৫ ঘণ্টা থাকিয়া সেরাজদিঘা পহুঁছিতে হয় । গহনার নৌকায় সাতটার

সময়ে চাপিয়া বেলা প্রায় বারটা পর্য্যন্ত থাকিতে হয় । অর্ধেক পথ আসিয়া আমার তয়ানক শিরঃপীড়া হইল, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম । গহনায় প্রায় পঁচিশ জন লোক ছিল, সকলেই আমার অবস্থা দেখিয়া তুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । এক জন কবিরাজ আমাকে একটি ঔষধের বড়ি দিয়া বলিলেন, “এক গণ্ডু ঘ্র জল সহিতে ইহা খাইয়া ফেলুন, বেদনা সারিয়া যাইবে ।” ঐ সময়ে একজন বৈষ্ণব বাবাজী গলুইয়ের উপর বসিয়া হরিণামের বুলি লইয়া জপ করিতেছিলেন, সকলে তাঁহাকে উপহাস করিতেছিল । আমি যেমনই ঐ ঔষধের বড়িটি কবিরাজের নিকট হইতে খাইবার জন্ত হাতে লইলাম, অমনই সেই বৈষ্ণব বাবাজী কটমট করিয়া একবার কবিরাজের দিকে চাহিয়াই, আমার বেশভূষা দেখিয়া আমাকেও নিজেরই দলের লোক ঠাওরাইয়া, নৌকার গলুই হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং দুই তিন লাফে আমার নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “আজ্ঞা গোঁসাই, আপ্নে ক্যান্ ঔষধ খাবেন, ঐ বড়ি ফিক্যা ফালাইয়া ছান্ ধলেশ্বরীর জলে ; একবার কিষ্ট কন, একবার কিষ্ট কন ।” বাবাজীর রকম দেখিয়া আমি আর ঔষধ খাইতে সাহস পাইলাম না ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বাবাজীর ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ আমার বেদনার শাস্তি হইল, নৌকার সকলেই তখন অবাক হইয়া গেলেন ।

আমাদের পাড়ার সন্মুখে ঠাকুরের নানা কথা ।

বাড়ীতে সাত আট দিন থাকিয়া আবার গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম । যখনই আমি বাড়ী হইতে আসি, ঠাকুর আমাকে দেশের খবর জিজ্ঞাসা করেন । এবার ঠাকুর বলিলেন— “তোমাদের গ্রাম হইতে জৈনসার যাবার পথে একটি বহুকালের প্রাচীন প্রকাণ্ড বট অশ্বখের জোড়া গাছ ছিল, সেই গাছটি এখন কি অবস্থায় আছে ?”

আমি বলিলাম—‘ঐ গাছের তলা দিয়াই চিরকাল সাধারণের যাতায়াতের পথ, ওখানে পহুঁছিলেই শরীর ঘেন শীতল হইয়া যায় । গাছতলায় একটু না বসিয়া পারা যায় না । গাছটি ছোট সময়ে যে প্রকার বড় ও রাপড়া দেখিয়াছি এখন আর সে প্রকার নাই, আপ্না আপ্নিই একটি একটি করিয়া বড় ভালগুলি শুকাইয়া যাইতেছে । শুনিয়াছি নিকটবর্তী কোন কোন লোক ঐ গাছের তু’একখানা ডালা কাটিতে গিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া অকস্মাৎ মারা পড়িয়াছে । গাছে যে কি আছে জানি না ।’

ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—“আহা ! তোমাদের অঞ্চলের ঐ প্রাচীন বৃক্ষটি ধর্মের নিশান স্বরূপ। ঐ বৃক্ষের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, প্রাচীন ধর্মভাবও তোমাদের দেশে লয় পাবে।”

আমি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমাদের ওদিকে লোকের ধর্মভাব এখন কেমন?”

আমি বলিলাম—কোজাগর পূর্ণিমার দিনে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বড়ই আনন্দ। এই পূর্ণিমাতে মেয়েরা ঢালের মত বড় লক্ষ্মীর সরা খরিদ করিয়া আনাইয়া পূজা করেন। খুব বড় লোক হইতে নিতান্ত গরীব পর্যন্ত ঘাঁহারা এক সন্ধ্যা আধপেটা খেয়ে জীবন ধারণ করেন তাঁহারাও এই লক্ষ্মীপূজা করেন, এবং প্রতি গৃহস্থের ঘরেই যথাসাধ্য এই লক্ষ্মীপূজার আড়ম্বর হইয়া থাকে। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরাই প্রত্যেকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত রাত্রিতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই প্রসাদ ভোজন শেষ করিতে রাত্রি ভোর হইয়া যায়। সারাদিন মেয়েরা অনেকেই নিরশু উপবাস করিয়া থাকেন। এবার দেখাদেখি আমরাও উপবাস করিয়াছিলাম, বড়ই ভাল লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন—“পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ব্রতাদি করে না?”

আমি বলিলাম—আমাদের দেশে প্রায় সকল পাড়াগাঁয়েই এই কার্তিক মাসে চার পাঁচ বৎসরের কচি কচি মেয়েগুলি, ভোর বেলা উঠিয়া যমপুকুরের ব্রত করে। বাড়ীতে কোন ঘরের কোণে বা উঠানে, এক ফুট আন্দাজ স্থানে চতুর্কোণ গর্ত করিয়া পুকুর কাটে; ঐ পুকুরের পাড়ে ছোট ছোট কলা গাছ, কচু গাছ এবং ধান গাছ পুতিয়া রাখে; ঐ গর্তের চারিদিকে কাক, চিল, বাজ, কচ্ছপ, কুমীর, ঘম এবং ঘমুনা প্রভৃতি ছোট ছোট মৃত্তিকার পুতুল স্থাপন করিয়া জল নাড়িতে নাড়িতে ব্রতমন্ত্র পড়িতে থাকে এবং ঐ গর্ত হইতে গভুঘে গভুঘে জল লইয়া মেয়েরা তাহাদের ভাবী শত্রুর শাশুড়ীর পরলোকে জল প্রাপ্তির জন্ত প্রার্থনা করিয়া ঐ সমস্ত পুতুলের মুখে জল ঢালিয়া দেয়। ছোট ছোট মেয়েরা এই প্রকার কোন না কোন ব্রত বৎসরের অধিকাংশ সময়ই করিয়া থাকে।

ঠাকুর বলিলেন—“পূজা, ব্রত, উপবাস এ সকল যত করা যায় ততই ভাল। খেলার ছলে এ সকল ব্রত নিয়মাদিতে, শিশুকাল থেকে ছোট ছোট মেয়েদের অভ্যস্ত করান এদেশের প্রথা ছিল। এ সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে যে কত কল্যাণকর, তাহা এখন আর কেহ বুঝে না। দেখতে দেখতে বোধ হয় এ সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে। মেয়েদের হইতেই দেশে ধর্মরক্ষা হয়। শিশুকাল থেকে এসব করলে বড়ই কল্যাণ হয়।

গুরুর অপমান, ফল হাতে হাতে ।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমাদের দেশে সাধারণ লোকদের ভিতরে হরি সঙ্কীৰ্ত্তন ও মহাপ্রভুর মহোৎসবাদি পূর্বে প্রায় সকল গ্রামেই হইত, এখনও সেই প্রকার হয় ত ?”

ঠাকুরের প্রশ্ন শুনিয়া আমি আমার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিতে লাগিলাম—“আমাদের পাড়ার সংলগ্ন সূজানগরে দত্ত পরিবারের একজন ধনী বৈষ্ণব কিছুদিন হয়, একটি বৃহৎ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন ; তাহাতে গ্রামের সমস্ত লোকেই খুব উৎসাহের সহিত যোগদান করিল । ধেনো জমির প্রায় ৫০।৬০ বিঘা লইয়া এই মহোৎসবের স্থান প্রস্তুত হইল ; নির্দিষ্ট দিনে প্রায় শতাধিক উননে রাশি রাশি অন্ন ও লাফরা ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা হইল এবং সে সমস্ত অনাবৃত মাঠে চাটাই ও হোগলা বিছাইয়া তাহার উপর স্তুপীকৃত হইতে লাগিল । চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; মুদঙ্গ, খোল, করতাল লইয়া বৈষ্ণবেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন । গুরু পুরোহিত ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পূজা, ভোগ, আরতির কিঞ্চিৎ পূর্বে কর্তব্যকর্তা তাহার গুরুদেবের নিকট যাইয়া, কার্ধ্যারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । গুরুদেব গরীব ছিলেন, তিনি কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা চাহিলেন । কর্তব্যকর্তা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ‘আপনাকে যাহা দিতেছি, তাহাই লইয়া অনুমতি দেন ; না হ’লে যথা ইচ্ছা চলিয়া যান । আপনি অনুমতি না দিলেও আমার এই কার্ধ্য এখন আর অসম্পন্ন থাকিবে না ।’ শিষ্যমুখে এই প্রকার অবজ্ঞাসূচক কথা শুনিয়া, গুরু অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘাতনা পাইয়া অমনই উঠিয়া পড়িলেন, এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, ‘মহাপ্রভু জাগ্রত দেবতা, আমি তোমার গুরু, আমাকে যখন তুমি এভাবে অপমান করলে, তোমার এই কার্ধ্য কখনও তিনি সম্পন্ন হ’তে দিবেন না ।’ এদিকে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত । মহাপ্রভুর আসন সাজান হইতে লাগিল, এমন সময় হঠাৎ আকাশে কালমেঘ উঠিয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল । সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড় উঠিয়া মুহলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল । লোকসকল চতুর্দিকে উর্দ্ধ্বাশ্রমে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল ; রানীকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত উপকরণ সহিত অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গেল । প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে যে বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহা একেবারে পণ্ড হইয়া গেল । এ ঘটনা আমি বাড়ী থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি ।’

ঠাকুর বলিলেন—“গুরুর অপমান, এ যে গুরুতর অপরাধ ; তাই ফল হাতে হাতে । অপরাধের দণ্ড অপরাধ বুঝিয়া কোথাও তিন দিনে, কোথাও তিন মাসে, কোথাও বা তিন বৎসরের ভিতরে হয় । অনেক অপরাধের দণ্ড পরলোকে ভোগ করতে হয় ।”

নিজ পুত্রের জীবন লইয়া শিষ্যপুত্রের জীবন দান ।

গুরুর প্রাণে ক্রেশ দিলে যেমন অকস্মাৎ বিপদের উৎপত্তি হয়, গুরুকে প্রসন্ন করিলেও তেমন তাঁহার রূপায় মহাআপদ হইতে আশ্চর্য্য প্রকারে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের একটি যথার্থ ঘটনা, এবার মাঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলাম—

আমার বড় মামার উপর্য্যুপরি কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা পড়িতে লাগিল। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই সন্তান চীৎকার করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরের বর্ণ লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়, পরে শিশুটি মূর্ছিত হইয়া পড়ে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। বার বার এইরূপ হওয়াতে আমার মাতুল মহাশয় অতিশয় উদ্বিগ্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবার আমার মামীমাতার প্রেসব হওয়ার সময়ই দৈবক্রমে তাঁহার গুরুদেব ঐ গ্রামে অত্র শিষ্য-বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন ভাস্করিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; নরকপাল এবং স্বরা প্রভৃতি লইয়া অতি কঠোর সাধন করিতেন। পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই অত্যাশ্চর্য্য বারের মতই চিঁচিঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তাহার সর্ব শরীর নীল বর্ণ হইয়া গেল। আমার মাতুল এবারও পুত্রটি মারা যায় দেখিয়া, যার পর নাই মর্মান্বিত ও হতাশ হইলেন। পরে হঠাৎ তাঁহার গুরুদেবের কথা স্মরণ হওয়ায়, সেই অক্ষকার রাত্রিতে দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ দুটি জড়াইয়া ধরিয়া, যাহাতে এবারে তাঁহার বংশ রক্ষা হয়, সেই জন্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুদেব তখন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ‘একটি বিষপত্র লইয়া আইস।’ বিষপত্র আনা হইলে তিনি তাহাতে সিন্দুরের দ্বারা এক প্রকার যন্ত্র ও একটি মূর্তি আঁকিলেন, পরে সেই পত্রটি স্পর্শ করিয়া কিছুক্ষণ মস্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমার মাতুলকে বলিলেন যে, “তুমি যদি এক দৌড়ে এই বিষপত্রটি লইয়া গিয়া তোমার নবজাত পুত্রটির বক্ষঃস্থলে রাখিতে পার, তাহা হইলে ঐ মহান দীর্ঘায়ু হইবে; কিন্তু যদি রাস্তায় কোন স্থানে এই বিষপত্র লইয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে তোমার বিষম বিপদ ঘটবে। আর এককথা, এই পুত্রটির নাম ‘হরচরণ’ রাখিও।” আমার মাতুল সেই বিষপত্রটি লইয়া উৎকণ্ঠাসে এক দৌড়ে বাটী আসিলেন এবং উহা সেই শিশুর বক্ষঃস্থলে ধরিলেন। আশ্চর্য্য এই যে তৎক্ষণাৎ ছেলেটির সমস্ত উপসর্গ একেবারে শান্ত হইয়া গেল, এবং সে ক্রমে ক্রমে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। পরদিন আমার মাতুল তাঁহার গুরুদেবের নিকটে যাইয়া শিশুটির সুস্থতার সংবাদ জানাইলেন এবং কোতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পুত্রটির নাম ‘হরচরণ’ রাখিতে তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের নাম ‘হরচরণ’ এবং তাহারই আয়ু লইয়া তিনি ঐ শিশুটির দেহে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। তিন দিন পরে সংবাদ আসিল যে, সত্য সত্যই তাঁহার পুত্র ঐ সময়ে কলেরা রোগে মারা গিয়াছেন।

ঘটনাটি শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—“তান্ত্রিকদের ভিতরে ভাল ভাল সিদ্ধ মহাপুরুষ এখনও আছেন। তোমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট আর কি শুনিলে?”

আশ্চর্য্য জন্ম বিবরণ।

আমি বলিলাম—মহাপ্রভুর কৃপাতে আমার বড় দাদার (হরকান্ত বাবুর) যে ভাবে জন্ম হয়, সেই কথাও তিনি বলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—সে কি রকম বল না?”

আমি বলিলাম—গভের একাদশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ সন্তান প্রসব হইতেছে না দেখিয়া, আত্মীয় স্বজন সকলেই অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে এক দিন প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। তিন দিন বেদনায় মাতাঠাকুরাণী জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় দিন রাত্ৰিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কোনও জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“তুমি মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস কর, তবেই অচিরে তোমার সন্তান হইবে, নচেৎ কিছুতেই ইনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না।” ঠিক সেই সময়ে বাড়ীর অপর ঘরে, পিসী ঠাকুরাণীও ঠিক ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু’ বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন ঐ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রামের অপর প্রান্তের একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ (রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) হাঁপাইতে হাঁপাইতে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—“এই মাত্র স্বপ্ন দেখিলাম, মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস না করিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে না; তোমরা মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস কর।” তিন জনে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়াও ঠিক একই স্বপ্ন একই সময়ে দেখিলেন, ইহাতে সকলেই অবাক হইয়া গেলেন, এবং আত্মীয়গণ অগোণে ঐরূপ মানস করিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ইহার অল্পক্ষণ পরেই দাদার জন্ম হইল। কিন্তু দাদা শৈশবে নানাপ্রকার রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ইহাতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় এক দিন তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, “মানসগত মহোৎসব না করাতে, ছেলে এ সকল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।” আমরা শান্ত পরিবার হইলেও, এই ঘটনাতে মহাপ্রভুর মহোৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া দাদার অন্নপ্রাশন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

ঠাকুর বলিলেন—“শ্রীবৃন্দাবনে যাবার সময়ে আমরা সকলে কিছুদিন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম; তাঁর অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দ হ’ল। তিনি এ যুগের লোক নন, সত্য যুগের লোক; ওরকমটি প্রায় দেখা যায় না।”

এই বলিয়া ঠাকুর দাদার জীবনের আশ্চর্য্য কয়েকটি অবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন; ঠাকুর যখন ফয়জাবাদে ছিলেন, তখন সেখানে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, সে সকল বলিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনা আমার সেই সময়ের ডায়েরীতে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে বলিয়া এখানে আর লিখিলাম না।

অহিংসকে কেহ হিংসা করে না ।

মহাভারতপাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ পাহাড় পর্বতে নিরাপদে কি উপায়ে থাকা যায় ?’

ঠাকুর বলিলেন—“মহাভারতে পুনঃপুনঃ পড়েছ ত ! যাদের ভিতরে হিংসা নাই, তাদের কেহই হিংসা করে না ; হিংস্র জন্তু সকলেও তাদের গাছ পাথরের মতই মনে করে ।”

এই বলিয়া ঠাকুর একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন—“কিছুদিন পূর্বে এখানকার হাতীখেদার এণ্ডারসন্ সাহেব হাতীতে চড়িয়া জয়দেবপুরের জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন । নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সাহেব বিপদে পড়িলেন । হাতীটি বাঘের গন্ধ পাইয়া সাহেবকে হাওদা হইতে ফেলিয়া দিয়া পলাইল । সাহেব বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া দুই তিন বার বন্দুক ছুড়িলেন কিন্তু লক্ষ্য বার্থ হইল । প্রকাণ্ড বাঘটা সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । সাহেব প্রাণপণে জঙ্গলের নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন । বাঘ যেন শিকার হাতে পাইয়াছে বুঝিয়াই খেলা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । সাহেব কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর হয়বান অবস্থায় জঙ্গলের ঝোপে একটি উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই নিকট গিয়া পড়িলেন । সন্ন্যাসী সাহেবকে স্থির হইয়া বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন ?” সাহেব ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, “বাঘ যে আমাকে ধ’রে ফেলবে ।” তখন সন্ন্যাসী বাঘটিকে হাত নাড়িয়া অগ্রসর হইতে নিবারণ করিয়া বলিলেন, “বৈঠ্ বাচ্ছা, আউর নগিজ মত্ আও ।” বাঘ একটু বসিয়া থাকিয়া লেজ নাড়িয়া গৌ গৌ শব্দ করিতে লাগিল, পরে এক দিকে চলিয়া গেল । সন্ন্যাসী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বাঘের ভয়ে তুমি এত অস্থির হইলে কেন ?’ সাহেব বলিলেন, ‘আমি এই বাঘটিকে শিকার করিতে দুই তিন বার গুলি ছুড়িয়াছি, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়, অমনই বাঘ আমাকে আক্রমণ করিতে পেছন নেয় ।’ সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাঘকে তুমি গুলি ছুড়িলে কেন ? তুমি কি বাঘ খাও ?” সাহেব বলিলেন, “না, বাঘ আমরা খাই না, আমাদের জন্তু শিকার করি । আপনাদের ইচ্ছিতে বাঘ স্থির হইল, পরে চলিয়া গেল ; বনের বাঘকে কি উপায়ে আপনি বশ করিলেন, আমাকে দয়া করিয়া বলুন ।” সন্ন্যাসী বলিলেন, “কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই, শুধু ভালবেসে । পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, যন্তু সকলকেই একমাত্র ভালবাসায় দ্বারা বশ করা যায় । তোমার ভিতরে হিংসা আছে বলিয়াই, অশ্রুও তোমাকে হিংসা করে । হিংসান্ধ হইলে, সাপে বাঘেও কিছু করে না ।” সাহেব শুনিয়া অবাক হইলেন । ভিতরে তাঁর কি এক চমক লাগিল, তিনি খুব কাতর হইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । সন্ন্যাসী সাহেবকে দীক্ষা দিলেন, এবং ঘরে ধাইয়া ভজন সাধন করিতে বলিলেন । সাহেব বাসাবাটিতে আসিয়া বাবুর্চিকে বিদায়

করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণের পাকে নিরামিষ আহার করিতেছেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ঢাকার অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে যান। সকলেই তাঁর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত হন। উপস্থিত তিনি কোথায় আছেন জানি না।

ঠাকুর যে এগারসন্ সাহেবের কথা বলিলেন, দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ এই সাহেবকে আমি অনেকবার রমনার মাঠে ক্রিকেট খেলিতে দেখিয়াছি। শুনিলাম এখন তিনি চাইন্টার দিকে বদলি হইয়া গিয়াছেন। খুব সান্ত্বিক ভাবে বৈষ্ণব আচারে থাকেন। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে রহিয়াছে।

এই ঘটনা বলার পর ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—“যেখানে হিংসা নাই সেখানে সাপে বাঘেও হিংসা করে না। খাণ্ডখাদক সম্বন্ধে বধ পৃথক। তাকে যথার্থ হিংসা বলে না। কামাখ্যাতে একদিন অচলানন্দ স্বামী একটি জলাশয়ের কাছে ব’সে আছেন, ব্রাহ্মণেরা সেখানে পূজা আহ্নিক করছেন; এমন সময়ে একটি বাঘ জল খেতে এসে উপস্থিত হ’ল। ব্রাহ্মণেরা বাঘের ভয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত হ’লেন। অচলানন্দ স্বামী সকলকে স্থির হ’য়ে থাকতে বলে, বল্লেন—‘আপনারাই তো ব’লে থাকেন কামাখ্যায় হিংসা নাই, তবে এত ভীত হচ্ছেন কেন? আপনাদের কোনও ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হ’য়ে নিজেদের কার্য্য করুন।’ স্বামিজীর কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা সশঙ্ক হ’য়ে আপন আপন সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করতে লাগ’লেন; বাঘটিও জল খেয়ে চ’লে গেল।”

ঠাকুরের শান্তিপুর যাইতে ব্যস্ততা।

প্রায় এক মাস হইল নানাহানের গুরুভ্রাতাদিগের সম্মিলনে, ঠাকুরের সঙ্গে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পরমানন্দে কাটাইলাম। জানি না, আজ কেন ঠাকুর অকস্মাৎ শান্তিপুরে ১০ই কার্তিক, মঙ্গলবার। যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আজ সকালে চা-সেবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন—“মাকে দেখতে কাল ভোরেই আমি শান্তিপুর যাব।”

আমরা অল্পমান কারলাম ঠাকুরমা অতিশয় পীড়িতা, তাই ঠাকুর বোধ হয় তাঁহার শেষ সময় বুঝিয়া, বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ঠাকুরের সঙ্গে কে কে শান্তিপুরে যাইবেন জিজ্ঞাসা করাতো ঠাকুর বলিলেন—“যার যার ইচ্ছা হয় যেতে পার।”

আমরা আট নয়টি গুরুভাই ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। শ্রীধর বাতরোগে শয্যাগত, উঠিবার শক্তি নাই; ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না ভাবিয়া কান্দিয়া অস্থির হইলেন। শ্রীধর ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর কখনও তাঁহাকে সঙ্গছাড়া করিয়া রাখেন না; এ সময় শ্রীধরকে নিত্যস

অচল দেখিয়া ঠাকুর খুলে মেহের সহিত বলিলেন—“শ্রীধর এই তোমার পাথেয় রইল, যখন সমর্থ হবে, তখনই আমার কাছে চ’লে যেতে পারবে।”

শ্রীধর সারারাত্রি কান্দিয়া কাটাইলেন।

শান্তিপুর যাত্রা।

ট্রেন যাইবার বহুপূর্বেই শেষ রাত্রিতে ঠাকুর দোলাইগঞ্জ স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতারা

অনেকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ঠাকুরকে ঈমারে উঠাইয়া দিবার জন্ত সঙ্গে ১২শে কার্তিক, বুধবার। চলিলেন। রাণাঘাট পর্য্যন্ত আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর আট নয় খানা টিকিট

করা হইল। নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছিয়া আমরা গোয়ালন্দ ঈমারে উঠিলাম। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিদায় হইলেন। ঈমারে উঠিয়া, একপাশে ঠাকুরের আসন পাতিয়া আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে ঘেরিয়া বসিলাম। অনেক লোক আসিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ মামলা মোকদ্দমার ফলাফল, কেহ বা সাংসারিক নানা প্রকার অশান্তি উৎপাতের প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল; আবার কেহ কেহ বা খুব কাতর হইয়া পুনঃপুনঃ উৎকট রোগের ঔষধের জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ঠাকুর ধীরভাবে সকলকেই বলিতে লাগিলেন—“আমি ওসব কিছুই জানি না, ভগবানের নাম করি মাত্র।”

কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনিয়াও কেহই পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে নিবৃত্ত হইল না। ঐরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া, আমরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম, “ইহারা এই ভাবে সমস্তটা দিনই জ্বালাতন করিবে। আপনি বলিলে, আমি সহজে এক কথায়ই ইহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারি। তাই করিব কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“তুমি কি ব’লে এদের নিবৃত্ত করবে?”

আমি বলিলাম—“ইনি হাজার টাকার কমে কিছুতেই ঔষধ দেন না; মোকদ্দমার ফলাফলের কথাও বলেন না। ইহা বলিলে, টাকার কথা শুনিয়াই সকলের শ্রদ্ধা উড়িয়া যাইবে, আর কখনও কেহ এদিকে ঘেসিবে না।”

ঠাকুর বলিলেন—“যদি কেহ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়, তখন কি করবে? এমন লোকও ত থাকতে পারে।”

আমি আর একথার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঠাকুর তখন বলিলেন—“ওরূপ বলতে নাই, যথার্থ কথাই বলতে হবে। যে বিশ্বাস

করে করুক, না করে তাতেই বা ক্ষতি কি ? লোকে আশা ক'রে আশে, একটু বিরক্তও করবে না ? এতে অস্থির হ'লে চলবে কেন ?”

আমি লজ্জিত হইয়া চূপ করিয়া রহিলাম। আমরা প্রায় সন্ধ্যার সময়ে গোয়ালন্দে নামিয়া ট্রেনে চাপিলাম, এবং শেষ রাত্রে রাণাঘাটে পৌঁছিয়া-তথায়ই ভোরবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রত্যুষে ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া প্রায় সাড়ে আটটার সময় শান্তিপুরে পৌঁছিলাম। ঠাকুরের বাড়ীর ঘারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঠাকুরমা সেখানে যেন ২০শে কা্তিক, বৃহস্পতিবার।

ঠাকুরেরই জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠাকুরমার চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল। ঠাকুরমা বলিলেন, “তুই এখন এলি যে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“মা, তুমি যে আমাকে ‘বিজয়,’ ‘বিজয়’ ব'লে ডেকেছিলে, তা আমি শুনেছিলাম।”

ঠাকুরমার শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র কাহারও বিবন্ধে ঠাকুরকে একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমে আমরা ঠাকুরমার সঙ্গে আলাপে জানিতে পারিলাম যে, উম্মাদের অবস্থায় ঠাকুরমার উপরে ঠাকুরমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উহাকে সামলাইতে না পারিয়া, এমন দাক্ষ প্রহার করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরমা দুই তিনবার “বিজয়,” “বিজয়” রবে চীৎকার করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরমার ঐ চীৎকার শুনিয়াই, ঠাকুর শান্তিপুরে আসিবার জন্ম অস্থির হইয়াছিলেন, ইহা পরিষ্কার জানিতে পারিয়া আমরা অবাক হইলাম। ঠাকুর বাড়ীতে পৌঁছিয়া নীচের ঘরেই আসন করিয়া বসিলেন। অবিলম্বেই আমরা উপরের ঘর পরিষ্কার করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। এতকাল আমি স্বপাকে আহাৰ করিয়াছি, আজ সকলের সঙ্গেই প্রসাদ পাইতে ঠাকুর আমাকে আদেশ করিলেন, উপরে একটি মাত্র ঘর, তাহাতেই আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে রহিলাম।

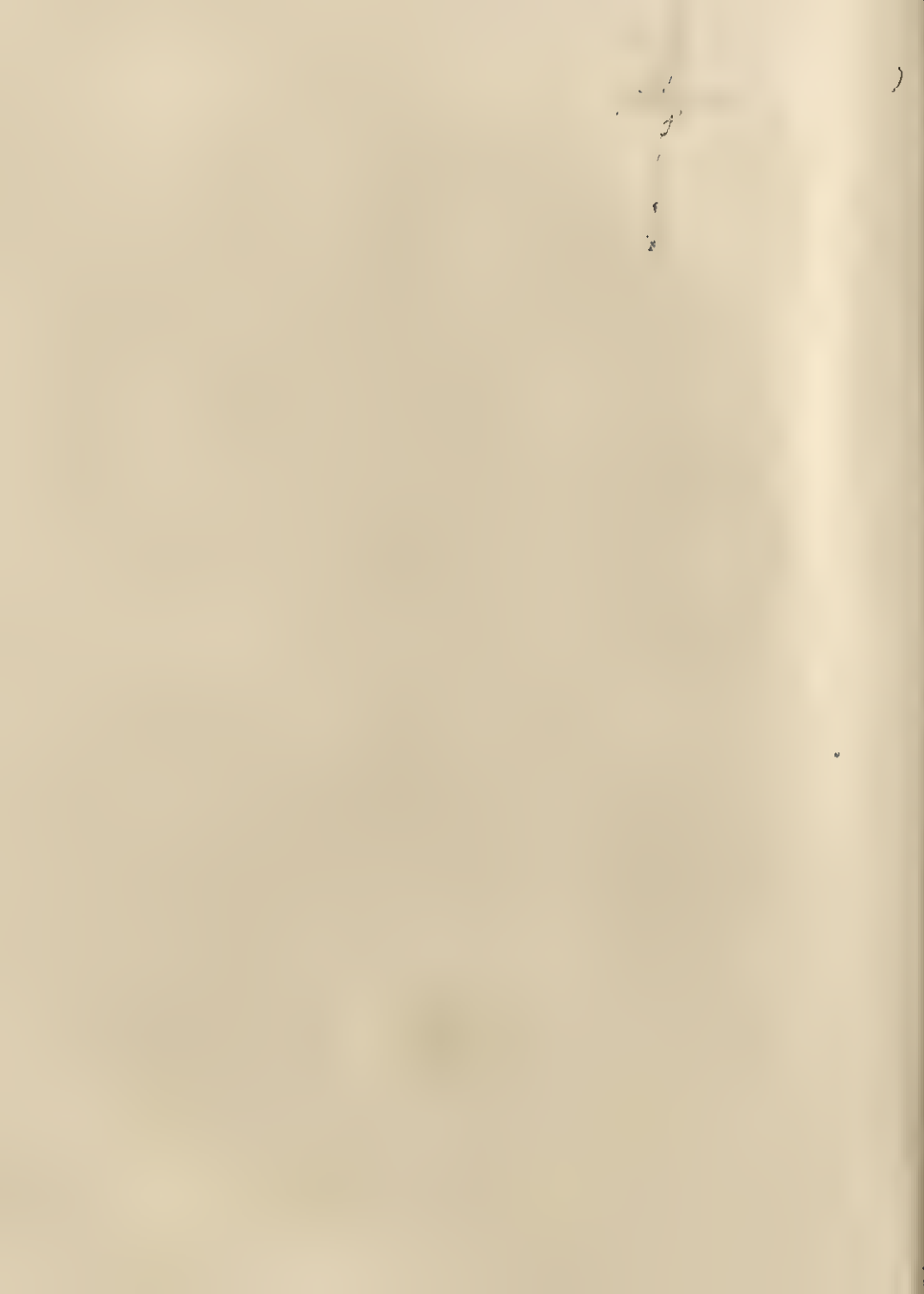
পাণ্ডব বিজয় যাত্রাভিনয়—সত্যনিষ্ঠার উপদেশ।

আহারান্তে অপরাহ্নে আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম। গৃহদেবতা শ্রীমন্তন্দরকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর আমাদের সঙ্গে শান্তিপুরে বহু দেবালয়ে লইয়া গেলেন।

২০শে কা্তিক, শুক্রবার। সর্বত্রই সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে, আমরা যাত্রা শুনিবার জন্ম কোন এক গোষ্ঠামীর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। গৃহস্থামী যাত্রাস্থলে ঠাকুরকে বসিতে আহ্বান করিতে, ঠাকুর আমাকে মাত্র সঙ্গে লইয়া সভায় গিয়া বসিলেন। অপরপর সকলকে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাত্রা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণদের সভায় অপর জাতি একাসনে বসেন না বলিয়াই, ঠাকুর সকলকে লইয়া সভাস্থলে গেলেন না, এ কথা পরে জানাইলেন।



শ্রীগোবিন্দী প্রভু শান্তিপুর বাটী (বর্তমান অবস্থা) ১০৮ পৃষ্ঠা।



যাত্রা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে দণ্ডী রাজা পাণ্ডবদিগের শরণাগত হইলেন। ভীমসেন দণ্ডী রাজাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিতে পারিয়া পাণ্ডবদের নিকটে আসিয়া দণ্ডী রাজাকে চাহিলেন। পাণ্ডবেরা বলিলেন, 'ইনি প্রাণভয়ে আমাদের শরণ লইয়াছেন। আমরাও ইহাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিয়াছি। স্বতরাং কিছুতেই ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তাহা হইলে তোমাদের সঙ্গে আমার বিষম বিরোধ ঘটিল দেখিতেছি।' ভীমসেন বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ, আমাদের একমাত্র বল তুমি। তোমার আত্মীয়তার গর্বেই আমরা ইন্দ্রচন্দ্রকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করি না। কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করিতে যতপি আমাদের জীবন দিতে হয়, এমন কি যদি তোমার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়, অনায়াসে করিব। ধর্ম কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না।' শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কান্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবগণকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাণ্ডবেরাও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কোরবগণের সহিত মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দেবগণের সহিত কুরু পাণ্ডবগণের মহাযুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধের পরিণাম কুরু পাণ্ডবের জয় ও শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়। এই যাত্রা শুনিয়া আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“শ্রীকৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎ ভগবান্, তা হ'লে তিনি সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও সামান্য কুরু পাণ্ডবদের নিকট পরাস্ত হইলেন কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“এই দেখালেন যে, নিজ কর্তব্যে যদি দৃঢ়তা থাকে, সত্যে ও ধর্মে যদি একান্ত নির্ভা এবং চেষ্টা থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদির সহিত মিলিত হ'য়েও স্বয়ং ভগবান্ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে কিছুই করতে পারেন না। সত্যের সর্বত্রই জয় জানুবে। যাহা সত্য, যাহা ধর্ম, তাহাতেই স্থির থাকুবে। ভগবান্ও যদি নানাপ্রকার ঐশ্বর্য দেখায়ে বিচলিত করতে চেষ্টা করেন, কখনই টলুবে না। তিনি যদি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে পরাস্ত করতে চেষ্টা করেন, পারবেন না। দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হ'য়েও পরাস্ত হবেন, তাঁর কৃপায় সর্বত্র সত্যের জয় হয়, ইহা নিশ্চয়ই জেনো।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“গুরু যাকে যেটি নিয়ম করিয়া দেন, তাহাই ত তার কর্তব্য? আর তাঁর উপদেশই ত ধর্ম?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তা বই আর কি?”

আমি বলিলাম—“সকল নিয়মই কি আর মৌল আনা সর্বত্র রক্ষা করা যায়?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তা না করলে হবে কেন? যার যেটি নিয়ম, তা সর্বত্র মৌল আনা রক্ষা ক'রে চলতে হবে, একটু বাদ পড়লে চলুবে না; নিয়মের একটি ছাড়লে

সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটিও ছাড়তে হয়। শত সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্যেও নিজের নিয়মে দৃঢ়তা রাখবে। এ বিষয়ে বজ্রের মত কঠিন হবে। “বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুশুমাদপি। লোকোত্তরাণাম্ চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি॥” বজ্রের মত কঠোর ও পুষ্পের মত কোমল হ’তে ঋষিরা যে বলেছেন, তাহা এই নিয়ম রক্ষা বিষয়েই। আর এই নিয়মে প্রবেশ বিষয়েই আবার পুষ্পের মত কোমল হ’তে হবে। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত, ধীর ও শান্ত ভাবে, নিজের নিয়ম রক্ষা ক’রে যাবে।”

চিন্তাবিকৃতি ও শাসন।

ঠাকুর শান্তিপুরে পঁহছিলেন, ঠাকুরের আত্মীয় স্বজনগণ, বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতেছেন। একটি অন্নবয়স্ক ব্রাহ্মণ বিধবা, প্রায় সর্বদাই আমাদের ২২শে কার্তিক, শনিবার। এখানে আসেন। গতকল্য হইতে আমাকে তিনি তাঁর বাড়ীতে লইয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পুনঃপুনঃ অহুরোধ করাতে আমি বলিলাম, “ঠাকুর না বলিলে আমি কোথাও এক পা যাইতে পারি না। আপনি ঠাকুরকে বলুন না।” স্ত্রীলোকটি ঠাকুরকে যাইয়া বলিলেন, “তোমার ব্রহ্মচারী শিষ্যটিকে একবার আমার বাড়ী নিয়ে যেতে চাই।”

ঠাকুর বলিলেন—“ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা হ’লে যাবে।”

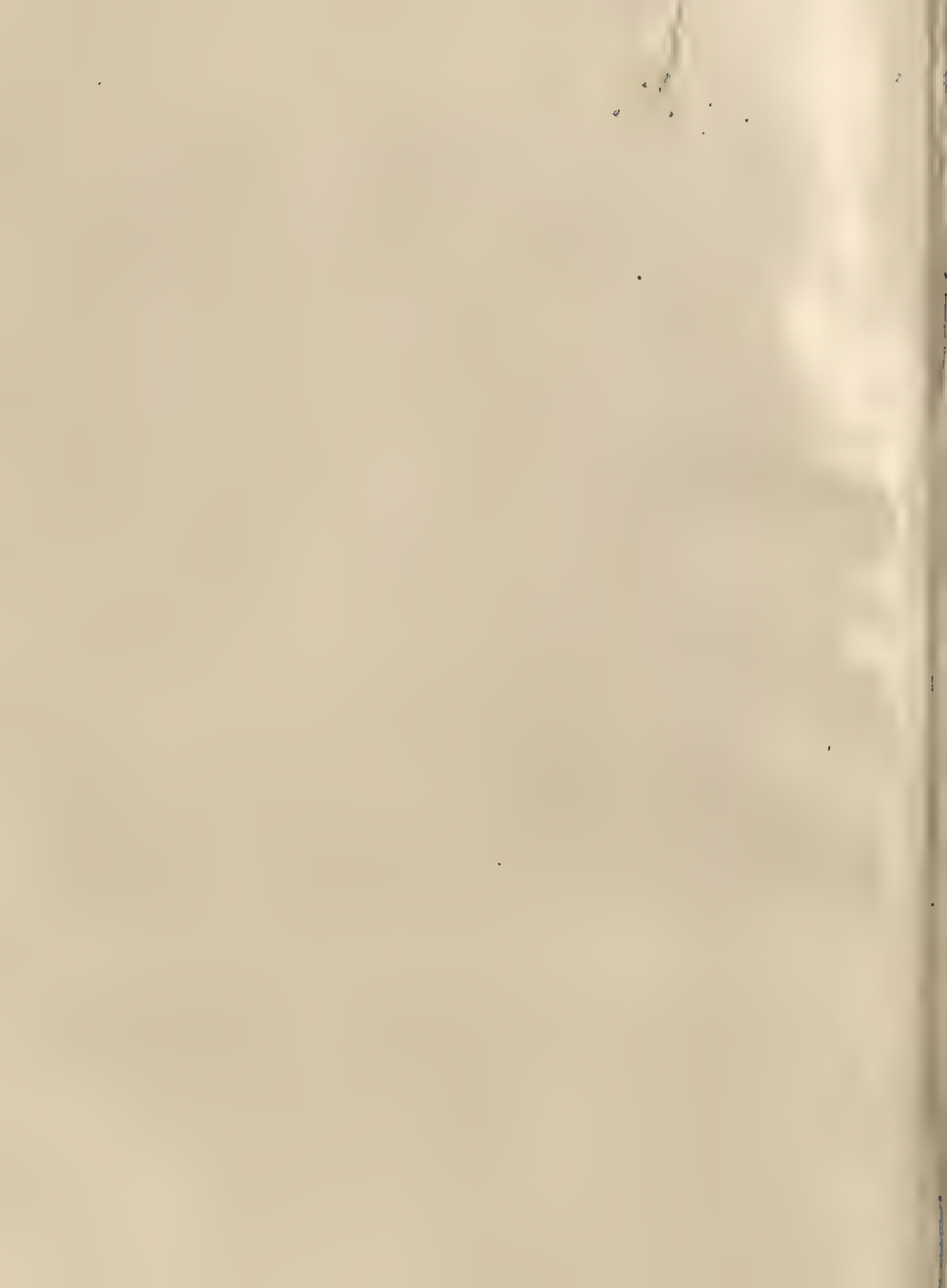
ঠাকুরকে ছাড়িয়া পাঁচ মিনিটের জ্ঞাও অজ্ঞা যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। অথচ স্ত্রীলোকটির বিশেষ আগ্রহ ও অহুরোধ দেখিয়া আমি বিষম সমস্যা পড়িলাম। ঠাকুর আমাকে অহুমতি দিয়াছেন, কোনও প্রকারে মনকে বুঝাইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। উহার বাড়ী পৌছিয়া দেখি, অজ্ঞা একটি লোকও ঐ বাড়ীতে নাই, মাত্র একটি ছোট ছেলে রহিয়াছে। বিধবাটি আমাকে বসিতে আসন দিয়া, জল খাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমি নিষেধ করাতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে সম্মুখে বসিয়া নানাকথায় আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। স্বন্দরী যুবতীর রূপলাবণ্য ও হাবভাব দেখিয়া আমি যেন কেমন হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি থাকিব কি যাইব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ ভয়ে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমি বিধবাটিকে বলিলাম, “অনেকক্ষণ হয় আসিয়াছি, শীঘ্র আমাকে ঠাকুরের নিকট পৌছাইয়া দিন। আমার অসুখ বোধ হইতেছে, বরং অজ্ঞাদিন আসিব।” স্ত্রীলোকটি যেন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু কয়েকবার থাকিতে বলিয়া আর বিশেষ জেদ করিলেন না; রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। আমি বাড়ী পঁহছিয়া ঠাকুরের নিকটে নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—“কি ব্রহ্মচারী, বেড়িয়ে এলে, বেশ ভালো লাগল?”

আমি বলিলাম—“বিষম ভাল লাগল। আমি কি আর এমন জানি?”



বাবলায় শ্রীশ্রীঅগ্নিত প্রভুর ও তাহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের মূর্তি ১১০ পৃষ্ঠা



ঠাকুর বলিলেন—“তা আমার জান না ? না জেনেই কি গিয়েছিলে ?”

আমি খুব লজ্জিত হইয়া বলিলাম—“কি করব, উহার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। আমার তেমন একটা ইচ্ছা ছিল না।”

ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন—“তবে গেলে কেন ? ধর্ম্মলাভ করতে ইচ্ছা হ’লে, লোকের অনুরোধ উপরোধ ছাড়তে হবে। কিসে কার মনে কষ্ট হবে, কিসে কার মন রক্ষা হবে, এসব দিকে তাকালে কখনও ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। ঠিক প্রাণের সরল আকর্ষণের দিকে তাকিয়ে সমস্ত কার্য্য করতে হয়। কারও অনুরোধে কোথাও যাওয়া বা কোনও কার্য্য করা ঠিক নয়। ঐক্য করলে উপকার না হ’য়ে বরং অনেক সময়ে বিষম ক্ষতিই হয়। সহজভাবে প্রাণের আকর্ষণমত কার্য্য ক’রে গেলে, কোনও ক্ষতিই হয় না। অবশ্য এমনও ঘটতে পারে যে, একজন লম্পটের উপর আকর্ষণ পড়ল, আবার একজন সাধুর উপরও হ’ল না। সে সব স্থলে বুঝে নেওয়া বড়ই কঠিন ; তা হ’লেও সরল ভাবে প্রাণের সহজ টানে কোন কার্য্য করলে পরিণামে অমঙ্গল ঘটে না। যিনি যত উন্নত হউন না কেন, স্ত্রীলোক হ’তে সকলকেই সর্বদা তফাৎ থাকতে হবে। এমন কি উদ্ধরতাঃ হ’লেও, স্ত্রীলোক হ’তে বিষম অনিষ্ট হ’য়ে থাকে।”

সংসঙ্গ বিষয়ে উপদেশ।

ঠাকুরের এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই অভিমান হইল। ঠাকুরের উপরই একটু চাপ দিয়া আমি বলিলাম, “নিয়ত সঙ্গুর সঙ্গলাভ করেও এ সকল কুপ্রবৃত্তি আমার কিছুতেই গেল না।”

ঠাকুর বলিলেন—“সঙ্গুরের সঙ্গ ! সে ত অনেক দূরের কথা, সংসঙ্গও তোমরা ঠিকমত করছ না। সংসঙ্গ হ’লে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নষ্ট হ’য়ে যায়।”

আমি বলিলাম—“আবার সংসঙ্গ কিরূপে করতে হয় ? সংসঙ্গ কাকে বলে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“সাধুর সঙ্গে দশটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলাই সংসঙ্গ নয়। সাধুর নিকটে থেকে তাঁর সমস্তগুলি কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার, খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীর ভাবে দেখে যেতে হয়। কখন তিনি কি করেন, কার সঙ্গে কোন্ অবস্থায় তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কি প্রকারে সময় অতিবাহিত করেন, সাধুদের এ সমস্ত কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাকলে, চিত্ত তাতে আকৃষ্ট হ’য়ে পড়ে ; ধীরে ধীরে, নিজের দিকে যাহা কিছু ক্রটি আছে ধরা পড়ে ও তাতে ঝিকার জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এ সমস্ত বিকৃত ভাবও নষ্ট হ’য়ে যায়।”

বাবলায় অপ্রাকৃত হরিসঙ্কীৰ্তন ।

ঠাকুর এখানে আছেন খবর পাইয়া কলিকাতা হইতে কয়েকটি গুরুভ্রাতা গতকল্য শান্তিপুরে আসিয়াছেন । প্রত্যুষে আমরা সকলেই গঙ্গাস্নানে গেলাম ; গঙ্গা বহুদূরে, ২৩শে কা্তিক, রবিবার । চড়াতে পঁহছিয়াও প্রায় এক মাইল চলিতে হয় ।

ঠাকুর বলিলেন—“বড় রাস্তার উপরে, যে স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিছু কাল পূর্বেরও গঙ্গা সেই স্থানে ছিলেন ।”

আহারান্তে, আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে অদ্বৈতপ্রভুর ভজন স্থান দেখিতে বাবলাতে চলিলাম । অনেক দূর চলিয়া আমরা একটি খাল পাইলাম ।

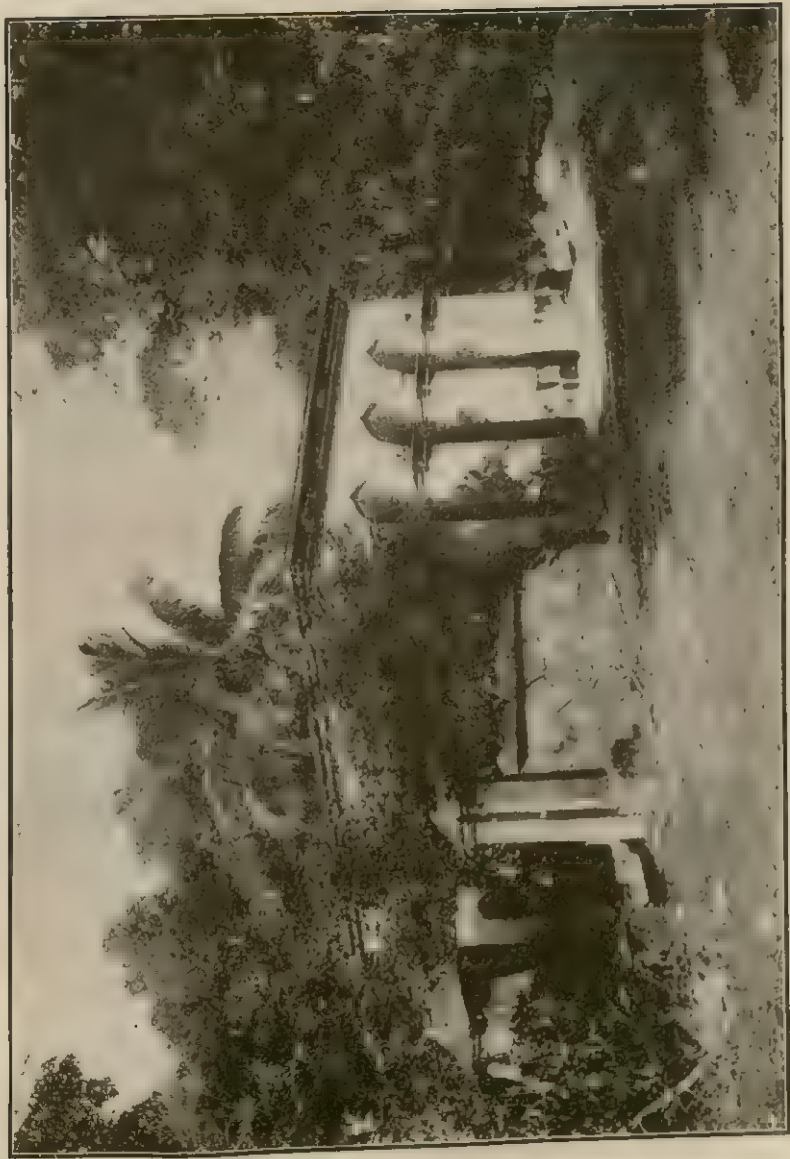
ঠাকুর বলিলেন—“এই খাল এক সময়ে গঙ্গা ছিল ।”

সন্ধ্যার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে আমরা বাবলাতে পঁহছিলাম । একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী অদ্বৈত-প্রভুর মন্দিরে সেবক রহিয়াছেন । বাবাজীর বিনয়, ভক্তি ও সেবানিষ্ঠা দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দলাভ করিলাম । স্থানটি অতিশয় নির্জন, গঙ্গা হইতে এখন বহুদূরে । এক সময়ে গঙ্গা এই মন্দিরেরই ধার দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন । ঠাকুরের সঙ্গে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিলে—

ঠাকুর আমাদের বলিলেন—“স্থানের প্রভাব বড়ই চমৎকার । একটু স্থির হ’য়ে ব’সে নাম করলেই বুঝতে পারবে ।”

আমরা সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম । প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই শুনিতে পাইলাম, বহুদূর হইতে যেন খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও মৃহমূর্ছা শব্দধ্বনি সংযোগে একটি মহাসঙ্কীৰ্তন ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে । ভাবিলাম ঠাকুরকে এখানে আজ উপস্থিত জানিয়াই, বুঝি আশপাশের লোক সঙ্কীৰ্তন লইয়া এখানে আসিতেছেন । আমরা খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম । সঙ্কীৰ্তনের ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত নাচিয়া উঠিল । দুই এক মিনিট অন্তরেই সঙ্কীৰ্তন আসিয়া পড়িয়াছে সুস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, আমরা কেহ কেহ আসন ছাড়িয়া সঙ্কীৰ্তনে যোগ দিতে মন্দিরের বাহির হইয়া পড়িলাম এবং অদূরেই সঙ্কীৰ্তন হইতেছে বুঝিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম । অদ্ভুত ভগবানের খেলা, ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা সঙ্কীৰ্তনে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় চলিতে লাগিলাম, ততই সঙ্কীৰ্তনের ধ্বনি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া, দুই এক মিনিটের মধ্যে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল । আমরা আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সঙ্কীৰ্তনের মহা কোলাহল শুনিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় যেমন আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া ছুটাইয়া চলিতে লাগিলাম, জানি না অকস্মাৎ কি প্রকারে সেই সঙ্কীৰ্তন মুহূর্তমধ্যে কোন্ দিকে চলিয়া গেল ।”

ঠাকুর বলিলেন—“ছেলেবেলা প্রায়ই আমি বাবলায় আসতাম । এই সঙ্কীৰ্তন শুনতাম ;



বাবলার শ্রীমন্দির সমুখস্থ মাটিমন্দির

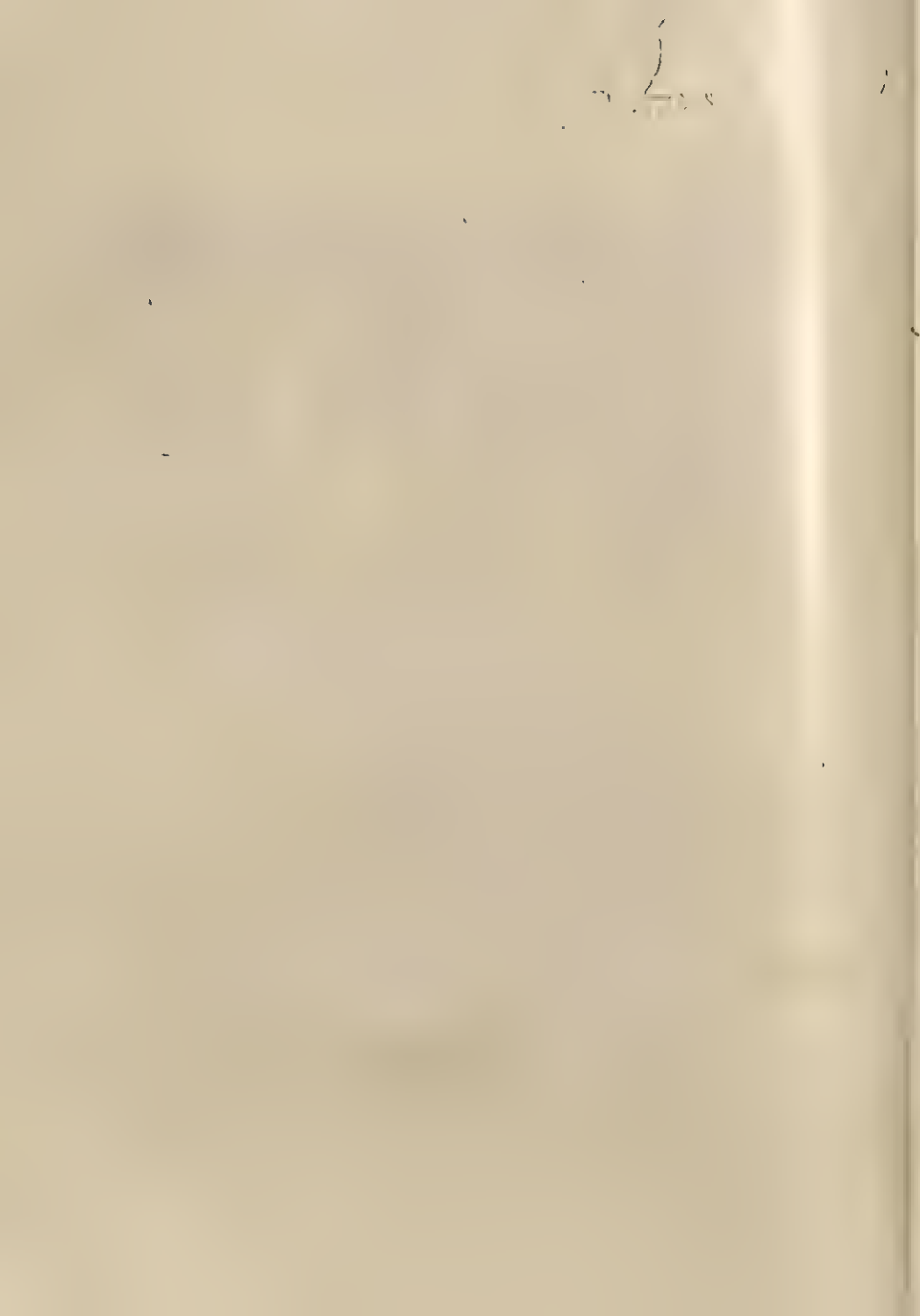


)

n



বাবলার ক্রীমন্দির সমুখস্থ বাটমন্দির



তখন একবার এদিক্ একবার ওদিক্ ছুটাছুটি কর্তাম। স্থির হ'য়ে ব'সে নাম করলেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পারতে। এই সঙ্কীৰ্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান, মহাপ্রভুর সঙ্কীৰ্ত্তনের ধ্বনি শুনেছ।”

আমরা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। সমস্তই ভগবান্ গুরুদেবের রূপ। তাঁরই রূপাতে সেই অপ্রাকৃত মহাপ্রভুর সঙ্কীৰ্ত্তনের আভাষ পাইলাম। কুবুদ্ধি বশতঃ ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে যাইতেই তাঁর অপরিমীম রূপার ফল মুহূৰ্ত্তমধ্যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ধন্য গুরুদেব! তোমার রূপ। ব্যতীত সমস্ত অলৌকিক অবস্থা, অদ্ভুত দৃশ্য অপ্রাকৃত আনন্দকেও কিছুই যেন মনে না করি, এই আশীর্বাদ করিও। বাবাজী ঠাকুরকে অদ্বৈতপ্রভু বলিয়া বহু স্তুতি করিলেন। বাবাজীর নিকপট শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“হিন্দুস্থানী বাবাজী এখানে আসিয়া রহিলেন কিরূপে? কতকাল যাবৎ এখানে আছেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“কতকালযাবৎ আছেন বলিতে পারি না। বহুকাল হ'তেই বাবাজীকে এই অবস্থায় দেখে আসছি। অল্প বয়সে ইনি অকস্মাৎ এখানে এসে পড়েন, অদ্বৈতপ্রভুর বিশেষ রূপ। লাভ ক'রেই, এখানে প'ড়ে আছেন। একরূপ মরার মত প'ড়ে না থাকলে কি আর ধর্ম্মলাভ হয়? ধর্ম্ম কি আর এমনই সহজ জিনিস? অভিমান শূন্য হ'তে হবে। বৃক্ষের যেমন বীজ না পচলে তা হ'তে অঙ্কুর বাহির হয় না, মানুষেরও অভিমানটি একেবারে নষ্ট না হ'লে, ধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মায় না। অভিমান যত কাল আছে, ততকাল প্রকৃত ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই; এ নিশ্চয় জান্বে, জীয়ন্তে মৃত হ'তে হবে।”

বাবলায় কুকুর দ্বারা অদ্বৈতপ্রভুর পাছুকা আবিষ্কার।

শুনিলাম এই বাবলা শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তপস্থার স্থান ছিল। শান্তিপুরের প্রায় দুই মাইল উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। চারিশত বৎসর পূর্বে এই স্থান শান্তিপুরেরই অন্তর্গত ছিল। এখনও ইহাকে আদি শান্তিপুর বলে। সেই সময়ে স্বর-ভরঙ্গিণী গঙ্গা এই পূণ্যভূমির ধার দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিতা ছিলেন, এখন গঙ্গার খাত মাত্র অবশিষ্ট আছে। বাবলা বৃক্ষের জঙ্গলে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে বাবলা বলে। বাবলার উত্তরে পঞ্চবাটা। এই পঞ্চবাটার সন্নিকটে একটি দোলমঞ্চ ছিল। তথায় অদ্বৈত মহাপ্রভুর দোল হইত। এখন দোল শ্রীমন্দিরেই হইয়া থাকে। এই দোল শপ্তম দোল নামে অভিহিত। এখনও এই দোল উপলক্ষে এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় এবং মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরে অদ্বৈতপ্রভুর দারুণময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বহুকাল হইতে তাঁহার নিত্যসেবা চলিতেছে।

এই পরম পবিত্র নির্জন তজন স্থানের প্রতি বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরের অসাধারণ আকর্ষণ।

ক্রমশঃই এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। শান্তিপুরে থাকিলে ঠাকুর প্রায়ই এই স্থানে আসিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন করেন এবং ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়েন। পূর্বেই শান্তিপুরে ব্রাহ্মবন্ধুদের সমাগম হইলে ঠাকুর তাঁহাদের লইয়াও বাবলায় আসিতেন। কেশববাবু, সাধু অঘোবনাথ, ভাই প্রতাপ, কাছিয়াবু, ত্রৈলোক্য সাম্যাল প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুদের লইয়া ঠাকুর অনেকবার এই বাবলায় আসিয়া সঙ্কীৰ্ত্তনোৎসব করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী শান্তিসুধার বিবাহের কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুর যখন শান্তিপুরে আসিয়া কিছুকালের জন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই বাবলায় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল শুনিয়া অবাক হইলাম। একদিবস ঠাকুর চৌদ্দ মাদল লইয়া বহুলোক সমেত নিজ বাড়ী হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে বাবলায় চলিলেন। গৃহপালিত কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এ কুকুর সাধারণ কুকুর নয়। শুনিলাম জীবনে কখনও এই কুকুর মাংস বা উচ্ছিষ্ট খায় নাই। কুকুর “কেলে” প্রত্যহ শ্রামস্বন্দেব মন্দির পরিক্রমা করিত। খোল করতালের শব্দ পাইলে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইত এবং নিবিষ্টচিত্তে একস্থানে বসিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন শ্রবণ করিত। কখনও কখনও উহার অশ্রুধারা নির্গত হইত। ঠাকুর কেলে “ভক্তরাজ” বলিয়া ডাকিতেন। কেলে না কি মহাপুরুষ, বিশেষ কোনও কার্য সাধনের জন্ত সংসারে আসিয়াছে। সঙ্কীৰ্ত্তনের সঙ্গে আনন্দ করিয়া কেলে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু গঙ্গার খাত পার হইবার সময় সহযাত্রীদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কেলেকে তাড়াইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কেলে তখন নিরুপায় হইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঠাকুরের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর কেলের গমনে বাধা দিতে নিবেদন করিলেন। অচিরেই হরিসঙ্কীৰ্ত্তন মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তখন ভাবাবেশে মত্ত হইয়া সকলেই উদ্‌গুণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দিক্ হইতে অপ্রাকৃত মহাসঙ্কীৰ্ত্তনের যুদ্ধ করতালের ধ্বনি শুনিয়া সকলেই মাতোয়ারা হইলেন। কেহ কেহ অদূরে সঙ্কীৰ্ত্তন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাতে যোগ দিবার মানসে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই তাঁহারা মন্দির হইতে তফাৎ হইতে লাগিলেন ততই সেই সঙ্কীৰ্ত্তনের ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না। এই সময়ে “ভক্তরাজ” কেলে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পঞ্চবটীর নিকটে একটি স্থানে দৌড়িয়া গিয়া সজোরে মৃত্তিকা আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরক্ষণেই ঠাকুরের নিকটে আসিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঠাকুরের বহির্দ্বার কামড়াইয়া ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমাগত তাহাকে এক্রূপ করিতে দেখিয়া ঠাকুর কেলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং উহা খুঁড়িবার জন্ত আদেশ করিলেন। নিকটবর্তী কৃষকদের গৃহ হইতে দুখানি কোদালি আনিয়া ঐস্থান খনন করা হইল। খানিক দূর খনন করিয়া কিছুই না পাওয়াতে খননকারীরা নিবৃত্ত হইল। এই সময়ে “ভক্তরাজ” ঠাকুরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং নঞ্চদ্বারা মৃত্তিকা আবার ব্যস্ততার সহিত আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া ঠাকুর আরও মৃত্তিকা খনন করিতে বলিলেন। এইবার কিছুক্ষণ খুঁড়িতেই একটি

পিতলের বড় হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। উহার ভিতরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নামাক্তিত একজোড়া কাষ্ঠ পাছুকা একটা মাটির করোয়া এবং হস্তলিখিত ছিন্নপুঁথি একটি বাক্সের ভিতরে রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঠাকুর ঐ পাছুকা মন্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্কীৰ্ত্তন আবার আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে অচেতন্ত হইয়া পড়িলেন, সংজ্ঞাভ করিয়া দেখিলেন “ভক্তরাজ” কেলেও অচেতন্ত। ঠাকুর তাহার কানে নাম শুনাইতে লাগিলেন। ক্রমে কেলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া “যে কার্য্যের জন্ম তুমি এসেছিলে, আজ তাহা সম্পন্ন হইল, এখন তুমি গঙ্গালাভ কর” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্রহরাধিক রাত্রির পর সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে সকলে গৃহে আসিল। পরদিন প্রাতে সকলে গঙ্গাস্নানে গিয়া দেখিলেন এক হাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাসিতেছে। ঠাকুর নিজহস্তে গঙ্গাতীরের বালুকা খনন করিয়া “ভক্তরাজ” কেলের দেহ সমাধিস্থ করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর করোয়া পাছুকা প্রভৃতি লইয়া কিছুকাল পরে গোষ্ঠামীদের মধ্যে বগড়া আরম্ভ হইল, তখন ঠাকুর একসময়ে বাবলায় আসিয়া ঐ সমস্ত বস্তু অদ্বৈতপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনের নীচে সমাধিস্থ করিয়া রাখিলেন। এ সকল শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম।

হিমালয়ে গুরু অব্বেষণ ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার।

আহায়াস্তে ঠাকুরের নিকট বসিয়া আমরা শাস্তিপুরের অনেক কথা ঠাকুরের মুখে শুনিতে লাগিলাম। কথা প্রসঙ্গে স্মৃতিধা পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—
 ২৩শে কার্তিক, দোমবার।
 “বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্মস্থান শুনিয়াছি এই শাস্তিপুরেই ছিল। শাস্তিপুরের আরও কোন প্রাচীন মহাত্মা এখন আছেন কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“জীবিত আছেন কি না বলিতে পারি না; তবে হিমালয়ের উপরে একটি মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন তাঁহারও জন্মস্থান এই শাস্তিপুরে।”

ঠাকুর কখন কি ভাবে তাঁর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, জানিতে আমাদের কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—“গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে লাভ হবে, পুনঃপুনঃ এরূপ কথা মহাত্মাদের মুখে শুনে, আমি গুরুর অনুসন্ধানে অস্থির হ’য়ে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগলাম। সেই সময়ে আমি হিমালয়ে উঠে, বহু দুর্গম স্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে ঘুরতে লাগলাম। কয়েকটি বৌদ্ধযোগীর মুখে শুনতে পেলাম, ঝরনার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর একটি গোফার সন্নিকটে, এই পর্বতের উচ্চশৃঙ্গে একটি বাঙ্গালী মহাপুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত শিগেরা নিকটবর্তী গোফা হ’তে বের হ’য়ে এসে তাঁকে চৈতন্ত করান। মহা-

পুরুষের খবর পেয়ে তাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষায়, আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়লাম। হিমালয়ের উপরে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অজ্ঞাত পথে মহাপুরুষের উদ্দেশে চলতে লাগলাম। দুই দিন দুই রাত্রি আমার আহার নিদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় শরীর এত অবসন্ন হ'ল যে, একটি বৃক্ষমূলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়লাম। ভগবানের অদ্ভুত দয়া। একটি উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি পর্বতবাসী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে এসে স্পর্শ করলেন; পরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ আমার হাতে দিয়ে বললেন, “বাচ্ছা, এহি দানা পায় লেও, ভুখ্ পিয়াস্ ছুট্ যায়েগা, পর্বত পর যেত্না রোজ রহোগে, ছ'এক দানা পায় লিও, ভুখ্ পিয়াস্ কভি নেহি হোগা।” এই বলিয়া তিনি আমাকে কতকগুলি সর্ষের দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলেন। আমি দুই একটি দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথশ্রান্তি একবারে দূর হ'য়ে গেল। ঐ বীজ অনেক দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, পাহাড়ে আমি যত কাল ছিলাম, ঐ বীজ দুই একটি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে খেতাম। পাহাড়বাসী সন্ন্যাসীকে ঐ মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, “হাঁ, বাঙ্গালী এক বড়া ভারী মহাত্মা পর্বতকা উপরমে রহতে হ'য়; কভি কভি নীচুমে আয়কে ঝরণামে আন্মান্ করুকে বিজ্জলিকা মাকি ক্ তুরন্ত চলে যাতে। লম্বা লম্বা জটা, পানি ঝর্ ঝর্ গির্তি হয়। এয়সে চলে যাও, মিল যায়েগা।” এই বলে তিনি ঐ অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করলেন। আমি ঐ পথ ধ'রে চলতে চলতে মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। ছুটি শিষ্য নিয়ত তাঁর সেবায় রয়েছেন দেখলাম। মহাপুরুষ অনাবৃত স্থানে প্রস্তরের উপরে একভাবে একাসনে সমাধিস্থ হ'য়ে থাকেন। রাত্রিতে বরফে মহাপুরুষের সর্বাপ একেবারে ঢেকে যায়। পরদিন সকালে বরফের স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পরে যেমন বেলা হ'তে থাকে, বরফ গ'লে গ'লে ক্রমে ক্রমে মহাপুরুষের কলেবরও প্রকাশ পেতে থাকে। শিষ্যরাও ঐ সময়ে মহাপুরুষের সম্মুখে আগুন জ্বেলে তাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং অবসর বুঝে সময় সময় খুব গরম গরম চা মুখে ঢেলে দেন। বেলা প্রায় ১১টার সময় মহাপুরুষের বাহুজ্ঞান হয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“হিমালয়ের উপরেও সাধুরা চা খান? চা তাঁরা কোথায় পান?”

ঠাকুর বলিলেন—“হিমালয়ের উপরে যে সকল বৌদ্ধযোগী মহাত্মারা আছেন, নিয়তই তাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ান থাকে। দশ পনের মিনিট অন্তর অন্তর, তাঁরা একটু

একটু চা খেয়ে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। ঐ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা পাতা এনে শুকায়ে রাখেন। পাতাগুলিও খুব বড় বড় হয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“চায়ে কি তাঁরা দুধ দেন না?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, খুব উৎকৃষ্ট দুধ দেন। পালানে দুধ ভার হ’লেই পাহাড়ের গাভীরা এক একটা নির্দিষ্ট স্থানে দুধ ছেড়ে যায়। ঐ দুধ বরফময় প্রান্তরে পড়ামাত্রই জমাট হ’য়ে যায়; সাধুরা ঐ দুধ চিমটা দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আসেন। গরম জলে ফেললেই উৎকৃষ্ট দুধ হয়। চায়েতে তাঁরা মিষ্টি দেন না। প্রয়োজন হ’লে তাও অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারেন। ইক্ষুরসের মত মিষ্টরসযুক্ত লতাপাতা পাহাড়ে বিস্তর জন্মায়, সাধুরা সে সকলেরও সন্ধান রাখেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“মহাপুরুষ কি কোন কথাই বলিলেন না?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, খুব বললেন; নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন। অল্প বয়সে উপনয়নের পরেই একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তিনি গৃহ ছেড়ে চ’লে যান। তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে অবশেষে এই বললেন, “বীৰ্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা এই দু’টি ঠিক হ’লেই, ক্রমে যোগিজনহর্ষিত ‘ব্রহ্মপদ’ লাভ হয়। বীৰ্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা না হ’লে কিছুই হয় না। বীৰ্য্যধারণ যেমন শরীর রক্ষা বিষয়ে একপক্ষে সর্বপ্রধান কারণ, সত্যও আত্মরক্ষা বিষয়ে ঠিক তদ্রূপ। অসত্য চিন্তা, অসত্য ব্যবহার যোগসাধন বিষয়ে বিষম অনিষ্টকর। মিথ্যা কথা বলা যেমন মহাপাপ, মিথ্যা কল্পনা করাও ঠিক সেইরূপ; যাঁরা যোগপথে চলবেন, যাবতীয় কার্য্যেই তাঁদের সত্যের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। নাটক, নভেল প্রভৃতি যাহারা মূলই অসত্য বা মিথ্যা তা শুনা বা পড়া যোগশাস্ত্রে নিষেধ। অসত্য চিন্তা মহাপাপ জান্বে, ওতে মস্তিষ্ক নষ্ট করে। ভগবান্ই সত্য; ভগবচ্চিন্তাতে মস্তিষ্কের শক্তি সকল দিকেই এত বৃদ্ধি করে যে, তাহা বলা যায় না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“সাধু মহাত্মাদের সঙ্গলাভ হ’লে তাঁরা যে সকল উপদেশ দিবেন, সেইমত কি আমরা চলতে পারি?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, ইচ্ছা হ’লে খুব পার। যেখানে সত্য, যেখানে ত্রাণ, সেখানেই আমাদের অধিকার আছে। সকল স্থানে সকলেরই কাছে, আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি, তাতে কোনও নিষেধ নাই; তবে প্রয়োজনও কিছুই নাই। এই সাধন ধ’রে চলতে পারলে ক্রমে সমস্তই লাভ হবে, কিছুই অভাব থাক্বে না। অশ্বের উপদেশমত

চলতে গেলে, অনেক সময় ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। নির্ভার দিকেও অনিষ্ট হয়। অনেকেই নিজ মতে টেনে নিতে চেষ্টা করেন, এ ত প্রায়ই দেখা যায়।”

জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

এখানে আমিরা আমার হু'দিন হোম বন্ধ ছিল। এখন নিত্য হোম করিতেছি। আজ হু'তে ঠাকুর আমাকে আবার স্বপাক আহার করিতে বলিলেন। নানা প্রকার অস্থবিধাতেও আমি স্বপাক আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়া লইলাম। ঠাকুরের সঙ্গে অপরাহ্নে আর বেড়াইতে স্থবিধা পাইব না ভাবিয়া, বড়ই দুঃখ হইল। ভাবিলাম, “গুরুকুলে বাস করিতেছি, গুরুপরিবারের ব্রাহ্মণকন্যা রান্না করিতেছেন, ঠাকুরের ভোগ হইতেছে, কোনও প্রকার অনাচারেরই সম্ভাবনা নাই, এখানে আবার স্বপাক! ইহার তাৎপর্য কি? লোকসমাজে যে প্রকার জাতিভেদ প্রচলন রহিয়াছে, আমার প্রতি ব্যবস্থাত দেখিতেছি তাহা অপেক্ষাও বহুগুণে কঠিন, ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক অবস্থায়, ঠাকুর সাধারণের অন্তর হইতে জাতিবুদ্ধির মূল উৎপাটন করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়েও ব্যবহারিক জাতিভেদের আঁটাআঁটি, ঠাকুরের কার্যকলাপে ততটা দেখিতে পাইতেছি না। তবে আমার উপরই বা এত কঠোর নিয়মের আদেশ কেন? ঠাকুরের মুখ হইতে কোনও প্রকারে একবার জাতিভেদের একটু দোষ প্রকাশ হইলেই, আমার পক্ষে এ সকল কঠোরতার যে ব্যবস্থা, তাহা একেবারে উল্টাইয়া লইব; এইরূপ স্থির করিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমাদের দেশে যে একটা জাতিভেদ প্রথা আছে, তা কি থাকা ভাল?”

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—“জাতিভেদ প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সে ত সর্বত্রই রয়েছে। প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুষ্যসমাজে নয়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই ভিতরে আছে দেখতে পাবে। এই জাতিভেদ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডভরা। কোথাও ইহা কেহ অতিক্রম করতে পারে না। বর্তমান সময়ে যে জাতিভেদ এ দেশে প্রচলিত রয়েছে, তাহা সমাজগত। কোনও দেশে বা ব্যবসাগত, আবার কোথাও বা মর্যাদাগত বা অবস্থাগত দেখতে পাওয়া যায়। যে ভাবেই হউক না কেন, জাতিভেদ সকল দেশেই, মনুষ্যসমাজে সকল জাতির ভিতরেই আছে। কিন্তু ঋষিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন, তাহা অন্য প্রকার, তাহা গুণগত। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ভেদে যে জাতিভেদ, তাই ঋষিরা স্বীকার করেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে, এখন শূদ্র জাতির ভিতরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির ভিতরেও বিস্তর শূদ্র দেখা যায়। সামাজিক জাতি এক প্রকার, আর প্রকৃতিগত জাতি অন্য প্রকার। পরমহংস

অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহই এই জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারে না। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বুদ্ধি থাকলেই সেখানে জাতিবুদ্ধি থাকবে। হিংসা, লজ্জা, মান, অপমান, ভাল-মন্দ বুদ্ধি যত কাল আছে, মানুষ তত কাল কোন প্রকারেই জাতিভেদ অতিক্রম করতে পারে না। যার তার হাতে খেলেই, জাতিবুদ্ধি যায় না; বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হ'য়ে থাকে। যার পাক করা অন্ন আহাৰ করা হয়, তার শারীরিক ও মানসিক সমস্ত ভাব, আহাৰ্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। সাধারণ চক্ষু মানুষ তা দেখতে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সত্য; এ সকল এক বিষম সমস্যা।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কোন অবস্থা লাভ করলে, যার তার হাতে পাওয়ায় কোন অনিষ্ট হয় না?”

ঠাকুর বলিলেন—“যে অবস্থা লাভ করলে মানুষ সমস্ত বস্তুতে একেরই অস্তিত্ব দর্শন করে। যিনি নিত্যশুদ্ধ, মঙ্গলময়, পতিতপাবন, যার নামেতে মহাপাপী উদ্ধার হ'য়ে যায়, তিনি যেখানে অবস্থান করছেন প্রত্যক্ষ হয়, তা কি কখনও আর অপবিত্র মনে করা যায়? বিষ্ঠাতে চন্দনেতে যিনি নিজেই সেই ইষ্টদেবতারই অধিষ্ঠান প্রকাশিত দেখতে পান, তিনি কি তা পরম পবিত্র তীর্থ মনে না ক'রে থাকতে পারেন? বস্তুবিশেষে তাঁর আর ভেদবুদ্ধি হবে কি ক'রে? এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ হ'লে, সর্বত্র সকল কার্য্যেই তিনি ভগবল্লীলা দর্শন করেন, সর্বত্রই তিনি অমৃত ভোজন করেন; তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তা না হ'লে, যত কাল ভেদবুদ্ধি আছে, তত কাল মুচি, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ একাকার ক'রে, যার তার হাতে খেলেই জাতিভেদ যায় না। ভিতর হ'তে জাতিবুদ্ধি যাওয়া সহজ কথা নয়, বড়ই কঠিন।”

প্রসাদসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও শ্যামাক্ষেপার কথা।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“সাধারণের পক্ষাঘ্ন ভোজনে যে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা বল্লেন, ঠাকুরের প্রসাদ ভোজনেও কি সেইরূপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে?”

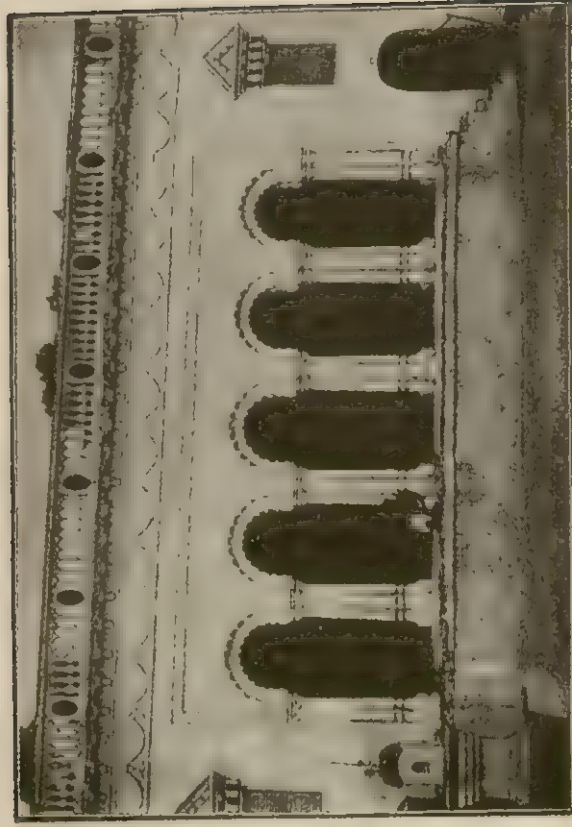
ঠাকুর বলিলেন—“প্রসাদ ভোজন ত মহাভাগ্যের কথা, তাতে পরম কল্যাণই হ'য়ে থাকে। কিন্তু রান্না ক'রে ঠাকুরের নিকটে ধ'রে দিলেই যে ঠাকুর তা গ্রহণ করবেন, আর প্রসাদ হবে, তা ত নিশ্চয় বলা যায় না। বহুকাল পূর্বে বাল্যাবস্থায় এই শাস্তিপুরে একটি মহাত্মাকে দেখেছি, সকলে তাঁকে শ্যামাক্ষেপা ব'লে ডাকত। শ্যামাক্ষেপা কোন

সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন, তা তাঁর চাল চলন, আচার ব্যবহারে বা কথাবার্তায় বুঝবার যো ছিল না। একস্থানে তিনি কখনও থাকতেন না। প্রায় নিয়তই রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন। আহারের জন্ত ঠাকুরের ভোগ সর্ব্বার সময় বুঝে, অকস্মাৎ শ্যামাক্ষেপা কোনও বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হতেন। অনেক সময়ে মেয়েদের অসাবধানতা বশতঃ, ভোগরাশী সময়ে কোনও প্রকার অনাচার হ'য়ে পড়লে, প্রসাদ না পেয়েই শ্যামাক্ষেপা উঠে পড়তেন এবং গালাগালি দিয়ে ব'লে যেতেন, 'আরে, ভোগে এই গন্ধ পাচ্ছি; রাশীর সময়ে রাশুনী এই ক'রেছিল, এই হ'য়েছিল, আজ ইহা প্রসাদ হয় নাই; ঠাকুর যে ইহা সেবা করেন নাই, অনাহারে রয়েছেন; শীত্র গিয়ে আবার রাশী ক'রে দে।' আশ্চর্য্য এই যে, তিনি যেমন যেমনটি ব'লে যেতেন, অমুসন্ধানে জানা যেত, তা যথার্থ; মেয়েরা লজ্জায় ম'রে যেত। শ্যামাক্ষেপা কখন কার বাড়ী যেয়ে প্রসাদ পেতে উপস্থিত হন, এই ভয়ে মেয়েরা সশঙ্ক থাকতেন এবং অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে ব্যবস্থামত ভোগ রাশী করতেন। আমাদের বাড়ীতেও একবার এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া ব্যতীত, লোকালয়ে যাবার তাঁর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

শান্তিপুৰ নিবাসী কোন একটি গোস্বামী একবার পুরীধাম হ'তে লিখে জানালেন, 'শ্যামাক্ষেপা শ্রীক্ষেত্রে কিছুদিন যাবৎ এসেছেন। প্রায়ই তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে দেখতে পাই।' অথচ দেখা গিয়েছিল, শ্যামাক্ষেপা সেই সময়ে শান্তিপুৰেই ছিলেন। শ্যামাক্ষেপা আমাকে দেখতে পেলে, ছুটে এসে ধ'রে ফেলতেন, কয়েক সেকেন্ড ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকায় থেকে বলতেন, "কাল কুচুক্চে, লাল টুকটুক্চে, সাদা ধপ্ধপে; আর এই হল্দ্দে কিরে ভাই, আর এই হল্দ্দে কিরে ভাই, পুনঃপুনঃ এইরূপ ব'লে এক দিকে ছুটে অদৃশ্য হতেন। কিছুকাল পরে শ্যামাক্ষেপা কখন কোথায় যে চ'লে গেলেন, তাঁর আর খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সন্ন্যাস গ্রহণ না ক'রে, ঘরে থেকে কি কেহ এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ করতে পারেন না?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব পারেন। ভিতরে সমস্ত বাসনা কামনা থাকতে, সাময়িক উৎসাহে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, কঠোর বৈরাগ্যের পথে চলা বুদ্ধিমানের কৰ্ম্ম নয়। ছুর্গের ভিতরে থেকে যেমন নিরাপদে যুদ্ধ করা যায়, সংসারে থেকেও সেই প্রকার বৈধ উপায়ে কৰ্ম্মক্ষয় করা সহজ। কৰ্ম্মক্ষয় না হ'লে ত কিছুই হবার যো নাই। সন্ন্যাস একটা কথার



କିରୀଟାମହଲର କୀର୍ତ୍ତିର ମନ୍ଦିର

কথা নয় বা মত নয়, মানুষের ভিতরেরই একটা অবস্থা ; ভগবানে সম্যক্ প্রকারে আত্ম-সমর্পণই সন্ন্যাস ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“উৎপাতশূন্য স্থানে থেকে নিরুদ্বেগে ভগবানের উপাসনা করতে হয় শুনেছি । সংসারে নানা প্রকার বিষম প্রলোভনের মধ্যে বাঘ মহিষের সঙ্গে লড়াই করে যাহারা স্থিরভাবে ভগবতুপাসনা করতে অসমর্থ, তাহারা কি করবেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“সম্মুখ যুদ্ধ আর কয় জনে করতে পারেন ? বীরত্বের পরিচয় দেওয়া ত আর ভগবতুপাসনার তাৎপর্য নয় । সংসারের প্রলোভন অতিক্রম ক’রে নিরুপদ্রবে যাঁরা ভজন সাধন করতে না পারেন, তাঁরা অবশ্যই অন্য উপায় নিবেন । ‘সংসারে থেকে ধর্ম করা উচিত,’ লোকে বলে বটে ; কিন্তু যাঁরা তা না পারেন, নিজেকে নিতান্ত দুর্বল মনে করেন, তাঁরা যে অবস্থায় যেখানে যেয়ে ধর্মলাভ করতে পারেন তাই করবেন । এ ভিন্ন আর উপায় কি ? সকলকেই যে এক পথ ধ’রে চলতে হবে, এরূপও কিছু নয় । প্রকৃতি ভেদে, অবস্থা ভেদে, পথও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবলম্বন করা আবশ্যক হ’য়ে থাকে ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও কি আবার সাধারণ কর্মবন্ধন থাকে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“বাড়ী ঘর, টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, এ সকলকে সংসার বলে না । এ সকল ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হয় না । দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার । এই দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হ’লে সমস্তই বিড়ম্বনা । যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে, ততদিনই কর্ম থেকে যায় । বাহিরে একটা সন্ন্যাস গ্রহণ করুন আর নাই করুন, কর্ম করতেই হবে । ভগবানকে লক্ষ্য রেখে কর্ম ক’রে গেলে, অচিরে সেই কর্ম শেষ হ’য়ে যায় ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“জীব যখন পরাধীন, নিজ ইচ্ছায় কিছু করে না, তখন তার আবার বন্ধন কেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“জীব সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হ’লেও, বাসনা কামনা যা কিছু তার মনে নিয়ত উঠছে তাই তার বন্ধনের হেতু হয় । এই বাসনাই কর্ম, এ ত আর স্বাধীন পরাধীনের অপেক্ষা রাখে না । আত্মার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা কামনা ক্ষয় হয় ; উহা ক্ষয় হবার সময় ইহা বেশ বুঝতে পারা যায় ।”

শান্তিপুরের রাস ।

আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা । সকাল বেলা হইতেই সমস্ত শান্তিপূরবাসী ভগবানের ৩০শে কার্তিক, রবিবার, রাসোৎসব স্মরণ করিয়া যেন নাচিয়া উঠিলেন । সকল গোস্বামীপ্রভূর ১৫ই নভেম্বর । বাড়ীতেই, কোথাও শ্যামসুন্দর, কোথাও রাধাগোবিন্দ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বহুকালযাবৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন । আজ সকলে আপন আপন বাড়ীর ঠাকুরকে পরিপাটা করিয়া সাজাইতে, পরম উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইয়াছেন । শান্তিপুরে আজ আনন্দের সীমা নাই ।

ঠাকুর বলিলেন—“ঢাকার জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দোলযাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন, এবং শান্তিপুরের রাসযাত্রা দেখ্‌বার জিনিস । এর তুলনা আর কোথাও নাই । চক্ষুে যাঁরা না দেখেছেন, কিছুতেই তাঁদের বুঝান যায় না । এ সকল উৎসবে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের ভিতরের সমস্ত অশান্তি, উদ্বেগ নষ্ট হ’য়ে গিয়ে চিত্ত প্রফুল্ল হ’য়ে উঠে ।”

সন্ধ্যার সময়ে আমরা সকলে রাসোৎসব দেখিতে বাহির হইলাম । ঠাকুর প্রথমে নিজবাড়ীর প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন । সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শ্যামসুন্দরের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । দরদরধারে চক্ষের জল পড়িয়া ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল । প্রায় ১৫২০ মিনিট কাল একভাবে অবিশ্রান্ত কান্দিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন । একটু স্থির হওয়ার পর শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া, মন্দির হইতে বাহির হইলেন । বড় রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া আমরা রাসযাত্রা দেখিতে লাগিলাম । বিগ্রহ সকলের বহুমুখ্য বেশভূষা ও সজ্জার পারিপাটা দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম । আহা ! যিনি ভগবদ্ বুদ্ধিতে আপন ঠাকুরকে এ সকল ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য হইয়া গিয়াছেন ! আমি এ সকল বিপুল অর্থব্যয়ের আড়ম্বর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেছি ।

ঠাকুরের মুখে শ্যামসুন্দরের কথা ।

একটু অধিক রাত্রিতে ঠাকুর নিজবাড়ীর শ্যামসুন্দরের কথা বলিতে লাগিলেন—

“একবার শ্যামসুন্দর এসে আমাকে বললেন, ‘ওরে আমি সোণার চূড়ো পরবো ; আমাকে একটি চূড়ো গড়িয়ে দে না ।’ আমি বললাম, ‘আমি তোমাকে বিশ্বাস টিঙ্গাস করি না ; যারা করে, তাদের গিয়ে বল । আমি টাকা কোথায় পাব ?’ শ্যামসুন্দর বললেন, ‘ছাখ্, তোর খুড়ীমাকে বল্গে, তাঁর বাঁপির ভিতরে টাকা আছে । তা নিয়ে নে না ।’ পরে খুড়ীমাকে এ বিষয় বলাতে, খুড়ীমাও বললেন, ‘ওরে কাল শ্যামসুন্দর এসে আমাকে স্বপ্নে বললেন—‘ওগো, আমাকে চূড়ো গড়িয়ে দে না ।’ আমি বললাম—‘আমি কেথায়



শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর খৌউ

টাকা পাব ? আমার ত কিছু নাই ।’ শ্যামসুন্দর বল্লেন—‘ওগো, ৪০।৫০টি টাকা কি তুই আর দিতে পারিস্ না । দেখ্ না, না পারিস্ ত বিজয়কে বল্গে, সে দেবে ।’ খুড়ীমা এই ব’লে খুব কাঁদতে লাগলেন, আর বল্লেন, ‘৬৭টি টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলাম, তা কেউ জানে না ।’ ঐ টাকা খুড়ীমা দিয়েছিলেন, আমি সেই টাকা দিয়ে টাকা হ’তে সোণার চূড়ো গড়িয়ে দিই । আজ শ্যামসুন্দর সেই চূড়ো পরেছেন । সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম, শ্যামসুন্দর উকি মেরে দেখে আমাকে বল্লেন, ‘ওরে একবার দেখে যা না, চূড়ো প’রে আমি কেমন সেজেছি !’ আমি বল্লাম, ‘আমি আর কি দেখব, আমি ত আর তোমাকে মানি না ।’ শ্যামসুন্দর বল্লেন, ‘তাতে আর কি, নাই বা মানুলি, একবার দেখতেও কি দোষ ?’ পরে আমি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে, তাঁর স্নেহমাথা স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখে, একেবারে মুগ্ধ হ’য়ে পড়লাম । শ্যামসুন্দর একটু হেসে বল্লেন, এ কি, তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস্ না ?’ আমি বল্লাম, ‘ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এতকাল এত ঘুরালে কেন ? সমস্ত ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন ?’ শ্যামসুন্দর বল্লেন, ‘তাতে আর তোর কি ? ভেঙ্গেও ছিলেম আমি, এখন আবার গ’ড়েও নিচ্ছি আমি ; তোর তাতে আর কি হয়েছে ? ভেঙ্গে গড়লে আরও কত সুন্দর হয় জানিস্ ?’

এই কথার পর ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—‘প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মা-ঠাকুরাণীকে দেখতে আমি বাড়ী আস্তাম । একবার এই ঘরে মধ্যাহ্নে ব’সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বল্লেন—‘ত্যাখ্, আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, আর জল দেয় নাই ।’ আমি অমনই খুড়ীমাকে ডেকে বল্লাম, ‘খুড়ীমা ! তোমাদের শ্যামসুন্দর বল্ছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দেও নাই ।’ খুড়ীমা আমাকে বল্লেন, ‘হাঁ, শ্যামসুন্দর ত আর লোক পেলেন্ না ; তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কি না, তাই তাকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয় নাই ।’ আমি বল্লাম, ‘আচ্ছা, অনুসন্ধান ক’রে দেখ না ।’ খুড়ীমা অমনই অনুসন্ধানে জান্লেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই । এইরূপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বল্লেন । পূজারী কোন প্রকার অনাচার বা ত্রুটি করলে, শ্যামসুন্দর এসে ব’লে যেতেন । শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখে আস্ছি ; আমি না মানলেও, তিনি কখনও আমাকে ছাড়েন নাই ।”

ভাবের অমর্যাদা—নীলকণ্ঠের যাত্রাভিনয় বন্ধ ।

ঠাকুর আমাদেরকে সঙ্গে লইয়া দেশপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যাত্রাগান শুনিতে, একটি ভদ্রলোকের বাড়ী পহঁছিলেন। শাস্তিপুরের গণ্যমান্য অনেক গোস্বামী প্রভৃৎ এই গান শুনিতে উপস্থিত হন। যাত্রা আরম্ভ হইলে ঠাকুর ভাবাবেশে চলিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অশ্রু কম্প পুলকাদি একসঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িল। নীলকণ্ঠ উহা দর্শন করিয়া মহা উৎসাহে কীর্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠও মাতিয়া গিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। তখন গুরুভ্রাতাদের ভিতরেও ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এ সময়ে গোস্বামী প্রভুরা সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশপূর্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এরা ভারি গোলমাল করছে; শীঘ্র এদের থামায়ে দাও!” ভাববিরোধী দলের প্রতিকূল চেষ্টা দেখিয়া, নীলকণ্ঠ গান বন্ধ করিলেন এবং বলিলেন, ‘যে স্থলে এসব ভাবের আদর নাই ও ভক্ত মহাপুরুষের মর্যাদা নাই সে স্থলে আমি গান করি না। সেখানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি।’ এই বলিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর আমাদের সকলকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

অগ্রহারণ।

সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর কথা।

আহারান্ত সকলে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, অবসর পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

১লা—এই অগ্রহারণ,

“হিন্দুদের মঠে মন্দিরে সর্বত্রই ত দেবদেবীর মূর্তি—শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ—

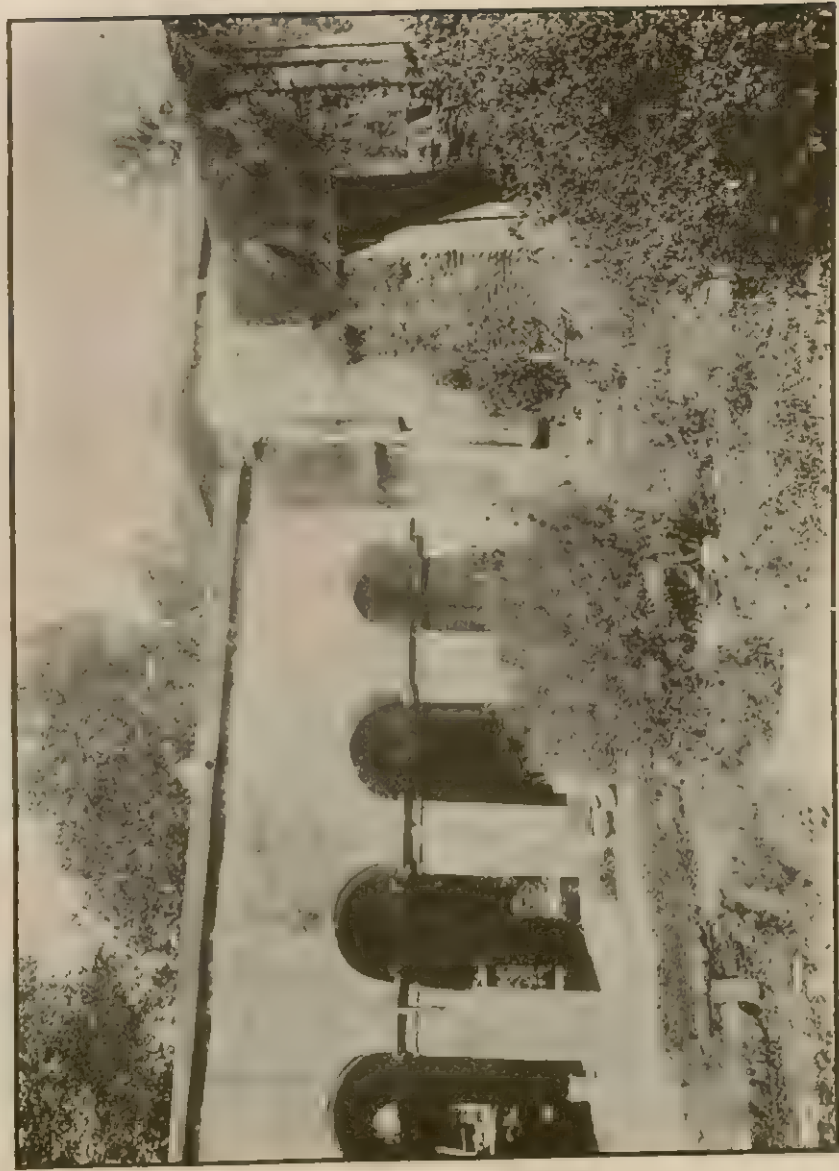
১৬—২০ নভেম্বর।

এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই; গেণ্ডারিয়ার সমাধি-মন্দিরে মাতাঠাকুরাণীর

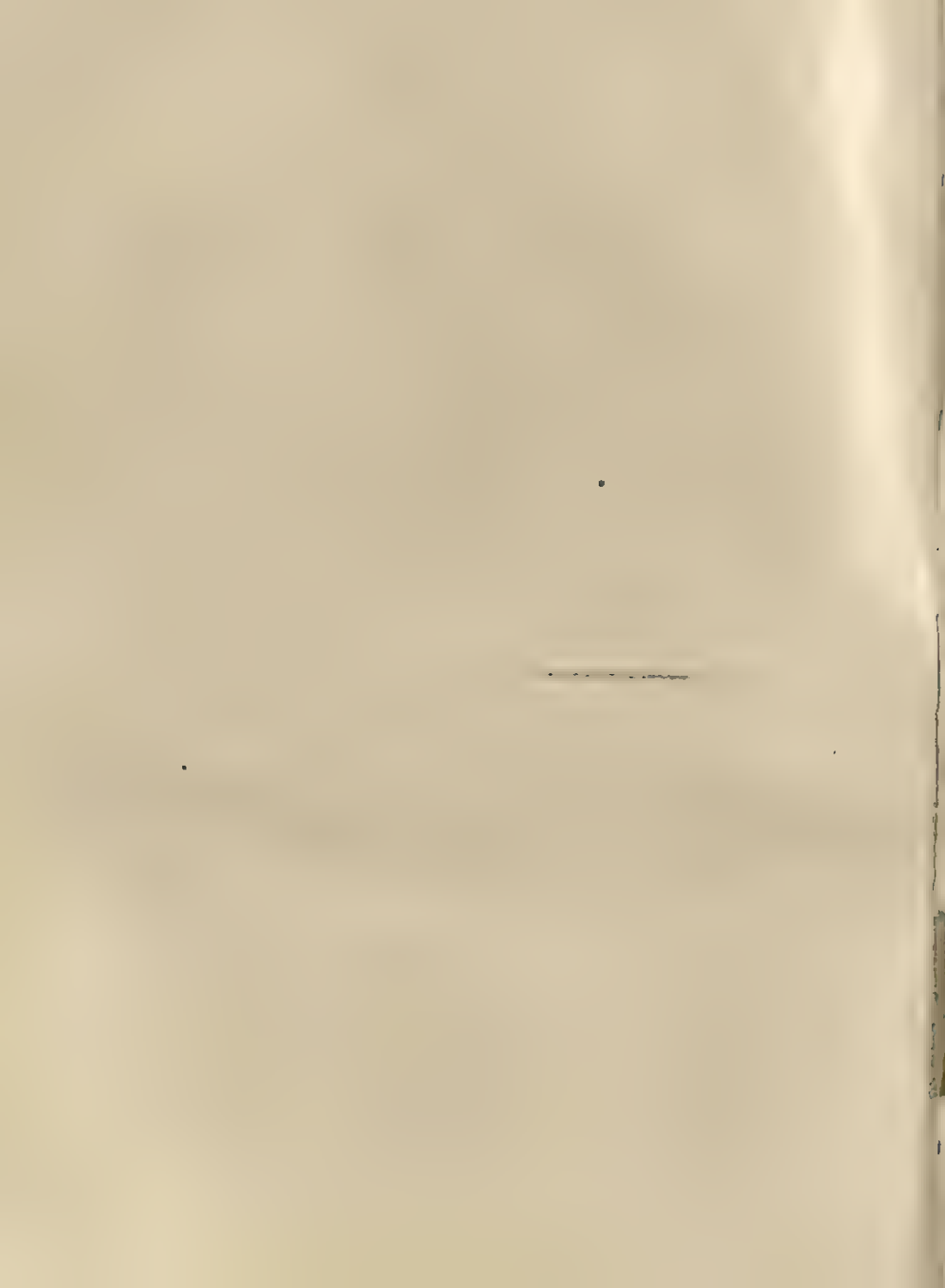
ফটোর সহিত যে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছেন, ঐরূপ পটপ্রতিষ্ঠা কোথাও ত দেখি নাই!”

ঠাকুর বলিলেন—“কেন? কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত আছে—বহুকাল পূর্বের আমি তা দেখে এসেছিলাম। আরও দুই একটি স্থানে আছে।”

একটি গুরুভাই বলিলেন—“ভগবানদাস বাবাজী কি প্রকারের সিদ্ধপুরুষ ছিলেন? সিদ্ধ শুনিলেই ত ভয় হয়!”



কালমার সিন্ধু ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম



ঠাকুর বলিলেন—“দেশে সাধারণের সংস্কার এরূপই বটে। “সিদ্ধ” শুনলেই লোকে একটা ভয়ানক কিছু মনে করে। ভগবানদাস বাবাজী বৈষ্ণব পরমহংস ছিলেন। ইনি যেন বিনয়ের অবতার ছিলেন। কারও দোষ কখনও দেখতে পেতেন না। দোষের কথা কেহ তাঁর কাছে বললে, উনি কেঁদে ফেলতেন, সকলের চেয়ে নিজেকে হীন মনে করতেন।”

গুরুতাইটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি ত ব্রাহ্ম অবস্থায় ওখানে গিয়াছিলেন; বাবাজী কিরূপ ব্যবহার করিলেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“প্রচারক অবস্থায়, আরও ছুটি ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে, সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করতে কালুনায়ে গিয়েছিলাম। আমরা পৌঁছিতেই বাবাজী সাষ্টাঙ্গ হ’য়ে প্রণাম ক’রে বসতে আসন দিলেন। পথশ্রান্তিতে আমার খুব পিপাসা পেয়েছিল; বাবাজীকে বলাতে, বাবাজী নিজ কমণ্ডলু ধুয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল এনে, আমাকে পান করতে দিলেন। কমণ্ডলুটি বাবাজীরই বুঝতে পেরে, আমি বললাম ‘বাবাজী! আমি যার তার হাতে খাই, জাত টাত কিছুই মানি না—ব্রহ্মজ্ঞানী; আমাকে অল্প একটা পাত্রে জল দিন।’ বাবাজী খুব কাতরভাবে করযোড়ে বললেন, ‘প্রভো আমার আকাজক্ষায় বাধা দিবেন না। জাত কুল থাকতে কি কখনও ভক্তি লাভ হয়? ব্রহ্মজ্ঞানই ত সমস্ত ধর্মের মূল। আপনি দয়া ক’রে এই পাত্রেই জল পান করুন।’ আমি জল পান ক’রে কমণ্ডলুটি রাখতেই, বাবাজী সেটি নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে, সমস্তটা জল পান করলেন। কয়েকটি ভদ্রলোক ঐস্থানে বসে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক জন বললেন, ‘বাবাজী! এ কি করলেন? ইনি যে পৈতা ফেলে দিয়েছেন, আর ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।’

বাবাজী বললেন, ‘আমার অদ্বৈতরও ত পৈতা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিন্তু দেখ, সেখানেও আমার গৌসাই আচার্য্য।’ ভদ্রলোকটি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ ক’রে বললেন, ‘তা ঠিকই বলেছেন বাবাজী। আচার্য্য! আচার্য্য কেমন দেখতে ত পাচ্ছেন! কেমন জামা, জুতো, ধুতি, চাদর! বাঃ!’ শুনিয়া বাবাজীর চক্ষে জল এল, তিনি বললেন, ‘আহা! প্রভুকে পরিপাটি ক’রে সাজান, এ ত আমাদেরই কর্তব্য। এমনই ছুঁভাগ্য যে তা পারলাম না! প্রভু নিজের প্রয়োজনমত জিনিস নিজেই সংগ্রহ ক’রে নিচ্ছেন, তা দেখে যে একটু আনন্দ করব, হয় হয় সে অদৃষ্টও ঘটল না।’ এই

ব'লে বাবাজী বালকের মত হ হ শব্দে কাঁদতে কাঁদতে একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়লেন।

বাবাজীর ওখানেই 'নামব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠিত দেখি ; তিনি খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার নিত্য সেবা পূজা করতেন।"

বৈরাগ্য ও ত্রিতাপ সম্বন্ধে উপদেশ।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি ভাবে চলিলে প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয় ? আর বৈরাগ্য লাভ হইলে, কিসে তাহা জানা যাইবে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“বিষয়ের আসক্তি নষ্ট না হ'লে, ত্রিতাপ না গেলে, যথার্থ বৈরাগ্য লাভ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক, মান অপমানাদিতে যত কাল কর্তব্য কার্য্য করতে বাধা জন্মাবে, তত কালই ত্রিতাপ নষ্ট হয় নাই—জান্বে। ততদিন পর্য্যন্ত খুব নিয়মে থাকতে হয়। দিবসটিকে নানাকার্য্যে বিভাগ ক'রে খুব নির্ভার সহিত তাতে নিযুক্ত থাকতে হয়। কিছুতেই ঐ সব নিয়মের অন্যথাচরণ করতে নাই। এই প্রকারে চললেই, ক্রমে ত্রিতাপ নষ্ট হ'য়ে যায়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“ত্রিতাপ কি ? কষ্টই ত তাপ ?”

ঠাকুর বলিলেন—“শুধু কষ্ট কেন ? বিষয়ের অনুভূতি সমস্তই তাপ। ছুঃখ যেমন তাপ, সুখও তেমনই তাপ। নিরানন্দ যেমন তাপ, আনন্দও তেমনই তাপ। সুখে ছুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে, মানে অপমানে চিন্তকে যত কাল স্পর্শ করবে, ততকাল যথার্থ ধর্ম্মের অঙ্গুরই জন্মায় নাই—জান্বে।”

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“বিষয়জ্ঞান ও তাপবোধ না থাকলে, লোকে কোনও কার্য্য করে কিরূপে ?”

ঠাকুর বলিলেন—“কর্তৃত্বাভিমান যত কাল আছে, তাপও ততকাল আছে। কর্তৃত্বাভিমান না গেলে, মানুষ মুক্ত হয় না। মুক্ত হ'লেও মানুষের কর্ম্ম দেখা যায় বটে, কিন্তু তা বালক—ক্রীড়াবৎ, উন্মাদ—নৃত্যবৎ। একটা যন্ত্রের মত দেহদ্বারা তাদের কার্য্যগুলি অস্থিতি হ'য়ে থাকে মাত্র।”

ছেলেবেলায় উৎপীড়ন দর্শনে ঠাকুরের মূর্ছ।

আজ হৃদান্ত প্রতাপশালী অত্যাচারী, শাস্তিপুত্রের একটি জমিদারের প্রকাণ্ড ভবনের জনমানবশূন্য শাশানতুল্য পরিণাম দেখিয়া, ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—“একসময়ে এই বাড়ীর

কতই জাঁক জমক ছিল! জমিদার * * * বাবুর ভয়ে, এ বাড়ীর ধার দিয়ে কেউ চলতে সাহস পেত না। শান্তিপুরবাসীরা এঁর অত্যাচারের আশঙ্কায় সর্বদা শঙ্কিত থাকতেন। আজ তিনিই বা কোথায়, আর তাঁর সাধের বাড়ীই বা কোথায়? দেখতে দেখতে কিছুকালের মধ্যে একেবারে সমস্ত ছারখার হ'য়ে গেল। কিছুই আর চিরদিন এক অবস্থায় থাকে না, সঙ্গেও কিছুই যায় না; তবু একে অন্ধকে পীড়ন ক'রে সুখী হ'তে চায়, বড় লোক হ'তে চায়! পরিণাম যে কি, তা একবার কেউ ভাবে না!”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এই জমিদার কি প্রকার অত্যাচারী ছিলেন? অত্যাচার ক'রে তাঁর কি দুর্দশা ঘটেছিল?”

ঠাকুর বলিলেন—“এঁর এক দিনের অত্যাচার আমি চক্ষে দেখেছি। মনে হ'লে এখনও শরীর শিউরে উঠে। তখন আমার বয়স ছয় সাত বৎসর; সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে করতে, একদিন এই বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হ'য়ে শুন্লাম, জমিদার বাবু টাকার জন্য একটি গরীব লোকের উপর ভয়ঙ্কর পীড়ন করছেন। আমি খেলা ফেলে ছুটে গিয়ে এই বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দেখি, একটি লোকের উপরে বাঁশডলা দিচ্ছে, লোকটি যন্ত্রণায় হাত পা আছড়াচ্ছে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে, আর সময়ে সময়ে তার দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দেখেই আমি উন্মত্তের মত হ'য়ে, একেবারে জমিদারের সম্মুখে লাফিয়ে প'ড়ে, খুব চীৎকার ক'রে তাঁকে বলতে লাগলাম—‘তুমি ডাকাত! ডাকাত!! লোকটি যে ক্রেশে ম'রে গেল; তোমার লাগছে না? ভাল চাও, এখনই একে ছেড়ে দাও, এখনই একে ছেড়ে দাও।’ এই কয়টি কথা ব'লেই, আমি মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। জমিদার বাবু কিন্তু তখনই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেরা গিয়ে বাড়ীতে আমার মূর্ছার খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে আমার জ্ঞান হ'লে, জমিদার বাবু আমাকে বললেন, ‘ওহে, তোমার কথাতেই ঐ বেটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ভাল, তোমার ত খুব সাহস দেখছি! আমাকে তুমি ধমক দিলে! একটুকুও ভয় হ'ল না?’ আমি বললাম, ‘ভয় কেন করব? আমি ত ঠিকই বলেছি! জান না আমি গৌসাঁইদের ছেলে?’

এর কিছুকাল পরেই জমিদার বাবু, একটি অসহায়া ব্রাহ্মণ বিধবার বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে, তাঁর যথাসর্বস্ব লুট করলেন। বিধবাটি রান্না চড়ায়েছিলেন; ভাতের হাঁড়িটি লাথি মেরে ফেলে দিলেন, পরে তাঁর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করলেন। বিধবাটি আর কি করবেন? এই মাত্র বললেন—‘আমি নিতান্ত অসহায়া বিধবা, হায়, হায়, আমার

উপর ভূমি এ ব্যবহার করলে ! আচ্ছা, আমি আর কাকে বলব ? আমার আর কে আছে ? ভগবানকেই বলছি, তিনিই এর বিচার করবেন। যেমন যেমনটি আমাকে ভূমি করলে ঠিক তেমন তেমনটি তোমার স্ত্রীরও ঘটবে।’ আশ্চর্য্য এই যে, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই জমিদার বাবু একটি শক্ত মামলায় প’ড়ে, একেবারে সর্বস্বান্ত হ’লেন ; কঠিন পরিশ্রমের সহিত জমিদারবাবুর জেল হ’ল ; জেলে তিনি ভুগতে ভুগতে মারা গেলেন। একদিন তাঁর বিধবা স্ত্রী, হবিষ্যাস করতে রান্না চাপিয়েছিলেন, শত্রুপক্ষের লোকেরা সেই সময়ে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ ক’রে সমস্ত লুট করল। আশিস্ত ভাতের সঙ্গে পিতলের হাঁড়িটি একজন লাথি মেরে ফেলে দিয়ে তাও নিয়ে গেল। নীচ প্রকৃতি ছোটলোকদের নানাপ্রকার অকথ্য অত্যাচারে ভুগে, জমিদারের স্ত্রী কান্দতে কান্দতে বাড়ী হ’তে বের হ’য়ে পড়লেন। কথার বলে, ‘দুঃখ পেয়ে হাড়িনী শাপে, এড়াতে পারে না বামুনের বাপে।’ কথাটা বড়ই সত্য। নিতান্ত অধম অপদার্থ ছুরাচার ব্যক্তিও যদি দারুণ ক্রেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, উৎকৃষ্ট ধার্মিক ব্রাহ্মণও তার হাত এড়াতে পারেন না।”

সমস্তই অসার—ধর্ম্মই সার।

ইহার পর ঠাকুর বলিলেন—“কিছুই ত থাকে না। সমস্তই অসার, একমাত্র ধর্ম্মই সার। সংসারে সুখের জন্ম, অর্থের জন্ম, কখনই অসত্য পথ অবলম্বন করবে না, ধর্ম্ম ত্যাগ করবে না। এতে সংসার থাকে থাক্, যায় যাক্। বরং ভিক্ষা ক’রে সারাটি জীবন কাটায়ে দিবে। পতির প্রতি যেমন সতীর, ধর্ম্মের প্রতিও সেই রকম সাধকের সর্বদা দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। স্বয়ং ভগবানই সকল অবস্থায় ধর্ম্মার্থীকে রক্ষা ক’রে থাকেন।”

নাম ও ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ।

শান্তিপুরে আসিয়া অবধি এখানে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতেছে। আমার বেশ দেখিয়া অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন—“তুমি কোন্ ভাবের উপাসক ?” আমি তাঁহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারি না। কারণ আমি কোনও বিশেষ একটা ভাব লইয়া সাধন করি না। নানাপ্রকারের ভাবই আমার ভিতরে সময়ে সময়ে আসে আবার চলিয়া যায়। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—“কোন্ ভাবের উপাসক, কেহ জিজ্ঞাসা করলে আমরা কি বলব ?”

ঠাকুর বলিলেন—“যার যে ভাব ভাল লাগে, সে তাই বলবে। বিষ্ণু ভাল লাগলে বৈষ্ণব বলবে, শিব ভাল লাগলে শৈব বলবে, এইরূপ।”

আমি বলিলাম—“এক সময়ে একটা ভাব ভাল লাগে, আবার একটু পরেই অন্য আর একটা ভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। একটা কিছু স্থিরভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি না। এরূপ চঞ্চলতা হয় কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“নানাপ্রকার অবস্থায় প’ড়ে, সংসর্গেতে ও সন্দেহেতে, পূর্বাভাস এসে উপস্থিত হয়। যতকাল কর্ম আছে, ততকাল কেহই কোন একটাতে স্থির হ’তে পারে না; এরূপ চঞ্চলতা ত্যাগ হওয়া অসম্ভব হয়। নামই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, নামই ধ’রে থাক। এই নামেরই ভিতর দিয়ে ভগবানের অনন্ত রাজ্য, অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব ও অনন্ত লীলা প্রকাশ পাবে। অনন্ত রাজ্যে অনন্ত দিক্ দিয়ে অনন্ত ভাবে চলতে হবে। কোনও একটি বাদ্ পড়লে, পরে মনে হ’তে পারে, ওদিক দিয়ে ওভাবে চললে আরও সুবিধা হ’ত। এ প্রকার আক্ষেপ পরে আর না আসে, সেজন্য নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে, নানা ভাবে নানা দিক্ দিয়ে চলা সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। এতে সমস্ত জানাও হয়।”

এসব শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“মন ত নিতান্ত চঞ্চল, তার উপরে বাহিরের উপসর্গও বিস্তর, স্থির হ’য়ে নাম করব কি উপায়ে? আমাদের কি কিছু ধ্যানের ব্যবস্থা নাই?”

ঠাকুর বলিলেন—“বৈধ ধ্যান ও রাগের ধ্যান, এই দুই প্রকার ধ্যান আছে বটে—তবে আমাদের সে সকলের কোনও প্রয়োজন নাই। মনটিকে কোন একটি ‘চক্রে’ বসায় এবং চক্ষের দৃষ্টি কোন একটি বস্তুতে স্থির রেখে নাম কর্তে হয়, এরূপ করলে অনেক উৎপাত হ’তে রক্ষা পাওয়া যায়। কার্যটিও সকল অবস্থায়ই প্রায় ঠিক চলে। চক্রে মন রেখে নাম কর্তে কর্তে, একটুকু স্থির হ’লেই দেখা যায়, চক্রে ভিতর একটি রূপের প্রকাশ হয়; যেমনই প্রকাশ, অমনই টপ্ ক’রে ধরা। কল্পনা ক’রে আমাদের কোনও রূপের ধ্যান নাই। ভগবানের রূপ অনন্ত। কোন রূপে তিনি কার কাছে প্রকাশিত হবেন, কে বলতে পারে? আর এক রূপেই যে তিনি সর্বদা দর্শন দিবেন, তারই বা নিশ্চয় কি? শুধু স্বাস প্রস্থাস ধ’রে নাম ক’রে যাও, তাতেই সমস্ত ঠিক হ’য়ে আসবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“নাম কর্তে কর্তে মন স্থির হবে, না মন স্থির করে নাম কর্তে হবে?”

ঠাকুর বলিলেন—“তা কি আর কেউ পারে? ভগবানের নাম, স্বাস প্রস্থাস ধ’রে কর্তে কর্তে, তাঁরই কৃপায় মন স্থির হ’য়ে আসে। ওরূপ করলে ক্রমে সবই বুঝতে পারবে।”

নয় বৎসর বয়সে ঠাকুরের দয়া ও উদারতা।

আজ বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রায় দেড় মাইল দূরে নির্জন স্থানে একটি জীর্ণ কুটারে উপস্থিত হইলাম। একটু সময় সেখানে বসিয়া ঠাকুর বলিলেন—“বহুকাল পূর্বে এই কুটারে একটি হীনজাতি ভজনানন্দী বৈষ্ণব বাবাজী ছিলেন। সময়ে সময়ে বাড়ী হ’তে আমি তাঁকে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ এনে দিতাম। অনেক দিন হ’লো, তিনি দেহ রেখেছেন। তারপর হ’তে এই স্থান শূন্য প’ড়ে আছে।”

বাবাজীর সহিত ঠাকুরের কোথায় কি ভাবে পরিচয় হইয়াছিল জানিতে ইচ্ছা হওয়ায় ঠাকুরকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—“আমার ছেলেবেলা নয় বৎসর বয়সের সময়, একটি সমারোহের কার্যে প্রসাদ পেতে বাবাজী আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের ভোজনের পূর্বে অপর জাতিদের ত আর দেওয়া হয় না। বাবাজী দরজায় দাঁড়ায়ে ছুঁতিন বার খাবার চাইলেন, তাঁকে বলা হ’ল, ‘একটু অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণেরা বস্লেই আপনাকে খাবার দিচ্ছি।’ বাবাজী আর অপেক্ষা না ক’রে চ’লে যেতে প্রস্তুত হ’লেন। আমি অমনই বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বললাম, ‘একটি বৈষ্ণব প্রসাদ চেয়ে না পেয়ে চ’লে যাচ্ছেন! ক্ষুধিত হ’য়ে খাবার চাচ্ছেন; খাবার রয়েছে দিয়ে দিবে—এতে আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র কি?’ আমাকে সকলে বল্লেন, ‘বাবাজীকে একটু বস্তে বল্গে।’ আমি এসে দেখি বাবাজী দ্বারে নাই রাস্তায় চ’লে যাচ্ছেন। অমনই দৌড়ে গিয়ে বাবাজীকে ধরলাম, অনেক ক’রে বললাম; কিন্তু বাবাজী আর ফিরলেন না। তখন তাঁর ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা ক’রে রাখলাম। একটু পরেই ব্রাহ্মণেরা সেবায় বস্লেন, আমিও অমনই একজনের মত প্রসাদ চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক’রে ক’রে এখানে এসে উপস্থিত হ’লাম। বাবাজীকে প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ‘বাবাজী! প্রতিদিন কি ভাবে আপনার সেবা চলে?’ বাবাজী বল্লেন—‘ভিক্ষা করি। তার পর ভগবান্ যে দিন যে রকম দেন, সেরূপই জুটে।’

এর পর যত কাল বাড়ীতে ছিলাম, ক্ষুধা হ’লেই আমার বাবাজীর কথা মনে হ’ত। চেষ্টা ক’রে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ রেখে বাবাজীকে এখানে এনে দিতাম, না হ’লে আহারে আমার রুচি হ’ত না। শান্তিপুরে কিছু কাল পূর্বেও বৈষ্ণব মহাপুরুষদের অভাব ছিল না। আজকাল আর সেরূপ মহাত্মাদের বড় দেখা যায় না। ক্রমে সমস্তই লোপ হ’য়ে গেল।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি দিন রাত কেবল উহাই মনে উঠিতেছে। আহা! ছয় সাত বৎসরের বালক অবস্থায়, যিনি একজনের যাতনায় দেখিয়া ছট্ কট করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং নয় বৎসর বয়সে যিনি সংস্থানশূন্য ভিক্ষোপজীবী ক্ষুধিত বাবাজীর কথা মনে করিয়া বহুকাল প্রতিদিন আহারে তৃপ্তিলাভ করেন নাই, রোজ রুটিতেও দেড় মাইল চলিয়া গিয়া যিনি খাবার দিয়া আসিতেন, হে ভগবান, জন্মান্তরে এমন কি স্মৃতি করিয়াছিলাম যে সেই দয়ার শরীরের আশ্রয় পাইলাম! ধন্য দয়ার ঠাকুর! তোমার গৌরবে আমরাও ধন্য।

ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম—“অন্তের রোগ শোক, ক্ষুধা পিপাসাদির যন্ত্রণা দেখিয়া তেমন লাগে না কেন? মুখে একটা ‘আহা’ ‘উহ’ করি মাত্র। কতকালে যথার্থ দয়া প্রাণে জাগিবে?”

ঠাকুর বলিলেন—“তা কি বলা যায়? সকলেরই ভিতরে সকল সদ্‌বৃত্তি আছে, সময় হ’লেই তা ফুটে উঠে। যেমন বৃক্ষের ফল ফুল সময়ে প্রকাশ হয়। নিয়মে চ’লে, সময়ের প্রতীক্ষা ক’রে, পড়ে থাক।”

প্রশ্ন করিলাম—“সময়ে হবে, ইহা অনেক সময় বলেন। এই সময়ের অর্থ কি কোনও নির্দিষ্ট কাল?”

ঠাকুর বলিলেন—“তা শুধু নয়। ঋতুবিশেষে এক এক জাতীয় বৃক্ষের ফল ফলে, কিন্তু সেই ঋতুতে গাছটিরও ফল প্রসবের উপযুক্ত বয়স হওয়া চাই। চারা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত, ছাগল গরু হ’তে তা রক্ষা করা, বেড়া দেওয়া, জল দেওয়া, উত্তাপ লাগার ব্যবস্থা করা—এ সকল যেমন আবশ্যিক, সকলেতেই সেই প্রকার। নিয়মে না থাকলে সময়ও উপস্থিত হয় না।”

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী।

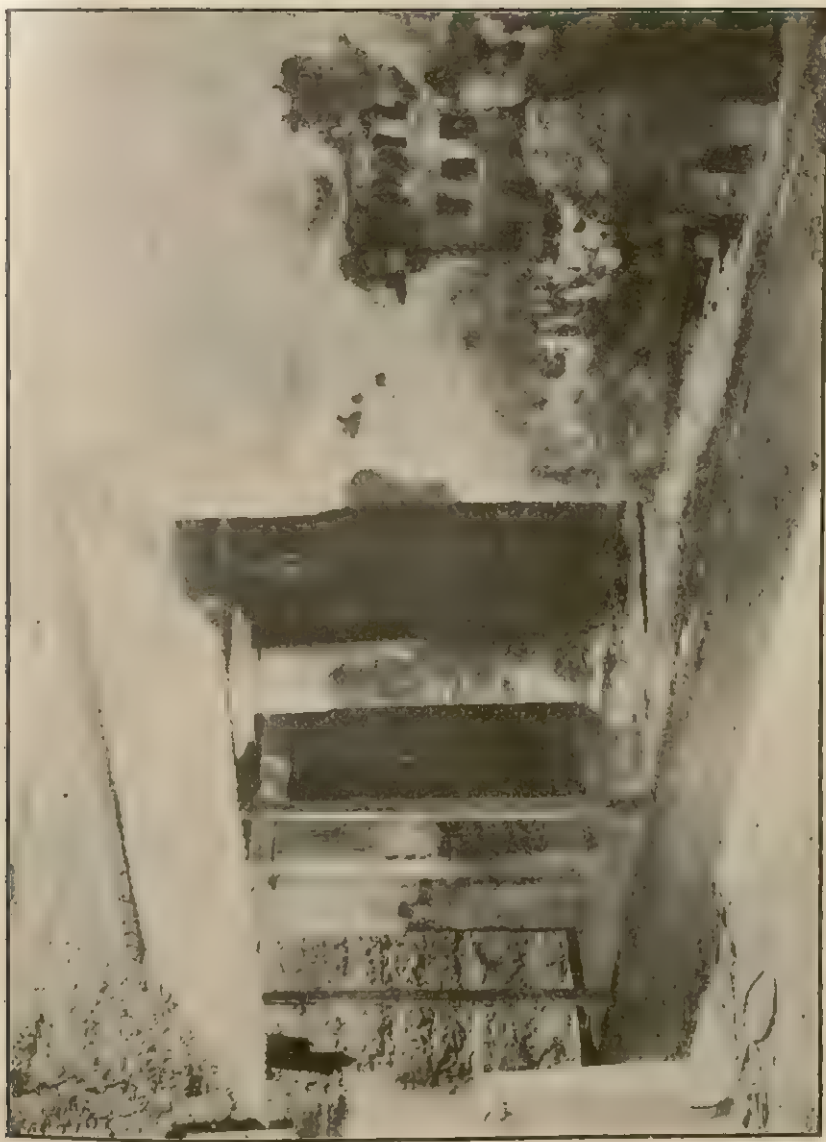
আহারান্তে নানা কথার পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“শুনেছি এক বাবাজী নাকি আপনাকে ‘মালা তিলক ধারণ করতে হবে’ এরূপ কথা বহুকাল পূর্বে বলেছিলেন? সে কবে? আপনি কি বাবাজীকে ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন, না অমনই?”

ঠাকুর বলিলেন—“ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের কিছু কাল পরে, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন কর্তে নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। সে সময়ে এ দেশে সকলেই বাবাজীকে মহা-সিদ্ধপুরুষ ব’লে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। বাবাজীর নিক্ষিপ্ত ভাব, স্বাভাবিক বিনয় ও ভক্তিভাব দেখে বড়ই আনন্দ হ’ল। বিড়াল কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হ’য়ে নমস্কার করতেন। ছেঁড়া কাঁথা, নারিকেল মালা ও একটি মাটির কেরোয়া ভিন্ন বাবাজীর আর কিছুই সম্পত্তি ছিল না। আমি বাবাজীর নিকটে কিছু সময় ব’সে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম,

‘বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?’ বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কোনও উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থেকে থর থর ক’রে কাঁপতে লাগলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরটি পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হ’তে লাগল, মস্তকের শিখাটি খাড়া হ’য়ে উঠল। বাবাজী অশ্রুটস্বরে একটি গভীর হুঙ্কার ক’রে বললেন, ‘কি বললে গোঁসাই? তুমি বললে ভক্তি কিসে হয়! তুমি বললে ভক্তি কিসে হয়!! য্যা, তুমি বললে ভক্তি কিসে হয়!!!’ এই বলেই সমাধিস্থ হ’লেন। তিন ঘণ্টা কাল বাবাজীর আর বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না। সে সময়ে বাবাজীর শরীরে অশ্রু কম্প পুলকাদি নানা প্রকারের আশ্চর্য্য ভাব দেখে, আমি একেবারে অবাক হ’য়ে গেলাম। সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী সাষ্টাঙ্গ হ’য়ে প্রণাম ক’রে, করযোড়ে বললেন ‘প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিক্ষিণ কান্দাল হ’তে পারি। তা না হওয়া পর্য্যন্ত ত ভক্তির নাম গন্ধও নাই। এখন আপনি যে ভাবেই চলুন না কেন, আপনার ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, পরিষ্কার আমি দেখতে পাচ্ছি। ভক্তি ত আপনারই ভাণ্ডারের জিনিষ, আমার অর্দ্ধৈতের ভাণ্ডারে কি আর ভক্তির অভাব আছে?’ বাবাজীর কথা শুনে চ’লে এলাম। তখন আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, কখনও আমাকে আবার তিলক মালা নিতে হবে। আর একটি ভদ্রলোক বাবাজীকে ঐ প্রশ্ন করায়, বাবাজী বলে-ছিলেন, ‘তু’টি পয়সায় ভক্তি লাভ হয়।’ সে ভদ্রলোকটি শুনে বললেন, ‘সে কি বাবাজী, তু’পয়সায় ভক্তি লাভ! সে আবার কেমন ভক্তি, আপনি আমাকে উপহাস করলেন?’ বাবাজী বললেন—‘হরে কৃষ্ণ! উপহাস করি নাই, ঠিকই বলেছি। তু’টি পয়সা দিয়ে একখানা বটতলার ছাপা ‘নরোত্তম দাসের প্রার্থনা’ এনে কিছুকাল পড়ুন, তা হ’লেই সব বুঝতে পারবেন।’

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যদৃষ্টি এবং অনির্ঘাতি ঐশ্বর্য্য, যাহা সিদ্ধপুরুষেরা লাভ ক’রে থাকেন, তা কি যোগ ক’রে?”

ঠাকুর বলিলেন—“যোগ ক’রেই এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, না হ’লে হয় না, এমন কিছু নয়। যে কোন প্রকারে চিন্তাটি একাগ্র হ’লেই হ’লো; তখন আপনি আপনি এ সমস্ত ঐশ্বর্য্য এসে পড়ে। কিন্তু এসব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করলেই সর্ব্বনাশ। গোপনে রাখলেই এ সব শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করা সহজ, কিন্তু রক্ষা করাই শক্ত। যোগীদের পক্ষে এসব ঐশ্বর্য্যের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। কত শত যোগীর সাধনের সম্পত্তি, এই ঐশ্বর্য্যের তুফানে প’ড়ে, একেবারে ডুবে গেছে। বড়ই সাবধানে থাকতে হয়।”



নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর আশ্রম

আমি আবার বলিলাম—“প্রয়োগই যদি না করিলাম ব্যবহারই যদি না হ’ল, তবে আর এ সকল শক্তিতে লাভ কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“সমস্ত শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্যই ত ভগবানের, তাঁরই কৃপায় এসব মানুষের লাভ হয়। তাঁরই ইচ্ছিত অনুসারে তা প্রয়োগ করতে হয়। নিজ ইচ্ছায় কিছু করতে গেলেই গোল।”

খোদার উপর খোদারী।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“শাস্ত্রে যে সকল কার্যকে সংকার্য বলেছেন, ধর্মকার্য বলেছেন, সে সকল বিষয়েও কি যোগৈশ্বর্য প্রয়োগ করতে নাই?”

ঠাকুর বলিলেন—“সং অসং বুঝা বড় সহজ নয় ত! মুসলমানদের একখানা ধর্মগ্রন্থে এ বিষয়ে বড় সুন্দর একটি গল্প আছে। একটি দয়ালু ফকির, সহরে ছুঁখ দারিদ্রতা রোগ শোক ইত্যাদিতে লোকের ক্রেশ দেখে ভাবলেন—‘আহা! খোদা এদের ত কিছুই করছেন না!’ তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা করলেন, ‘প্রভো! একটি দিনের জন্মও যদি শক্তি দিয়ে, মাত্র এই সহরে আমাকে তোমার খোদারী দাও, তা হ’লে আমি সকলের সকল প্রকার ক্রেশ দূর ক’রে পরম শান্তি স্থাপন করি।’ খোদা ‘তাই হউক’ ব’লে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। ফকির সাহেব, সহরে সর্বদুঃখ এবং সর্বশক্তিমান হ’লেন। অমনই তিনি যাবতীয় প্রাণীর ছুঁখ কষ্ট, রোগ শোক একেবারে দূর ক’রে, মহা আনন্দের ঢেউ তুলে দিলেন। একটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তি ঐ সহরে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিল। বহু চেষ্টাতেও যুবতীর জীবদশাতে সে কোন প্রকারে উহাকে পায় নাই। অকস্মাৎ স্ত্রীলোকটির দেহ ত্যাগ হ’ল। তার আত্মীয় স্বজনরা তাকে কবর দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই ঐ ছুরাচার ব্যক্তি তা জানতে পেরে, নির্জঙ্গন স্থানে ঐ কবরের কাছে উপস্থিত হ’ল এবং যুবতীর মৃত শরীর কবর হ’তে তুলে নিয়ে তারই উপর নিজ জঘন্য বৃত্তি চরিতার্থ করবার উদ্যোগ করতে লাগল। ফকির সাহেবের নজরে যেমনই এই ব্যাপার পড়ল অমনই তিনি তরোয়াল হাতে নিয়ে লাফায়ে উঠলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে তার কাছে উপস্থিত হ’য়ে ‘কাফের’, ‘কাফের’ ব’লে চীৎকার ক’রে, তার গদান লক্ষ্য ক’রে তরোয়াল হাঁকলেন। খোদা তৎক্ষণাৎ ঐ তরোয়াল ধ’রে ফেললেন এবং ফকির সাহেবকে বললেন, ‘এ কি করছ? কয়েক মুহূর্তের জন্ম খোদারী পেয়েই এতটা! এর সারা জীবনের প্রতিদিন এই রকম কত

ছকার্য্য দেখেও আমি একে ক্ষমা ক'রে আসছি ; আর দশটির মত, সকল অবস্থায়ই আমি একে প্রতিপালন করছি, একটি দিনের জন্মও একে উপবাসী রাখি নাই ; আর তুমি, মাত্র একটা দোষ দেখেই একে একেবারে বধ করতে উদ্যত হ'লে ! যাও, আর তোমার খোদারী করতে হবে না ।' ফকির সাহেব বল্লেন, 'প্রভো ! আমি ত অনায়াস কিছু করি নাই । কোরানেই ত ব্যবস্থা আছে, এক্রপ অপরাধীকে বধ করতে হয় ।' খোদা বল্লেন, 'কোরানের ব্যবস্থা কি তোমার জন্ম, না আমার জন্ম ?' ফকির বল্লেন— 'মানুষেরই জন্ম, আমার জন্ম ।' খোদা বল্লেন, 'তবে ? আজ ত তুমি আর তুমি নও, আজ যে তুমি খোদা হয়েছিলে । খোদার জন্ম ত আর কোরানের ব্যবস্থা নয় !' ফকির সাহেব তখন ভগবানের কার্য্য ও অসীম দয়া দেখে এবং নিজের বিচারবুদ্ধি ও অবস্থা বুঝে, একেবারে মুগ্ধ ও লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন । সাধারণ লোকের অসাধারণ শক্তি লাভ হ'লে, তার দ্বারা সংসারের বিশেষ অনিষ্ট হয় । এই জন্মই শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীকে বধ করেছিলেন ।"

ঠাকুর এসব বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন । শক্তিলাভ হইলে সম্পদ অপেক্ষা বিপদই বেশী ।

ঠাকুরের শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমন ।

ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি শান্তিপূর্ণ মধুর শান্তিপুরের বাস আজ আমাদের ফুরাইল । ঢাকা, বরিশাল, কলিকাতা ও কাকিনা প্রভৃতি স্থানের গুরুভ্রাতারা, ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন । কলিকাতার গুরুভ্রাতাদের প্রাণের অতিশয় আগ্রহ জানিয়া কিছু দিন পূর্বে ঠাকুর তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, অবিলম্বেই তিনি তথায় পহুঁছিবেন । কলিকাতার গুরুভ্রাতাদের কাহারও অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় সকলেই গরীব । ঠাকুরের সঙ্গে বহু লোক উপস্থিত হইলে, ব্যয়ভার কি প্রকারে নির্বাহ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এবং অনেক লোক লইয়া ঠাকুর কলিকাতা পহুঁছিলে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে, ইহাও তাঁহারা ঠাকুরকে পরিষ্কার জ্ঞাত করাইয়াছিলেন । ঠাকুর তখন তাঁহাদের সেই কথার কোনও উত্তর না দিয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র ।

শান্তিপুর হইতে ঠাকুরের কলিকাতা পহুঁছিবার নির্দিষ্ট দিন অবগত হইয়া অদ্বৈত অচিন্ত্য বাবু, মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা যথাসময়ে আহিরীটোলা ষ্টামার ঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ঠাকুরের সঙ্গে ৩৪টি মাত্র লোক আসিবে অল্পমানে তাঁহারা ইতিপূর্বে ঠাকুরের জন্ম এক খানা ছোট বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন । রাস্তায় অকস্মাৎ ষ্টামারের গতি রুদ্ধ হওয়াতে যথাসময়ে ষ্টামার কলিকাতা পহুঁছিতে পারিল না । এদিকে গুরুভ্রাতারা বহুক্ষণ ষ্টামারের প্রত্যাশায়

থাকিয়া অবশেষে রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে সকলেই হতাশপ্রাণে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা পঁছিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইল। ঠাকুর শ্রীমার হইতে নামিয়াই কাহারও প্রত্যাশায় না থাকিয়া একেবারে ব্রাহ্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। আমরা নগেন্দ্র বাবুর বাসায় পঁছিয়া দেখিলাম, তিনি এবং তাঁহার সহধর্মিণী “মা আনন্দময়ী” আমাদের আট দশটি লোকের আহ্বারের সুব্যবস্থা রাখিয়া খুব উৎকর্ষার সহিত ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহাতে মনে হইল পূর্বেই উহারা কোনও প্রকারে আমাদের সকলের ঐ দিনে তাঁহাদের বাসায় পঁছিবার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন।

পরদিন ঠাকুরের খবর পাইয়া সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতাদের আনন্দের আর মীমা নাই। উহাদিগকে পাইয়া আমরাও খুব প্রফুল্ল হইলাম। কিন্তু এত লোকের সমাবেশ কোথায় হইবে ভাবিয়া সকলেই একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র দেব মহাশয় বার দিনের ছুটি লইয়া বেতনাথ চলিলেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার খালি বাড়ীতে আমাদের থাকিবার সুবিধা হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করাতো, তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে মসজিদবাড়ী স্ট্রীটস্থ তাঁহার খালি বাড়ীতে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। এক দিন মাত্র নগেন্দ্র বাবুর বাসায় থাকিয়া ৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার অহারাতে ঠাকুরের আসন লইয়া ঐ বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হইলাম।

মসজিদবাড়ী স্ট্রীটের বাসা।

এই বাসায় পঁছিয়া ঠাকুরের থাকিবার ঘরখানা আমরা সর্বাগ্রে পছন্দ করিয়া লইলাম। রাস্তার উপরে, খোলা মেলা দোতলা ঘরের এক কোণে ঠাকুরের আসন পাতিলাম; এই ঘরের ভিতর দিকে, সাম্নেই বড় বারেন্দা এবং বারেন্দা-সংলগ্ন একধারে ছ'খানা বড় বড় কুঠরী আছে। ঠাকুরের সঙ্গে যে কয়টি গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন, স্বচ্ছন্দরূপে তাঁহারা এই বাসায় থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া সকলেরই মন খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এই আনন্দ বেশীক্ষণ আমাদের রহিল না। এখন দেখিতেছি অপরাহ্নে দর্শনার্থী হইয়া দলে দলে লোক আসিয়া যখন বাড়ীটিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে তখন স্থানাভাবে বড়ই অসুবিধা হয়। সন্ধ্যাকীর্তনের পরে একটু বেশী রাত্রিতে বাহিরের লোকের সংঘট্ট কমিয়া যায় বটে কিন্তু তখন আবার গুরুভ্রাতাদের ভিড়ে অস্থির হইয়া পড়ি। আফিস আদালত ছুটি হইলেই গুরুভ্রাতারা সকলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অনেকে সারারাত্রি এখানে থাকিয়া প্রত্যুষে আপন আপন বাসায় চলিয়া যান। ঠাকুরের ঘরটি সমস্ত রাত্রিই লোকে পরিপূর্ণ থাকে। ছ'তিন ঘণ্টা কালও কেহ ঘুমান কি না সন্দেহ। রাত্রিতে সামান্য জলযোগ করিয়া প্রায় অতৃপ্ত অবস্থায় ক্লাস্ত শরীরে গুরুভ্রাতারা এখানে অবস্থান করেন। তাঁহারা প্রায় সারারাত্রি এইভাবে জাগরণ করিয়া প্রতিদিন আফিস আদালতের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কার্য অবাদে স্চারুরূপে কি প্রকারে সম্পন্ন করিতেছেন ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি।

৮ই—১০ই অগ্রহায়ণ
সোমবার।

বৃন্দাবনবাবুর সেবানিষ্ঠা ।

ঠাকুরের প্রতি গুরুভ্রাতাদের আন্তরিক টানের এক একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেছি। ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করিতে কোনও দিকে কোনও প্রকার বাধা গুরুভ্রাতারা তৃণতুল্যও মনে করেন না। কোনও কারণে ঠাকুরের সেবার এতটুকু অস্ববিধা হইতেছে শুনিলেই, উহারা একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন।

আজ আমাদের উন্নত ধরাইবার ঘূঁটে না থাকায় সকালে মেয়েরা আসিয়া জানাইলেন “ঘূঁটে ফুরাইয়া গিয়াছে। ঘূঁটে না আনিলে গোঁসাইয়ের রান্না হবে না।” গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ‘ঘূঁটে এনে দিচ্ছি’ বলিয়া তখনই বাসা হইতে বাহির হইলেন। ঘূঁটের অন্তরঙ্গান করিতে করিতে কোথাও না পাইয়া অবশেষে তিনি অনেক ঘুরিয়া গোয়াবাগানে একটি ঘূঁটের দোকানে উপস্থিত হইলেন। ঘূঁটের দ্বারা ঘূঁটে বাসায় লইয়া যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইবে ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং তিনি কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া জুতা, মোজা, কোট ও গরম গাত্রবস্ত্র পরিহিত থাকা অবস্থায়ই ঘূঁটের বুড়ি একেবারে মাথায় তুলিয়া লইলেন। এমনই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বড় রাস্তার উপর দিয়া উর্দ্ধধামে ছুটিতে ছুটিতে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি একটি নগণ্য লোক নহেন, পদস্থ সরকারী কর্মচারী, কায়স্থসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এবং কলিকাতার বহু সম্মানিত লোকের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ঠাকুরের প্রতি ইহার সখ্যতাব। ইহার অসাধারণ সরলতা ও উদারতার কথা ঠাকুর অনেক সময়ে বলিয়া আনন্দ করেন।

ঠাকুরের মুক্তিফৌজ দর্শন—আমার অভিমান চূর্ণ।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্তী মহাশয় জেনারেল বুথ ও মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। ঠাকুর পুস্তকখানা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এ সময়ে মুক্তিফৌজের অধ্যক্ষ জেনারেল বুথ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিকট অনেক সময় আলোচনা হইতে লাগিল।

নিঃস্বার্থ কর্মবীর পরোপকারী দয়ালু জেনারেল বুথের অসাধারণ সেবাত্রত এ সময়ে মনস্তৃপ্তিবিধিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় লর্ড-পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলারাও সংসারস্থখে জলাঞ্জলি দিয়া এই মহাত্মার দৃষ্টান্তানুসারে রোগি-সেবা-ত্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। উহারা কাঙ্গালবেশে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া রাস্তার নিরাশ্রয় অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি—বৃষ্ট রোগীদিগকেও—আগ্রহের সহিত উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে লইয়া আসেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। রোগীদিগের প্রতি ইহাদের দয়ালু ভালবাসা এবং রোগীদিগের অত্যাচারেও ইহাদের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনিয়া ঠাকুর কান্দিয়া ফেলিলেন এবং উহাদিগকে দর্শন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন—“পরজুংথে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তীর্থস্বরূপ ; তাঁদের দর্শনেও লোক পবিত্র হয়।”

এই বলিয়া ঠাকুর বেলা প্রায় দু'টার সময়ে সকলকে লইয়া মুক্তিকোজ দর্শন করিতে চলিলেন। সকলের সঙ্গে আমিও যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুর তখন আমার দিকে চাহিয়া খুব স্নেহভাবে বলিলেন—“আমার আসনটি শূন্য ঘরে থাকবে ; তুমি এই সময়টুকু এখানে থাকতে পারবে না?”

একটি গুরুভাই বলিলেন—“কেন ? বাসায় ত আরও লোক আছে।”

ঠাকুর আবার বলিলেন—“শুধু আসনের জন্যও নয়। মুক্তিকোজের ভিতরে অল্পবয়সী যুবতী মেমেরা সব আছেন, ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?”

আমি ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া যাইতে নিরস্ত হইলাম। নিজ আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ‘হায়রে কপাল ! এই ব্রহ্মচর্য্যে আমার প্রয়োজন কি ? যদি সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতে না পারিলাম !’

মনে বড় দুঃখ হইল, ঠাকুরের উপর খুব অভিমানও আদিয়া পড়িল। ভাবিলাম, “ঠাকুর এই মাত্র বলিলেন, ‘উঁহারা তীর্থস্বরূপ, উঁহাদের দেখলেও পুণ্য হয়।’ ভাল, ঠাকুর সকলকে লইয়া তীর্থে গেলেন, সকলে পবিত্র হইবে, আর শুধু আমিই গেলে একেবারে অপবিত্র হইয়া যাইতাম ! বিশেষতঃ ঠাকুর যেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন, সেখানেও আমাকে লইয়া যাইতে এত আশঙ্কা ! ঠাকুর আমাকে কি এতই অপদার্থ, এতই কামুক মনে করেন ! এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে ঠাকুরের উপর আমার অত্যন্ত অভিমান আদিয়া পড়িল। আমি ঠাকুরকে ভাবিতে ভাবিতে মুক্তি—কোজই দেখিতে লাগিলাম। এ সময়ে নিজেরই অজ্ঞাতসারে কল্লনার স্রোতে পড়িয়া স্বন্দরী মেয়েদের অঙ্গমৌল্য ও রূপলাবণ্য মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। অঙ্গক্ষণের মধ্যেই অদম্য কামের উত্তেজনায পড়িয়া গিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম এবং একবার ঘর একবার বাহির করিয়া, ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। অবশেষে ঘর্ষাক্তকলেবরে একেবারে অবসন্ন হইয়া বারেন্দায় পড়িয়া রহিলাম।

আমার অভিমান চূর্ণ করিতে দয়া করিয়া ঠাকুরই আমার প্রকৃত রূপ আমাকে দেখাইলেন—এ সময়ে ইহা আমি বেশ বুঝিলাম।

ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন স্বতরাং এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শাস্ত্বমর্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই ত প্রশ্রয় দিবেন না। এই জন্তই আমাকে স্ত্রীলোকদের ভিতরে নিজের সঙ্গেও নিলেন না। বলিলেন—“ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?”

ইহা আর আমি বুঝিলাম কই ? আমি এই কথার অণুপ্রকার অর্থ বুঝিয়াছিলাম ; যেন আমার প্রকৃতির দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক নিজের অবস্থা নিজে না বুঝিয়া যেমন ঠাকুরের কার্য্যে অভিমান করিয়াছিলাম তেমনই দয়া করিয়া ঠাকুর আমার প্রকৃতি আমাকে দেখাইয়া আমার সেই অভিমানটি চূর্ণ করিলেন।

ঠাকুরের অল্পপস্থিতি সময়ে পোষ্টাফিসের ডেপুটি কন্টোলার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় আসিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কখন আসিলে গোঁসাইকে নির্জনে পাইব ?” ইহার সহিত আলাপে জানিলাম দু'এক দিনের মধ্যেই ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইহাকে আমি দু'টা হ'তে তিনটার মধ্যে আসিতে বলিলাম।

গুরুভাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিয়া ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইনি আমার বড় দাদার অত্যন্ত বন্ধু ও সমপাঠী, ইহার কথায় দাদাকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জ্ঞান আসিতে লিখিলাম ; ঠাকুরের অল্পমতির অপেক্ষাও করিলাম না।

ঠাকুর বাসায় আসিলে অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“নিয়মে থাকিয়া সাধন ভজন যতই করিতেছি, ততই ত রিপূর বৃদ্ধি দেখিতেছি। সাধারণ লোক অপেক্ষা সাধকদের কি রিপূর প্রাবল্য অধিক ? কামের উত্তেজনার ত কিছুতেই বিরাম হইতেছে না।”

ঠাকুর বলিলেন—“কাম যে আমাদের শরীরে ও মনে অত্যন্ত অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। সাধারণ লোকদের অপেক্ষা সাধকদের আবার এ সব অনেক প্রবল হ'য়ে থাকে ; কারণ এসমস্ত ত আত্মারই বৃত্তি। জল উত্তাপাদি দ্বারা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে, সাধন ভজন দ্বারাও সেই প্রকার আত্মার বৃত্তি সকলের পুষ্টি হয়। তবে যত কাল এ সকল বৃত্তি বহির্মুখ থাকে, তত কালই রিপূর মত কার্য্য করে। অন্তর্মুখ হ'লেই সাধক তখন বুঝতে পারেন, এ সকলের বৃদ্ধির কত প্রয়োজন ছিল ; এই বৃদ্ধিতেই তখন আবার কত আনন্দ ! সাধন ভজন দ্বারা আত্মার সমস্ত বৃত্তির পুষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এ সকল বৃত্তি বহির্মুখ অবস্থায় যতকাল থাকে, ততকালই রিপূর মত কার্য্য করে, অনিষ্টকর বোধ হয় ; কিন্তু ভগবৎকৃপায় একবার মুখটি ফিরে গেলে, তখন ইহারাই আবার পরম উপকারী হ'য়ে থাকে। সাধকদের জীবনের অবস্থা সমস্তই স্বতন্ত্র প্রকারের। সাধারণ লোকের মত এঁদের কিছুই নয়। একমাত্র তাঁর অনুগত হ'লেই নিরাপৎ।”

কলেজের কতিপয় ছাত্রের সঙ্কীৰ্ত্তন ; মুকুন্দ ঘোষের আকর্ষণ।

ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া একদিন শ্রীযুক্ত মুকুন্দ ঘোষ ঠাকুরকে কীর্ত্তন শুনাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেইমত দিনও ধাৰ্য্য হইয়া যায়। ঠাকুর ঐ দিন অতিশয় অস্থস্থ হইয়া পড়িলেন, ভয়ানক জ্বর হইল ; এদিকে মুকুন্দ ঘোষের ভ্রাতৃপুত্রের সেই দিনেই অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। মুকুন্দ ঘোষ তাহাকে লইয়া শ্মশানে গেলেন। অপরাত্ন প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময়ে বকুলাল বাবু, অমিয় বাবু প্রভৃতি কলেজের ছাত্রগণ ঠাকুরকে গান শুনাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের অস্থথের সংবাদ পাইয়া, তাঁহারা আর উপরে উঠিলেন না ; নীচে থাকিয়াই হরি সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে

লাগিলেন। কীর্তন ক্রমে ক্রমে বেশ জমাট হইয়া পড়িল; ঠাকুর অস্থস্থ অবস্থায়ও আসনে স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং লাঠিতে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে বাইয়া কীর্তনস্থলে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, গুরুভাতারাও মাতিয়া গেলেন। এই কীর্তনে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সকলে ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া রহিলেন। এই সময়ে মুকুন্দ ঘোষও হঠাৎ আসিয়া কীর্তনে যোগ দিলেন। তাহাকে দেখিয়া কীর্তনান্তে আমাদের কোনও গুরুভাতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি এ সময়ে কি প্রকারে আসিলেন?” তিনি বলিলেন, “শাশানে প্রভুর কথা মনে হইতেই প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল, তাই সংকারের পরই বাড়ীতে না গিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি; আমরা আমার সার্থক, আজ আমার পূর্ণ দর্শন হইল। পূর্বে আর একবার প্রভুর এই রূপ দর্শন পাইয়াছিলাম।”

অল্পসম্মানে জানিলাম গত ১২৯৪ সালে ঠাকুর যখন শান্তিস্থধার বিবাহের কথা স্থির করিতে কলিকাতা চৌরবাগানে আসিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর বাসায় ছিলেন, তখন একদিন নগেন্দ্রবাবুর সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি কাঁসারিপাড়ার শ্রীযুক্ত হরজহরের বাড়ী গিয়াছিলেন। ওখানে ঠাকুর ভগবানের নাম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মুকুন্দ ঘোষ কীর্তন করেন। এই কীর্তনে ঠাকুরের অবস্থা দেখিয়া অনেকে সংজ্ঞাশূন্য হন, মুকুন্দও একেবারে মূগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই হইতে নিয়ত মুকুন্দের প্রাণে আকাজক্ষা ছিল যে ঠাকুরকে আর একবার পাইলে কীর্তন শুনাইয়া ঐ রূপ দর্শন করেন।

বৈষ্ণব দর্শন—মহাপ্রভুর কথা।

আজ ঠাকুর একটি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলেন। যোগজীবন, সতীশ এবং আমি ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। অনেক রাস্তা হাঁটিয়া আমরা একটি বাড়ীতে পহঁছিলাম। ভদ্রলোকটি ঠাকুরকে দেখিয়াই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সকলকেই তিনি তাঁর কোঠাঘরের দোতালার বারেন্দায় আগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। ঠাকুর তাঁকে খুব ভক্তি করিয়া নমস্কার করিলেন। ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত; গোড়িয়া বৈষ্ণব অথবা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের খুব উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া অনুমান হইল। ভগবৎপ্রসঙ্গে নানাপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব উভয়েরই শরীরে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ কথা বার্তার পর বৃদ্ধটি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি শ্রীবন্দাবনে বহু দিন ছিলেন, ওখানে তাঁকে কখনও দেখিতে পাইলেন? শুনিয়াছি তিনি এখনও সেই শরীরেই আছেন।”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, ঠিক সেইই আছেন। একদিন দয়া ক’রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হ’লেন; দর্শন মাত্রই বুঝলাম মহাপ্রভু।”

বুদ্ধটি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তারপর, কিছু বলিলেন কি ?”

ঠাকুর বলিলেন—“দর্শনমাত্রেই পায়ের উপর প’ড়ে খুব কাঁদতে লাগলাম, কত কি বললাম। তিনি মাথায় হাত বুলায়ে আশীর্বাদ ক’রে বললেন ‘সমস্তই ত পূর্ণ হ’য়েছে, আর কেন? স্থির হও, স্থির হও। আমি ত তোমাদেরই ঘরে কেনা।’ ঐ সময়ে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ’য়ে পড়লাম। পরে জ্ঞান হ’লে উঠে দেখি, আর তিনি নাই, চ’লে গেছেন।”

ঘণ্টা দুই পরে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাসায় আসিলাম।

বিচারতত্ত্ব মহাশয়ের গৈরিক গ্রহণ।

অপরায় প্রায় ৩ টার সময়ে আমাদের পরম আত্মীয় বহুকালের পরিচিত ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রামকুমার বিচারতত্ত্ব মহাশয় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন, ‘নির্জর্জনে আমার কিছু বলিবার আছে।’ শুনিয়াই আমি আসন হইতে উঠিয়া বারেন্দায় গেলাম। বিচারতত্ত্ব মহাশয়ের গলার আওয়াজ একটু বড়, বারেন্দায় থাকিয়াও তাঁর কয়েকটা কথা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, “গঙ্গোত্রী হইতে হিমালয়ের উপরে গিয়া কিছুকাল ছিলাম। একদিন ব্যাসদেবের দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিয়া কয়েকটি উপদেশ দিলেন এবং আপনার নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনার উপদেশমত চলিতে বলিলেন। আপনি দয়া করিয়া আমাকে গৈরিক বস্ত্র দিন এবং কি প্রকারে আমাকে চলিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিন।”

ঠাকুর বলিলেন—“সর্বত্রই মঠ মন্দিরাদিতে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন ক’রে, সাষ্টাঙ্গ হ’য়ে প্রণাম করলে উপকার হ’য়ে থাকে। সত্যকে লক্ষ্য রেখে সরল ভাবে চললেই সব হয়। গৈরিক ধারণ করলে বীৰ্য্যও ধারণ করতে হয়, শাস্ত্রের এরূপ ব্যবস্থা আছে; না হ’লে বিশেষ অনিষ্ট হ’য়ে থাকে।”

এই বলিয়া ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া নিজের একখানা বহির্বাস বিচারতত্ত্ব মহাশয়কে দিতে বলিলেন। তিনিও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া উহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের শাসন ও সাস্ত্রনা।

আমাদের বাসাটি ছোট হওয়াতে দিন দিন বড়ই অস্ববিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সকালে ও রাত্ৰিতে লোকের ভিড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকটি গুরুভগ্নী নিয়ত এখানে থাকাতে আর আর স্ত্রীলোকেরাও দলে দলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার স্বযোগ পাইয়াছেন। ঠাকুর নিজেই দয়া করিয়া তাঁর ঘরে আমাকে আসন করিতে দিয়াছেন, তাই অনেকটা আরামে আছি। কিন্তু রান্না খাওয়া ও হোমাদি কার্যের খুবই অস্ববিধা প্রত্যহ ভুগিতেছি। উপরের ঘরের সম্মুখের বারেন্দায়

আমি নিভা হোম করি। এ সময়ে প্রায়ই গুরুভ্রাতাভগিনীদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে থাকে। কাঁচাকাঠের ধোঁয়াতে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গুরুভ্রাতারা আমাকে এখানে হোম করা বন্ধ করিতে অনেকবার বলিয়াছেন, কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করি নাই বরং উন্ট। তাঁহাদিগকে ধমকাইয়া দিয়াছি। আজ ভিজা কাঠ অনেক চেষ্টায় জ্বলাইয়া যেমন তাহাতে কয়েকটি মাত্র আহুতি দিয়াছি, অতিরিক্ত ধোঁয়াতে অস্থির হইয়া আমাদেরই একজন তাঁর ছেলেটিকে কোলে লইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—“তুমি কি রকম লোক! সকলকে মেরে ফেল্বে নাকি? রেখে দেও তোমার হোম। সকলকে জ্বালাতন করলে যে।” আমি উহার হাতনাড়া, মুখনাড়া ও বিরক্তিভাবের কথা শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিলাম এবং খুব তেজের সহিত বলিলাম—“বটে? লোকের উপর বড়ই ত দয়া দেখতে পাচ্ছি। ছেলেটা যখন টেঁ টেঁ করে চীৎকার করে এবং সকলকে জ্বালাতন করে তুলে, তখন ছেলেটার মুখ চেপে ধরতে পার না? তখন ছেলেটাকে কি সরিয়ে দাও? তোমাদের জ্বালা হয় বলে, আমি আমার নিত্যকর্ম করব না? বাঃ!” তিনিও আমার কথার উত্তর দিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্তেই ঠাকুর আসন হইতে খুব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—“কে আছ ওখানে? এক্ষণই আগুনে জল ঢেলে দেও। এ কি রকম? একটা সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি নাই!”

ঠাকুরের মুখ হইতে যেমনই ঐ কথা বাহির হওয়া, অমনই দুই তিনটি গুরুভাই জল আমিতে ছুটিয়া গেলেন। আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া নিজেই মান রাখিতে নিজেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের স্নানিবার পূর্বে জল ঢালিয়া আগুন নিবাইয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে দশ জনের কাছে এতটা অপ্রস্তুত করিলেন মনে করিয়া ছাদের উপর চলিয়া গেলাম। লজ্জায় ও অভিমানে আমার সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। ঠাকুরের উপর খুব রাগিয়া গেলাম। ভাবিলাম এদিকে আপন আপন নিয়মে অটল থাকিতে দিনের মধ্যে দশবার উপদেশ দিচ্ছেন, এখন ত এদের কষ্ট দেখে আমার নিয়মটি ভেঙ্গে দিতে একবারও ভাবলেন না। সিঁড়িঘরে যাইয়া আবার আগুন জালিয়া হোম করিলাম। আর ঠাকুরের ঘরে যাইব না স্থির করিয়া নিতান্ত অপ্রস্তুত চারকুট মাত্র স্থানে কুকুরকুণ্ডলী হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সমস্তটি দিন মানসিক ক্রোশে ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে ঠাকুর অকস্মাৎ ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে ওখানে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন—“কি, তুমি এখানে হোম করার ঠিক করে নিয়েছ? সে বেশ হয়েছে। সকলকে ক্রোশ দিয়ে কি ওভাবে কিছু করতে আছে? উপাসনা করতে গিয়ে কারও ক্রোশ জন্মালে উপাসনা হয় না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও গর্ভবতী, এদের সুবিধা সকল অবস্থায়ই সকলের আগে দেখতে হয়। না হ'লে অপরাধ হ'য়ে পড়ে। যাও, এখন গিয়ে রান্না কর।”

ঠাকুর এমন স্নেহভাবে এই কথাকয়টি বলিলেন যে, আমার ভিতর একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ঠাকুর কখনও কারও ক্রেশ দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন না; এ আবার শিশুর ক্রেশ ও রোগীর ক্রেশ! তারপর আমার মানসিক ক্রেশেই বা উদাসীন রহিলেন কই? কখনও ছাদে আসেন না, আজ আমার যাতনার বিষয় কিছু না বলতেও নিজে উহা অল্পভব করিয়া আমাকে ঠাণ্ডা করিতে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর! এই দয়াই ত আমাদের ভরসা!

আজ অপরাহ্নে বাসাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ৩/৪ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি অল্পগত শিষ্য আসিয়া বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিলেন। আমি এই সময়ে রান্নার চেষ্টায় ছাদে চলিয়া গেলাম, সময়ে সময়ে আসিয়া দু'একটা কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন—‘ধন্, মন্, তন্’, এ সমস্তই গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ না হ'লে কিছুই হ'ল না, সবই বিড়ম্বনা। কথাটি শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল।

মা আনন্দময়ীর সঙ্গীত।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী (শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী) আমাদের অনেক গুরুভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ইহাকে ‘মা আনন্দময়ী’ বলিয়া ডাকেন। মা আনন্দময়ী যখন যেখানে যান, স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসাতে সেখানকার সকলকে যেন আনন্দে ডুবাইয়া রাখেন। আমি রান্নার চেষ্টায় হয়রান হইয়া যাইতেছি বুঝিতে পারিয়া মা আমাকে বলিলেন—‘কেন বাবা এ কষ্ট? সকলের সঙ্গে একমুঠো খেয়ে নিলেই ত পার!’ আমি বলিলাম—‘কি করবো মা? নিজে রান্না ক'রে খাই, ইহা যে উনি ভালবাসেন।’ রান্না করিয়া কোন প্রকারে আহ্বান করিয়া নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম। সন্ধ্যাকীর্তন শেষ হইতে রাত্রি প্রায় নয়টা হইল।

ঠাকুরের আহ্বানান্তে মা আনন্দময়ী একটি একতারা লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে গান এমন জমাট হইয়া পড়িল যে সকলেই নিশ্চল ভাবে আপন আপন আসনে পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন। মা আনন্দময়ী ভাবে বিভোর। কিছুক্ষণ পরে কীর্তনের পদ মধুর কণ্ঠধরে মিলিত হওয়ায় এমনই ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল যে, ঠাকুরও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ঘন ঘন অশ্রুক্ষণ পুলকাদিতে অবশ হইয়া আসনেই বারংবার চলিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ঐ সময় ‘হরিবোল’ ‘হরিবোল’, ‘জয় রাধে’ ‘জয় রাধে’, ‘আঃ উঃ’ ইত্যাদি এক একটি শব্দ ঠাকুরের মুখ হইতে নির্গত হওয়াতে একটা প্রবল শক্তি ঝঙ্কারবাতের মত আসিয়া ঘরের ভিতরে ও বাহিরে সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চারিদিকে কান্নার বোল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ চীৎকার করিতে লাগিলেন, কারও কারও বাহুসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। আবার কতকগুলি লোক মুচ্ছিত অবস্থায়ই গড়াইতে গড়াইতে ঠাকুরের দিকে চলিলেন। আমার কখনও ভাব হয় না, আমি স্থির হইয়া

সকলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ভাবের বিকাশ দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্ষণে স্থির ক্ষণে অস্থির অবস্থায় প্রায় সমস্তটি রাত্রি অতিবাহিত হইল।

মা আনন্দময়ীর পুত্র (মণীন্দ্রনাথ) বলিলেন—“ঐ সময়ে গৌসাইয়ের ভিতর হইতে প্রবল শক্তি আসিয়া আমাকে অভিভূত করিল। মনে হইল আজ গৌসাই এ ভাবেই শক্তিমঞ্চার করিয়া আমাকে রূপা করিলেন।”

প্রসাদী বস্ত্র স্পর্শে ভাবাবেশ।

ঠাকুর দিনরাত আসনেই বসিয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কখনও আসন ছাড়িয়া উঠেন না। ঠাণ্ডা ঘরে একটানা বসিয়া থাকাতেই বোধ হয় পায়ে বাতের বেদনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে শীতও খুব পড়িয়াছে। মণি বাবু এবং বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের জন্ত একটি উলের ‘ট্রাউজার’ আনিয়া ঠাকুরকে পরিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর এ সকল কখনও ব্যবহার করেন না, কিন্তু উহাদের আগ্রহ দেখিয়া খুব সন্তোষভাবে গ্রহণ করিলেন এবং ৫৭ মিনিট পরিয়া রহিলেন। পরে উহা খুলিয়া বৃন্দাবন বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—“বৃন্দাবন! তুমি এটি পর, তুমি পরলেই আমার পরা হবে।”

বৃন্দাবন বাবু কোনও প্রকার দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা পরিয়া বসিলেন। আমরা সকলে দেখিয়া বড়ই বিব্রত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্র তিনি স্বয়ং হাতে ধরিয়া দিলেন, উহা ত মাথায়ই রাখিতে হয়; বৃন্দাবন বাবুর এ কি প্রকার ধৃষ্টতা যে অনায়াসে উহা পায়ে লাগাইয়া পরিলেন!

তিন চার মিনিট পরেই বৃন্দাবন বাবু উহা অতিশয় ব্যস্ততার সহিত খুলিয়া ফেলিলেন এবং বিস্মিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন—“মশায়! এ কি!! একটা ‘ইন-অনিমেট’ (Inanimate) বস্তুতেও এত ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity) ঢুকিল! আমার সমস্তটি শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, কিছুতেই আর এটি রাখিতে পারিলাম না। এ কি রকম?” এই বলিয়া বৃন্দাবন বাবু পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা ত তখন অবাক! ভাবিলাম, ‘ঠাকুরের হাত পা টিপিয়া শরীরের সেবা করিয়াও ত কত সময় কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কখনও ত এমন একটা কিছু অনুভব হয় না, যাহাতে শরীর ও মন অস্থির বা অগতঃপ্রকার হয়; আর দু’চার মিনিটের জন্ত ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্র বৃন্দাবন বাবু স্পর্শ করিয়া এমনই হইলেন যে শরীর তাঁর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল! তিনি পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আহ্বারান্তে প্রসাদ লইয়া মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। বৃন্দাবন বাবু খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক বলিয়া আজ প্রসাদ পাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলেন না। শূন্ত পাতাখানা-মাত্র কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেলেন; উহা কপালে কয়েকবার স্পর্শ করাইয়া খুব

আগ্রহের সহিত ডাঁটা সহিত সমস্ত কলাপাতাখানাই চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁর ভক্তিতাবে ছল্ ছল্ চক্ষু ও সমস্তটি মুখের এক প্রকার চমৎকার প্রভা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ধন্য বৃন্দাবন বাবু!

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে ঠাকুর কয়েকটি গুরুভ্রাতার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবন বাবুও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—“বৃন্দাবন, তোমার বাড়ীটি ত বেশ। তোমার সেই কুঞ্জ কই?” শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়াইয়া করঘোড়ে বাড়ীটিকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন। একটু পরে কথায় কথায় বলিলেন—“বৃন্দাবনের বাড়ী যেয়ে শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ’য়ে গেল; ইচ্ছা হ’ল, একবার ঐ মাটিতে প’ড়ে খুব গড়িয়ে নেই। বাড়ীটি কি সুন্দর! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!”

রাত্রিতে বৃন্দাবন বাবু আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে পাইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “মশায় বাড়ী পরিষ্কার হোক আর যাই হোক, এখন ভূতের জালাতনে বাড়ীতে টেকা যে শক্ত হ’য়ে পড়ল! আপনার সাধন নিয়ে আর কিছু হোক আর নাই হোক, ভূতে কিন্তু বেশ বিশ্বাস হ’ল।”

ঠাকুর বলিলেন—“শুধু ভূতে কেন? যাহা সত্য সে সকলেই ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হবে। সবই ত উড়ায়ে দিয়ে বসেছিলে!”

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দ বাবু অগ্র সম্প্রদায়ের একটি মাহাত্ম্যার নিকট যাতায়াত করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। অত্ৰ তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“গুরুর সঙ্গ অপেক্ষা অগ্র কোন সাধুর সঙ্গে যদি অধিক আনন্দ হয়, তা হ’লে সেখানে যাওয়া যায় কি না, এবং গুরুর নিকট না আসাতে কোন অপরাধ হয় কি না?”

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন,—“যার যেখানে গিয়ে আনন্দ হবে, উপকার পাবে, সে সেখানেই যাবে। গুরুর কাছে যেয়ে আনন্দ না হ’লে, উপকার না পেল, সেখানে না যাওয়াই ভাল; এরূপ স্থলে যাওয়াতে বরং পাপই হয়।”

বাসা পরিবর্তন।

আমাদের বর্তমান বাসাতে জলের, পাইখানার, রান্নার ও থাকার বড়ই অসুবিধা হইতেছে;

তাহার উপর দিন দিন লোকসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুরমা

একটি ঝি ও নীতানাথকে * সঙ্গে লইয়া কিছুকাল এখানে থাকিবার প্রত্যাশায় শান্তিপুর হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চারি পাঁচ দিন মাত্র থাকিয়াই চলিয়া গেলেন।

* শ্রীমদ নীতানাথ, প্রভুজীর ছোটভ্রাতা ও ব্রজগোপাল গোস্বামীর পৌত্র ও ষোড়শনাথ গোস্বামীর পুত্র।

শ্রীমতী শান্তিসুধা ও তাঁহার ছেলে (দাউজী) দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের এখানে আনাইয়াছেন। শান্তিসুধার সঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইয়া কয়েকটি গুরুভগ্নীও উপস্থিত এখানেই রহিয়াছেন। মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুভ্রাতা বাড়ী ঘরের সম্বন্ধ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আফিসের সময় বাদে দিব্যরাত্রি এখানেই আছেন। তাঁহারা ভাতেসিদ্ধি ভাত খাইয়া আফিসে চলিয়া যান, রাত্রিতে মুড়ি মুড়িকি হু'এক মুঠা পাইলেই যথেষ্ট মনে করেন। তারপর নবাগত লোকের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এদিকে বাড়ীর মালিক সুরেশ বাবুরও ছুটি শেব হইয়া আসিল। স্ততরাং অবিলম্বেই আমাদের অগ্রত্ন না যাইয়া উপায় নাই। ঠাকুর সকলকেই একটি বাসার অনুমোদন করিতে বলিলেন। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা নিজদের বাসার সন্নিহিতে বাড়ী তাল্লাস করিয়া অনুবিধা অনুবিধা ঠাকুরকে জানাইতেছেন। শ্রীচরণ বাবুর চেষ্টায় শ্রামবাজার বড় রাস্তার তেমাথার উপরে কাস্তি ঘোষের বাড়ীর তেতালাটি মাত্র ভাড়াইয়া পাওয়া গেল। বাসাখানা, নবীন বাবুর বাড়ীর কাছে, রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু তেতালায় ঠাকুরের থাকা হইলে, নিয়ত উঠা নাবা সকলেরই অনুবিধা হইবে বলিয়া ঠাকুর একটু অসম্মতি জানাইলেন। পরে নবীন বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের আগ্রহ এবং মণি বাবুর জেদ দেখিয়া, অগত্যা সেই বাসায়ই যাইতে রাজি হইলেন। আগামী কল্যা আহারান্তে আমরা ঐ বাসাতেই যাইব স্থির হইয়া গেল।

শ্রামবাজারের বাসা।

অন্ত ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার পারলৌকিক কল্যাণার্থে ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১লা ভিদের্ষর, উপাসনাদি হইবে। ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া যোগজীবনের সহিত তথায় মঙ্গলবার। চলিয়া গেলেন। শ্রামবাজারের নতুন বাসায় উপস্থিত বেবন্দোবস্তের ভিতরে পীড়িতাবস্থায় শান্তিসুধার থাকার অনুবিধা হইবে, এইজন্য বৃন্দাবন বাবু তাঁহার বাসায় উহাকে লইয়া গেলেন। শান্তিসুধা এখন কয়েক দিন সেখানেই থাকিবেন।

অপরাত্নে আমরা সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া শ্রামবাজারের বাসায় পহঁছিলাম। এ বাড়ীর তেতালাটিমাত্র আমাদের জন্য লওয়া হইয়াছে। হৃৎঘরের মধ্যস্থলে দেওয়ালের ধারে উত্তরমুখে ঠাকুরের আসন পাতিলাম। ঠাকুর নিজ আসনের পশ্চিম দিকে দরজাটি মাত্র ব্যবধান রাখিয়া আমাদের আসন করিতে বলিলেন, আমি সেইমত ঠাকুরের বামদিকে প্রায় চার ফুট অন্তরেই নিজের আসন করিলাম। নিত্যহোম আমরা অগ্রত্ন করিতে হইবে।

বাসার অবস্থা দেখিয়া খুব ভালই মনে হইল। হৃৎঘরের ভিতরে অনায়াসে পঞ্চাশ জন লোক থাকিতে পারে। এই ঘরের দক্ষিণে ও উত্তরে অগ্রশস্ত লম্বা বারান্দাও রহিয়াছে। পূর্বে ও পশ্চিম দিকে দুই খানা ঘর আছে। পূর্বের ঘরের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে দোতালার প্রকাণ্ড ছাদ এবং পশ্চিমের

ঘরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে বড় একখানা রান্নাঘর আছে। বাড়ীর একেবারে উত্তর-পূর্ব কোণে একটি মাত্র পাইখানা। উহা ঠাকুরের ব্যবহারের জন্ত নির্দিষ্ট রহিল।

হলঘরের পশ্চিম দিকের ঘরখানাতে ভাণ্ডার রাখার ব্যবস্থা হইল। চন্দিশ ঘণ্টা ঠাকুরের নিকট গুরুভাতারা বসিয়া থাকিতে অস্থবিধা বোধ করেন, স্ততরাং এই ঘরে প্রয়োজনমত তাঁহাদের বিশ্রাম করাও চলিবে। হলের পূর্বদিকের ঘর মেয়েদের জন্ত রহিল।

তেতালায় জলের কোন ব্যবস্থা নাই; ভারীর দ্বারা জল তুলিয়া লইতে হইবে। পাইখানা একটি মাত্র থাকায়, গুরুভাতারা নবীন বাবুর বাড়ী যাইবেন। রাত্তা হইতে তেতাল। পর্যন্ত সোজা সিঁড়ি থাকিতে ঐ বাড়ীতে যাতায়াতের কোনও ক্লেশ নাই। নবীন বাবু তাঁর বাড়ীখানা গুরুভাতাদের দিয়া রাখিলেন। আবশ্যকমত যে কেহ ওখানে অবাধে যাইতে ও থাকিতে পারিবেন।

আজ সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দলে দলে গুরুভাতারা আসিয়া পড়িলেন। গোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ণনের খুব ঘট। পড়িয়া গেল। সকলেরই এ বাসায় আসিয়া মহা আনন্দ। সঙ্কীর্ণনান্তে ঠাকুর স্বহস্তে হরির লুট দিলেন। গুরুভাতারা আজ অনেকেই এখানে রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় একটা পর্যন্ত আনন্দ-আলাপে কাটাইয়া আমরা নিদ্রিত হইলাম।

শ্যামবাজারে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য।

শেষ রাত্রিতে প্রায় ৪টার সময়ে ঠাকুর আসনে উঠিয়া বসেন। গুরুভাতারাও অনেকেই এই সময়ে জাগরিত হন এবং আপন আপন আসনে বসিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর করতাল বাজাইয়া দুই তিনটি গান করেন। তৎপরে গুরুভাতারা ভোর পর্যন্ত প্রাতঃসঙ্কীত করিয়া থাকেন।

ঠাকুর প্রত্যুষে কীর্ণনান্তে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। অর্দ্ধঘণ্টা পরে আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। বেলা প্রায় ৮টার সময়ে চা-সেবা হয়। তৎপরে কিছুক্ষণ গুরুভাতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া পাঠ আরম্ভ করেন। প্রায় ১১টা পর্যন্ত পাঠ হয়। ১১টার পরে অর্দ্ধঘণ্টার জন্ত শৌচে যান। ১২টার সময়ে আহার হয়। আহারের পর অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার অবসর পাওয়া যায়। তৎপরে ঠাকুর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রায় ৪টা পর্যন্ত কাটাইয়া দেন। এই সময়ে অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণে ঠাকুরের বুকের আলংখিলা ভিজিয়া যায়। ৪টার পর তাঁহার বাহু স্ফূর্তি হয়, তখন নানা শ্রেণীর লোকের সমাগমে ঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কথা-বার্তা, প্রশ্ন-উত্তর, হাসি-গল্প সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিতে থাকে। আমি নিজের রান্নার ব্যাপারে এই সময়ে ব্যস্ত থাকি স্ততরাং অনেক প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে পাই না। বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটিলে বা প্রয়োজনীয় উপদেশ হইতে থাকিলে রান্না ফেলিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। রান্নাঘরটি খুব নিকটে বলিয়া এ বিষয়ে আমার বেশ স্থবিধা হইয়াছে।

সন্ধ্যায় হরিসঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সময়ে ঘরের ভিতরে সকলের স্থান হয় না। সঙ্কীৰ্ত্তন সাধারণতঃ রাত্রি ৯।০ টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। পরে ঠাকুরের সেবা হয়। তৎপরে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে ঠাকুরের হাসি-গল্পে, কথায়-বার্তায় কাটিয়া যায়, তারপর একেবারে নিশ্চল। রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেলে ঠাকুর একবার শয়ন করেন। কোন কোন দিন সমাধিস্থ থাকায় শয়ন করাও হয় না। এইভাবে সমস্ত দিনরাত্র অতিবাহিত হইতেছে।

যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়।

আকাশবাণী—“গণ্ডি ছাড়”।

ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ, লক্ষপ্রতিষ্ঠ, কৃতবিজ্ঞ একটি ব্রাহ্মবন্ধু (ত্রিযুক্ত ১৭৪ অগ্রহায়ণ, উমেশচন্দ্র দত্ত), ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘যথার্থ সত্য কি উপায়ে
বুঝার। লাভ হয়?’

ঠাকুর বলিলেন—“যথার্থ সত্য লাভ করিতে হ’লে, সকল প্রকার সংস্কার বর্জিত হ’তে হয়। সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হ’লে, মনটি একেবারে নির্মল হ’য়ে যায়, তখন কোন ভাবই আর থাকে না। সেরূপ অবস্থায়ই সত্যের অনুসন্ধান। মত, আচরণ, ভাব ও সংস্কার মন হ’তে একেবারে চ’লে গেলে যা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সত্য। সংস্কার-বর্জিত অন্তরে, সত্যের এক কণা মাত্র প্রকাশ হ’লেও, তাহাই অমূল্য। বৌদ্ধ যোগীরা প্রাণালীগত উচ্চসাধন অবলম্বন করবার প্রারম্ভেই, এই সংস্কারটিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট ক’রে নেন। এতে তাঁদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। গোড়াতে সংস্কার বর্জিত হন ব’লেই, বৌদ্ধদিগকে অনেকে নাস্তিক বলেন।”

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—“যাঁরা কোনও মতের বা সংস্কারের বশবর্তী হ’য়ে চলেন, তাঁরাই বিশেষ বিশেষ দলের মধ্যে আবদ্ধ হ’য়ে পড়েন। যাঁরা কোনও মতামতের বা সংস্কারের অধীন না হ’য়ে, কেবল মাত্র নিজের অন্তরে সত্যেরই অনুসন্ধান করেন, তাঁদের কোনও দল নাই, সম্প্রদায়ও নাই। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক অবস্থায় কিছু কালের জন্য আমি বাগআঁচড়ায় ছিলাম, ঐ সময়ে আমার কার্য্যপ্রাণালী, বক্তৃতা ও উপদেশাদি নিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে খুব চলুস্কুল পড়েছিল। আমি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাতে লাগলাম। আমার কয়েকটি বন্ধু ঐ সকল আলোচনার প্রতিবাদ করিতে, কলিকাতা হ’তে আমাকে পুনঃপুনঃ লিখিতে লাগলেন এবং আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হ’তে বললেন। আমি বিষম সমস্যায় প’ড়ে গেলাম। নিজের কর্তব্যবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে

ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে থাকা ঠিক হবে কি না, প্রাণে সর্বদা এই আলোচনা হ'তে লাগল। আমি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করলাম—‘ঠাকুর, এ সময়ে আমার কি করা কর্তব্য, ব'লে দাও।’ এ সময়ে পরিস্কাররূপে আকাশবাণী হ'ল, শুন্লাম ‘গণ্ডির ভিতরে থাকলে, জীবনে সত্য লাভ হবে না।’ আকাশবাণী শুনে আমি নিশ্চিত হ'লাম। মানুষের দিকে চেয়ে চললে, ধর্মকর্ম কখনও হয় না। মানুষে আমার কার্যের নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, সেই দিকে দৃষ্টি পড়লেই সর্বনাশ। কারও দিকে না তাকায়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, যদি নিজের কর্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য ক'রে যেতে পারি, তবেই রক্ষা, না হ'লে নিজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত, আবার এই সত্যলাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্যলাভের জন্য সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চলতে হবে, তা বলা যায় না। মানুষ যেমন পৃথক পৃথক, তাদের প্রকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অবলম্বন করা আবশ্যিক হয়।”

একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশায়! আহারের সঙ্গে কি ধর্মের কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, খুব আছে। আহার বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অপবিত্র আহারে শরীরে ব্যাধি জন্মে, মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়; সুতরাং ধর্মলাভ কঠিন হ'য়ে পড়ে। সর্বদা পবিত্র আহার করতে হয়।”

আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।

আজ সমস্ত দিন উদবেগে ও অশান্তিতে গিয়াছে। ধর্মলাভ করিব আশায় সংসারস্থখে জলাঞ্জলি দিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কত ক্লেশ করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কোন একটা বিষয়ে যে কৃতকার্য্য হইব এক্রপ ভরসা পাইতেছি না। ঠাকুর ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন এই পথান্ত! তাতে উপকার আর কি হইতেছে? শ্রীসঙ্গটিই মাত্র করিতেছি না। মনে মনে সমস্তই ত চলিতেছে। একটা সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে সেই ধ্যানেই ত থাকিতে অধিক আরাম পাই। হায়! হায়!! আমি আবার জীবনে ধর্মলাভ করিব? যে সকল গুরুভ্রাতা শ্রীসঙ্গ করিতেছেন, তাঁহারাও ত আমা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দ করিতেছেন! সুতরাং এ ব্রহ্মচর্য্যে লাভ কি? যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য আর হইল কই?.....ইত্যাদি চিন্তায় আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সকলে নিদ্রিত

হইলেন, আমি বিছানায় পড়িয়া সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ছটফট করিতেছি, ঠাকুর সমাধিস্থ—রাত্রি প্রায় ছুটি, অকস্মাৎ ঠাকুরের মুখ দিয়া এই কথা কয়টি বাহির হইয়া পড়িল—

“এক পরিবারের দুই কর্তা, এক রাজ্যে দুই রাজা, মঙ্গল কখনও হয় না। নিজে ম’রে গিয়ে ইষ্টদেবতাকে দেহমনের রাজা করিতে হবে। না হ’লে আর কল্যাণ নাই। বৃক্ষের বীজ পচলেই তা অক্ষুরিত হয়। অভিমান নষ্ট হ’লেই চিত্তে চৈতন্য প্রকাশ পাবে।”

একটু খামিয়া আবার বলিলেন—“গভীর নিশীথে, নির্জনে নিজের ভিতরে প্রবেশ ক’রে, অনুসন্ধান করলে ক্রমে জানা যায় আমি কি ! ব্রহ্মচর্য্যই সমস্ত সাধনের গোড়া। অনুগত না হ’লে সেটি হবার যো নাই। একমাত্র গুরুকৃপায়ই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য হ’লে আর কিছুই বাকি থাকে না। তখন সমস্ত অবস্থা “করতলশস্ত্র আমলকবৎ” হ’য়ে থাকে। অনুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।”

আমি অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ঠাকুরের এই কথা কয়টি ভাবিয়া ভাবিয়া কাটাইলাম। কোনও প্রশ্ন নাই, ইঙ্গিত নাই, নিজের জালায় নিজে জলিতেছি ; সমাধিস্থ থাকিয়াও ঠাকুর তাহা অমুভব করিয়া উপদেশ দানে আশস্ত করিলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর !

এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে।

ঠাকুর এই বাড়িতে আসিয়াছেন, পরে বহুলোকের সমাগম হইতেছে। দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ঠাকুর অপরাহ্ন চারিটা হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিনই অপরাহ্নে বহুদূর হইতেও বিভিন্ন অবস্থার লোক সঙ্গ প্রত্যাশায়, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। শিক্ষিত শ্রমজের শীর্ষস্থানীয় মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ শীল মহাশয় ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ আলোচনায় পরম সন্তোষ লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে ?”

ঠাকুর এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—“স্কুল কলেজের ছেলেদের জীবনের উপরেই দেশের সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করছে। আমাদের দেশে শ্রমীদের সময়ে, তাঁহারা ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, বীর্ঘ্যধারণ ও সত্যরক্ষা অভ্যাস করায় দিতেন। বর্তমান সময়ে ছেলেদের শিক্ষা সে প্রণালী ধ’রে হয় না। এজন্য শিক্ষালাভ ক’রেও সে প্রকার ফল হয় না। আমি যখন ঢাকাতে ছিলাম, স্কুল কলেজের ছেলেরা এসে প্রায়ই এই প্রশ্ন করতেন, ‘মহাশয় আমাদের কু-অভ্যাস কিসে ত্যাগ করতে পারব ? ছেলেবেলা আমাদের পিতা, মাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকেরা কখনও বুঝায় দেন নাই যে, বীর্ঘ্য নষ্ট

করা অনিষ্টকর; সুতরাং সে বিষয়ে সাবধান হ'তে কখনও চেষ্টা করি নাই! এখন বুঝি যে ওতেই আমাদের সর্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে! কিন্তু কি করব? অনেক কালের কু-অভ্যাস এখন আর বহু চেষ্টাতেও ছাড়তে পারছি না।' বাস্তবিক সর্বত্রই এ বিষয়ে ছোট ছোট ছেলেদের ভিতরে একটা শিক্ষা না থাকাতে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হ'চ্ছে। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁরা যদি ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলে মিশে এমন সুবিধা ক'রে দেন যে, ছেলেরা তাদের ভিতরের সমস্ত অবস্থা নিঃসঙ্কোচে শিক্ষকদের নিকট বলতে পারেন, এবং এ সকল কু-অভ্যাসের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়েও একটা সংস্কার ছেলেদের মনে জন্মায়ে দেন, তা হ'লেই তাদের এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়। যে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করছে, সম্প্রতি দেশে আর সে শিক্ষা নাই। একবার অনেক দিন হয় হিমালয়ে একটি মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম; তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ দেশের কল্যাণ কিসে হয়?' তাতে তিনি বলেছিলেন, 'একমাত্র সত্য ও বীৰ্য্য রক্ষা করলেই দেশের কল্যাণ হবে।' তা ব্যতীত দেশের আর কল্যাণ নাই।"

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু দেশমাত্ম হুপ্রসিক্ত অধ্যাপক। ঠাকুরের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ধর্ম—সহজ লাভ্য নয়।

কয়েকটা ভক্তলোক আসিয়া 'ধর্ম কি উপায়ে সহজে লাভ হয়', এ বিষয়ে ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—“আজকাল দেখছি, সকলেই খুব সহজে ধর্মলাভ করতে চায়। ধর্ম যে কত মূল্যবান বস্তু, ধর্ম লাভ করা যে কতদূর কঠিন, তা একবার কেহ ভাবে না। অন্তরের কু-অভ্যাস সমস্ত দূর না হ'লে, ধর্ম কিছুতেই লাভ হয় না। বহুদিনের কু-অভ্যাস মানুষ ইচ্ছামাত্রেই ছর করতে পারে না; তা হ'লে এক দিনের কর্মও নয়। এসব দূর করতে যে সময়টুকু লাগে, ততটুকু সময়ও কেহ ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে চায় না। খুব শীঘ্রই একটা কিছু পেতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে; তাই কিছুই হয় না। তারপর সকলেই আবার আপন আপন রুচিমত ধর্ম চায়। নিজ রুচির সঙ্গে একটু অমিল হ'লে, তা ধর্ম ব'লেই কেহ স্বীকার করে না। এই হ'লে কারণে, ধর্ম লাভ করা লোকের কঠিন হ'য়ে পড়েছে। ধর্ম একটা গাছের ফল নয় যে, ইচ্ছামাত্রই তা টপ্ ক'রে কেহ পেড়ে নিবে।"

তাহারা আবার প্রশ্ন করিলেন, “ভগবান্কে লাভ করিতে হইলে, তাঁর প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, না শুধু জপ তপ করিলেই হইবে?”

ঠাকুর বলিলেন “ভগবান্কে সহজে লাভ করা যায় না। কেহ সর্ব্বদা তাঁর প্রিয় কার্য্য ক’রে তাঁকে লাভ করেন। কেহ বা সর্ব্বদা ধ্যান ক’রে তাঁকে প্রাপ্ত হন; কোন কোন ব্যক্তি নিয়ত জপ ক’রে তাঁর দর্শন লাভ করেন। সকলের এক প্রকার নয়। কে যে কোন্ ভাবে চ’লে তাঁকে লাভ ক’রিতে পারবে বলা যায় না। সকলকেই যে ধ্যান ধারণা জপ তপ ক’রে তাঁকে লাভ করিতে হবে, এমনও কিছু নয়। তাঁর কৃপায়ই তাঁকে লাভ করা যায়। কৃপাই সমস্তের মূল।”

জিজ্ঞাসার অবস্থা; হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্যভাব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“পুরাণাদিতে দেখা যায় শিষ্য গুরুর নিকটে কোনও বিষয় প্রশ্ন করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যের ভিতরে সেই জ্ঞানটিও প্রস্ফুটিত হ’ত। আমাদের তা হয় না কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও মুয়ুক্ষুতা এই সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন না হ’লে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কারও জিজ্ঞাসা করবার অধিকারই হয় না। এ সকল অবস্থা লাভ ক’রে প্রশ্নটি করলে, উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও লাভ হয়। তা না হ’লে, মনে যা আসে তাই যদি ভাসা ভাসা ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, উত্তরটিও সেইরূপ ভাসা ভাসা হ’য়ে থাকে; কোনও ফলই হয় না। অন্তরে যথার্থ ব্যাকুলতা না হ’লে, বস্তুর প্রকৃত অভাবজ্ঞান না জন্মালে, প্রশ্ন করা, ছেলেদের পয়সা না নিয়ে বাজারের সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখে, দর জিজ্ঞাসা করার মতই হয়। ওর কোন মূল্যই নাই। অনেক সময়ে প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া আচার্য্যেরা কোন প্রয়োজনই মনে করতেন না; এমন কি ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত বলেছিলেন, ‘তপ! তপ! তপ!’ তপস্যা কর, তপস্যা কর, তপস্যা করলেই সমস্ত বুঝতে পারবে।”

একজন বলিলেন, “একটা জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃশব্দ হইলে, তাহা করিতে যেমন উৎসাহ হয়, না বুঝিয়া করিলে সে প্রকার ত হয় না?”

ঠাকুর বলিলেন—“ঐ সকল পাশ্চাত্যভাব। আগে বুঝবো পরে করবো, এ আমাদের দেশের বা সনাতন ধর্ম্মের ভাব নয়। আমাদের শাস্ত্রকর্তাদের উপদেশ, ‘আগে কর, পরে বুঝ।’ সকল বিষয়েই কতকগুলি স্বীকার্য্য আছে, তা মেনে নিতেই হয়। যেমন ‘ক’ এর

পর 'খ', 'খ' এর পর 'গ' পড়তে হয়। এতে, গোড়া ধরে, 'তা কেন' প্রশ্ন করলে, শিক্ষা কখনও হয় না।"

আজ হোমের জন্ত বিশ্বপত্র সংগ্রহ না হওয়ায়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোনও ফুল দিয়া কি হোম হয় না?'

ঠাকুর বলিলেন - 'শান্তদের হোম অপরাজিতা ফুল দিয়ে হয়, আর বৈষ্ণবদের কুন্দ পুষ্প ও শ্বেত করবী দ্বারা ব্যবস্থা আছে।'

ব্রজমায়ীদের স্বাভাবিক ভাব ও ভজন।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নানা কথায় ঠাকুর আজ শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজমায়ীদের ভাব ও ভজন সম্বন্ধে বলিতে

১২শে অগ্রহায়ণ,

শুক্রবার।

লাগিলেন - "নিতান্ত সাধারণ অবস্থায় গরীব ছুখী পাড়ারগেয়ে

ব্রজমায়ীদেরও ভগবানের প্রতি যেরূপ একটা স্বাভাবিক স্নেহ মমতা

বাৎসল্যভাব দেখা যায়, বহু সাধন ভজনেও তা লাভ করা দুঃসাধ্য। গোবিন্দজীকে তাঁরা এখনও সেই ভাবেই দেখেন। দলে দলে ব্রজমায়ীরা দধি, দুগ্ধ মাখনাদি ভাঁড়ে ভাঁড়ে নিয়ে সমস্ত রাস্তা নৃত্য ও গান করতে করতে, গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হন, ঠিক নিজের কোলের ছেলেটিকে মা যেমন আদর করেন, তেমনই তাঁরা গোবিন্দজীকে কত প্রকার আদর করেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, গায়ে হাত বুলায়ে দেন, চুমো খান, নিজের পায়ের ধূলা হাতে নিয়ে গোবিন্দজীর কপালে মাখায়ে দেন, এবং আশীর্বাদ করেন; গোবিন্দজীকে দেখতে দেখতে বাৎসল্যভাবে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁকে তাঁরা ঠিক যেন ঘরের ছেলে মনে করেন। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম - "ব্রজমায়ীদের ভগবানের প্রতি কি শুধু বাৎসল্য ভাবই হয়, না অগ্ন্যাক্ত ভাবও হয়?"

ঠাকুর বলিলেন - "ব্রজমায়ীদের সকলেরই ত আর এক প্রকার ভাব নয়। ভজন ত কত প্রকারের। কেহ বা নানা প্রকার বেশভূষা করে অলঙ্কারাদি পরে, এক একবার নিজের দিকে তাকাচ্ছেন, নিজেরই রূপ নিজে দেখে ভাবে বিভোর হয়ে পড়ছেন। এ অবস্থায় তাঁরা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েও অনেক সময় পড়ে থাকেন। কেহ বা ছ'ঘণ্টা ধরে মুখই পুঁচছেন, তিলকই কত বার করছেন আর পুঁচছেন! পছন্দমত হয়ে গেলে, আয়নাতে একবার নিজের মুখখানি নিজে দেখে একেবারে অবশ্যজ হয়ে চলে পড়েন। তিন চার ঘণ্টা আর সংজ্ঞাই থাকে না। শরীরে কত প্রকার ভাবেরই খেলা হ'তে থাকে।

কেহ বা একখিলি পান মুখে দিয়ে চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তাই চিবাচ্ছেন। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। ভাবে ডগমগ। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সমস্তই এককালে প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যাচ্ছেন। সাধারণ লোকে এ সকল ভাব, এ সকল অবস্থা কি প্রকারে বুঝবে? এ সকল ভজনই বা কি প্রকারে জানবে? দেহদ্বারা ভগবানের ভজন এ যে কত মধুর, তা যিনি করেন তিনিই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনে এসব ভাবেই ভগবানের উপাসনা। ঐশ্বর্য্যভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। স্থানের প্রভাবই এমন চমৎকার যে, একটা সাধন ভজন নিয়ে থাকলেই চিত্তে আপনা আপনি এ সকল ভাব ও ভক্তি উদয় হ'য়ে থাকে।”

ভাব কাকে বলে ?

আজ শনিবার বলিয়া বেলা দুইটা হইতেই ঠাকুরের নিকট বিস্তর লোকের সমাগম আরম্ভ হইল।
২০শে অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসমাজের গণ্যমান্য ঠাকুরের কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া বিবিধ ধর্ম্ম
৩ই ডিসেম্বর, শনিবার। প্রসঙ্গের পর ঠাকুরকে বলিলেন, ‘বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবভক্তি দেখিতেছি
বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ করিতেছে। আর তাতে জ্ঞানের দিক্‌টা যেন
দিন দিন নিবিয়া যাইতেছে।’

ঠাকুর বলিলেন—“বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবভক্তি হ'লে জ্ঞানের দিক্‌ কখনও নিবে যায় না।
নাচাকৌদা, কান্নাকাটি, মাতামাতি করা—এ সকলকে ত আর ভাব বলে না। ভাব বড়
সহজ জিনিস নয়।”

একটি বাবু বলিলেন, “মহাশয়! আমরা ত ওসবকেই ভাব বলি, ভাব তবে কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“ভাব ত ঢের পরে। ভাবের অক্ষুরমাত্র জন্মিলে যে সকল অবস্থা দেখা
যাবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তা এইরূপ বলেছেন—

“ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।

আশাবদ্ধসমুৎকর্থা, নামগানে সদা রুচিঃ ॥

আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।

ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ সূ্যর্জাতভাবাকুরে জনে ॥”

ভাব জন্মিবার পূর্বেই এ সকল ত হওয়া চাই; মুখে ‘ভাব ভাব’ বললেই ত হবে না।

১। “ক্ষান্তি”—সকল বিষয়েই তার ধৈর্য্য ও ক্ষমা থাকবে। নিন্দা অপমান

অত্যাচারাদি যত দুর্ব্যবহারই তার প্রতি হউক না কেন, কিছুতেই তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না। সর্বদা ক্ষমাশীল হবে।

২। “অব্যর্থকালত্বম্”—সে কখনও বৃথা কালক্ষেপ করবে না; সর্বদাই আত্মার কল্যাণকর কিছু না কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে সময় অতিবাহিত করবে।

৩। “বিরক্তি”—সকল বিষয়েতেই তার বৈরাগ্য, বিষয়ে অনাসক্ত ভাব জন্মিবে।

৪। “মানশূন্যতা”—গর্ব অভিমানাদি কিছুই তার থাকবে না।

৫। “আশাবদ্ধসমুৎকর্থা”—ভগবৎকৃপালাভ এবং নিজের অভিলষণীয়-বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে একটা খুব দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে। ইষ্টবস্তুলাভ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই একটা ব্যস্ততা থাকবে।

৬। “নামগানে সদাকুচিঃ”—ভগবানের নাম কীর্তনে সর্বদাই অভিলাষ হবে, আনন্দ হবে।

৭। “আসক্তি স্তদগুণাখ্যানে”—ভগবানের গুণ কীর্তনে সর্বদাই সে অনুরক্ত থাকবে।

৮। “প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে”—ভগবানের বসতি স্থলে—কেহ কেহ বলেন বিগ্রহ প্রতিমা ও তীর্থাদিতে, আবার কেহ কেহ বলেন সমস্ত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সর্বভূতে—তার প্রীতি ও ভালবাসা হবে।

“ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাকুরে জনে”—ভাবের অক্ষুরমাত্র যার জন্মেছে, এ সকল লক্ষণ পূর্বেই তার হবে। ভাব কি একটা তামাসার কথা? চক্ষুর একটু জল পড়লেই ভাব হ'ল।

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নির্ভারুচি স্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি।

সাধকানাময়ং প্রেয়ঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥”

সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা; শ্রান্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। শাস্ত্র সদাচারে বিশ্বাস জন্মিলেই সাধুসঙ্গের অধিকার হয়। শাস্ত্র সদাচারের অনুসরণ ক'রে, সাধুরা কিরূপ জীবন লাভ করেছেন, কি প্রকার শাস্তিতে, আরামে, আনন্দে দিন যাপন করছেন, এ সমস্ত দেখে শুনে সাধুদের মত জীবনলাভ করতে একটা আকাঙ্ক্ষা হয়, আগ্রহ হয়। এ প্রকার

হ'লেই, তখন ভজন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্তে কর্তে সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হ'য়ে যায়। অহুরে কোনও প্রকার অনিষ্টকর, প্রতিকূল অবস্থাই আর থাকে না, ভজনেতে ক'রে সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যায়। এসব হ'য়ে গেলে তার পর ভাব। এই ভাবের পরে ভক্তি, তার পর প্রেম। ভাব বৃক্ষ, ভক্তি পুষ্প, প্রেম সুপক্ব ফল। এ সকল বহুদূরের কথা !”

প্রশ্ন—“অশ্রুকম্পপুলকাदि যে হয়, তাহা কি ভাব নয় ?”

ঠাকুর বলিলেন—“ওসব ভিতরের একটা অবস্থার বিকাশ বটে কিন্তু অশ্রু কম্প হ'লেই তার এসব ভাব হ'য়েছে, এরূপ যে মনে কর্তে হবে, তার কোনও অর্থ নাই। কোন্ ভাব উপস্থিত হ'লে, চ'খের জল ঐ সময়ে কোন্ দিক্ দিয়ে কি ভাবে পড়'বে, কোন্ ভাবের চ'খের জলের স্বাদ কি প্রকার হবে, তা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে শাস্ত্রকর্তারা ভক্তির দর্শনশাস্ত্রে মীমাংসা ক'রে গেছেন। অভ্যাসের দ্বারাও ত অনেকে অশ্রুকম্পপুলকাदि আয়ত্ত ক'রে থাকেন।”

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুষের লক্ষণ।

প্রশ্ন—“মহাশয় ! অনেকে বলেন গুরুকরণ না হ'লে ধর্মলাভ করা যায় না। এ বিষয়ে আপনার মত কি ?”

ঠাকুর বলিলেন—“মতামতের কথা আমি কিছু জানি না ; বলতেও পারি না। তবে আমি এ কথা নিশ্চয়রূপে জেনেছি যে, গুরু ব্যতীত ধর্ম কখনও লাভ হ'তে পারে না। সামান্য একটা কিছু জানতে হ'লে, সামান্য একটু শিক্ষালাভ কর্তে হ'লে, গুরুর প্রয়োজন হয় ; গুরু ব্যতীত হবার যো নাই। আর সর্বাপেক্ষা যে বিষয়টি ছুর্বেদ্য, গুরু ব্যতীত অনায়াসে তা লাভ হবে এ কখনও হয় না।”

প্রশ্ন—“পশু, পক্ষী, মনুষ্য—সকলেরই ত কার্য্য দেখে শিক্ষালাভ হ'তেছে ; সাধারণ ভাবে সকলেই ত গুরু, তবে বিশেষ ভাবে একজন মানুষকে ধরা কেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“বিশেষভাবে একটি মানুষকেই ধরতে হবে। একটি বিশেষ ব্যক্তিতে গুরুত্ব স্থাপন কর্তে পারলেই প্রকৃত গুরু লাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থই গুরুময় হ'য়ে যায়। এরূপটি হ'লে সাধারণ গুরুভাব আর থাকে না।”

প্রশ্ন—“কি রূপ অবস্থার লোককে গুরু কর্তে হয় ?”

ঠাকুর—“যাঁতে ভগবানের চিৎ শক্তির বিলাস হয়, যাঁতে তাঁর জ্ঞান শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই গুরু। গুরু অন্য কেহ হ'তে পারে না। মহাপুরুষেরাই গুরু।”

প্রশ্ন—“আমাদের ত অন্তর্দৃষ্টি নাই, বাহিরের কি কি লক্ষণ দ্বারা আমরা মহাপুরুষদের বুঝিতে পারি ?”

ঠাকুর বলিলেন—“সাধারণতঃ এই পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষদের চেনা যায়।

প্রথমতঃ—মহাপুরুষেরা কখনও আত্মপ্রশংসা করেন না। কার্য্যদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারেও নিজেকে বড় ব'লে জানান না।

দ্বিতীয়তঃ—মহাপুরুষেরা কখনও পরনিন্দা করেন না।

তৃতীয়তঃ—মহাপুরুষেরা কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না ; আত্মার কল্যাণকর কোনও একটা অহুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

চতুর্থতঃ—মহাপুরুষেরা সর্ব্বজীবের দয়া করেন ; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষলতার পর্য্যন্ত হৃৎখে সহানুভূতি করেন ; অন্ত্রের সমস্ত অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব করেন ; কাহারই একটা উদ্বেগের কারণ হন না।

পঞ্চমতঃ—মহাপুরুষেরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন ; কখনও কোনও কারণে চঞ্চল হন না।”

মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান।

এ সকল কথা শেষ হইতে হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শমূর্ত্তি প্রাচীনায়রীয় ধার্মিকপ্রবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশানুসারে, তাঁহার অল্পগত সেবক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—“মহর্ষি অসুস্থ, কাণে ভাল শোনে ন, দৃষ্টিশক্তিও খুব কমিয়া গিয়াছে ; আপনি কলিকাতায় আছেন শুনিয়া, আপনাকে দেখিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তাঁর কতকগুলি কথা আপনাকে তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন।” শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই ঠাকুর মহর্ষিকে উদ্দেশ্য করিয়া, করষোড়ে নমস্কার করিতে করিতে বলিলেন—“আমার পরম সৌভাগ্য যে, তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। আমি তাঁকে দর্শন কর্ত্তে যাব। কখন গেলে তাঁকে দর্শনের সুবিধা হবে ?”

শাস্ত্রী মহাশয় বেলা তিনটা হইতে পাঁচটার মধ্যে সময় নির্দেশ করিলেন। ঠাকুর ঐ সময়েই তথায় উপস্থিত হইবেন বলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যার সময় চলিয়া গেলেন। আমাদেরও সন্ধ্যাকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

মহর্ষির সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎকার—মহর্ষির ভাব ও উপদেশ।

আজ গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের সঙ্গে মহর্ষিকে দর্শন করিতে যাইবেন, সকলেরই মনে কত আনন্দ। আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ঠাকুরের নিকটে নিজ আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম “আমার ভাগ্যে বুঝি মহর্ষির দর্শন ঘটিবে না! যে সময়ে সকলে মহর্ষির নিকট যাইবেন,

২১ অগ্রহায়ণ,
রবিবার,
৬ই ডিসেম্বর।

আমার তখন আহারের সময়। একদিন উপবাস করিয়া থাকিতে আমি কোন কষ্টই মনে করি না, কিন্তু আহার ত আমার শুধু আহার নয়! উহা ঠাকুরের আদেশমত আমার সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত একটি বিশেষ নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, ঠাকুর কি অসন্তুষ্ট হইবেন না? ঠাকুরকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হয় না। এখন কি করি!” এই প্রকার ভাবিয়া ঠাকুরের নিকটে চূপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ঠাকুরের নিয়মিত পাঠ শেষ হইলে, এগারটার সময় আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন—
“কি, আজ তুমি কি করবে? রান্না না ক’রে একমুঠো প্রসাদ পেয়ে নিলে হয় না?”

আমি শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বলিলাম, “আমি কখনও মহর্ষিকে দর্শন করি নাই, যেতে বড় ইচ্ছা হয়।”

ঠাকুর—“তা হ’লে প্রসাদই ছু’টা পেয়ে নিও।”

আমার সুবিধামত ব্যবস্থা ঠাকুর নিজ হইতেই করিলেন দেখিয়া আনন্দে আমার কান্না আসিল। যথাসময়ে প্রসাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

আজ রবিবার স্কুল কলেজ আদালতাদি বন্ধ বলিয়া অনেক গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা ছু’টার পর তের চৌদ্দজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরের সঙ্গে চলিলেন। প্রায় তিনটার সময় আমরা পার্কস্ট্রীটে মহর্ষির ভবনে পৌঁছিলাম। দেখিলাম মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মুখের হলঘরে রহিয়াছেন। আমাদের দিকে দেখিয়াই খুব আদর করিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। এবং মহর্ষিকে শিশিখে ঠাকুরের আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। মহর্ষি ঐ সময় মগ্নাবস্থায় ছিলেন বলিয়া আট দশ মিনিট কাল নীচের ঘরেই আমাদের অপেক্ষা করিতে হইল। বাহ্যক্ষুণ্ণি হওয়া মাত্রই মহর্ষি সকলকে উপরে খাইতে সংবাদ দিলেন, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা সকলেই যাইয়া মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যস্থলে একখানা ‘ইজি-চেয়ারে’ মহর্ষি অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন। দক্ষিণে ও বামে দু’খানা চেয়ার রহিয়াছে এবং তাহারই নিকটে দু’খানা লম্বা বেঞ্চ এমন ভাবে রাখা হইয়াছে যে, তাহাতে বসিয়া সকলেই মহর্ষিকে দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর দুই বেঞ্চের মধ্যস্থলে যাইয়া নমস্কার করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া কাদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে

পবিত্রমূর্তি বৃদ্ধ মহর্ষির শুভ মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্বক মস্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া গদগদ স্বরে “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ।” পুনঃপুনঃ বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, গণ্ডস্থল ভাসিয়া অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাদ হইয়াই মহর্ষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও মহর্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জ্ঞাত নিশ্চুপ হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে ঐ সময়ে মহর্ষিকে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্শ্বস্থ লম্বা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির দক্ষিণ দিকের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমাদের দিকের চেয়ারে বসিয়াছিলেন, “ইহাদের দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইহারা কে?” শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির কাণের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “ইহারা সকলেই গোঁসাইয়ের শিষ্য।”

মহর্ষি বলিলেন, “মামুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে না খেয়ে অত্যাশ্রকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইরূপ নিজে বাহা ভোগ করুছেন, শিষ্যদিগকেও তাহা দিচ্ছেন; ইহাতে গুরুর বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই, শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্ক্ষা করেন। ইনিই ধন্য, ইনিই যথার্থ শিষ্যদের সন্তোষহারক! ইহার দর্শনে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগ্রত হয়।” এ সকল কথার পর ঠাকুরের কুশল প্রশ্ন করিয়া বোলপুরের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বলিলেন, “বোলপুরে একটি আশ্রম হয়েছে। শীঘ্রই উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য হবে। সশিষ্যে তুমি এ উৎসবে যোগদান করলে বড়ই আনন্দিত হব। ঐ আশ্রমটির প্রয়োজন এবং নিয়মপ্রণালী কিরূপ হওয়া তুমি ভাল মনে কর, জানতে ইচ্ছা হয়।”

ঠাকুর বলিলেন — “ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আশ্রম আছে। তাই সাধু সন্ন্যাসীরা ঐ সকল দেশে যাতায়াতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না। কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ প্রকার কোন ধর্ম্মাশ্রম নাই বললেই হয়। যে ছুই একটি আছে—তাহাও সম্প্রদায় বিশেষের। সকল ধর্ম্মাধিগণ একটা স্থানে আশ্রয় পেয়ে, আপন আপন তজ্জন সাধন অবোধে কর্তে পারেন, এক্রপ একটা স্থানের বড়ই প্রয়োজন মনে হয়। শান্তি-নিকেতন যদি সাধু সন্ন্যাসী ফকির দরবেশাদি, সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভগবদ্রূপাসক-গণের শান্তির সাধারণ স্থান হয়, তবে বড়ই কল্যাণ হয়। দেশের একটা যথার্থ মঙ্গল হয়। অসাম্প্রদায়িক ভাবের আশ্রম কোথাও দেখা যায় না। দেশে এটির বড়ই অভাব।”

মহর্ষি ঠাকুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, “সাধু! সাধু!! বাস্তবিক যাহাদের হৃদয়ে বিশ্বদ্রু প্রেম, তাহাদের কথায় অন্তরকে স্পর্শ করে, প্রাণ ঠাণ্ডা হ’য়ে যায়। যথার্থ সাধুর কথা এইরূপই হয়! না হ’লে কথা ভাসা ভাসা হ’য়ে যায়। তুমি যে রকম বল্লে

তাই হওয়া ঠিক, ইহা সত্য। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার ধাঁহাদের উপর রয়েছে, তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্যে গোলমাল চলছে। তোমার এই অসাধারণ উদার ভাব, কখনও তাঁহারা গ্রহণ করতে পারবেন না। আমার অন্তরের কথা আমি কাহাকেও বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝবে, তাই তোমাকে আজ প্রাণের কথা বলে ঠাণ্ডা হব।” এই বলিয়া মহর্ষি নিজ জীবনের কথার সঙ্গে হাকেরের কবিতা মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়া, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া মহর্ষি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—“ভগবান্কে যেমন ভাবে পেতে আকাঙ্ক্ষা তেমনি ভাবে পাচ্ছি না। সময় সময় তিনি দয়া ক’রে দর্শন দিয়ে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হ’য়ে যান, যতক্ষণ আবার সেই প্রেমময়ের উজ্জল রূপ দর্শন না পাই, উন্নতের মত থাকি, প্রাণ আমার ধড়্‌কড়্‌ করে, সময় যে কি ভাবে কাটাই, তিনি জানেন। তিনি দয়া ক’রে দর্শন না দিলে, কি আর করব! জ্ঞানের দ্বারা কখনও তাঁকে লাভ করা যায় না, জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেম ভক্তিই তাঁহাকে লাভ করবার একমাত্র উপায়। তা’ত আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয়; “পুরুষকার” অর্থশূণ্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার। স্বেত অখমেধের ঘোড়া ক’রে, তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন বলেছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা করে, তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে প’ড়ে আছি।” এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর “জয় গুরু জয় গুরু”, বলিতে লাগিলেন। একটু পরে চোখ মুখ মুছিয়া মহর্ষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, “যে ক্ষেত্রে ভগবানের রূপ অবতীর্ণ হয়, পূর্ব হ’তেই তাঁর লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, মঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারিটি একসঙ্গে না থাকিলে প্রকৃত সত্য বস্তু বোল আন ধর্ম, লাভ হয় না! তোমাতে এই চারিটি উপযুক্তরূপে রয়েছে। বিশুদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, মঙ্গুর আশ্রয় লাভ করেছ, তাঁর রূপায় প্রকৃত মঙ্গিক্ষা সচুপদেশ পেয়েছ। তাঁর পর মনুষ্য-চেষ্টায় সাধন তখনও যতটা সম্ভব, তাহাও পূর্ণমাত্রায় তুমি করেছ, সর্বোপরি ভগবানের রূপা, তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রয়েছে। তুমিই ধর্ম!” এই বলিয়া মহর্ষি সংস্কৃত একটি শ্লোক পড়িলেন—

“কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।

নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্ত তেমাং, যেমাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ ॥”

“তুমি যাহাই কর, যখন যেরূপ ভাবে চল, ভগবান্ তাহাই অতি স্বন্দর দেখিতেছেন।”

ঠাকুর বলিলেন—“আপনিই ত আমাকে হাতে ধ’রে মানুষ করেছেন। আমার সবই ত আপনা হ’তে। আপনিই ত আমার গুরু!”

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই মহর্ষি একটু হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, তা ঠিকই বলেছ, গুরু

ত বটেই! তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশায়ের মত! ক, খ শিখতে হ'লে প্রথম যেমন ছেলেদের গুরুমশায়ের নিকটে শিখতে হয়, পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়ে, ঐ গুরুমশায়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন পাঠশালার গুরুমশায়কে গুরু বললে যেমন হয়, তোমার বলাও ঠিক সেইরূপই হচ্ছে।” ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। মহর্ষি এই প্রকার নানা কথা তুলিয়া, ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গাত্রোত্থান করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন—

“আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।”

মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—“আমি তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারি না, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক।”

আমরাও সকলে একে একে মহর্ষির চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ বাঁসায় ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। মহর্ষি খুব স্ফোস্তঃকরণে আমাদেরকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “তোমাদের মঙ্গল হবে, গৌসাইকে তোমরা কখনও ছেড়ো না, ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।”

মহর্ষির নিকট হইতে বাহির হইবার পরেই গুরুভ্রাতা শ্রীচরণবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিই সদগুরুর কৃপা না হ'লে এরকম অবস্থা খোলে না। মহর্ষির এ অবস্থা কিরূপে হ'ল?”

ঠাকুর বলিলেন “মহর্ষির উপর সদগুরুর কৃপা হয় নাই, কে বললে?”

শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভু। মহর্ষির প্রতি গুরুকৃপা।

সগর্ভ ও বিগর্ভ সমাধি।

আমরা ঠাকুরের সঙ্গে সিটি কলেজের ‘প্রিন্সিপ্যাল’ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গুরু, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় পহুঁছিলাম। নবীন বাবু অতি আগ্রহের সহিত আমাদেরকে বসাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্রীনাথ আপনার সহিত নাকি মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তিনি কি বলিয়াছিলেন, অগ্রগ্রহ করিয়া বলিলে বিশেষ স্থখী হইব।”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তাঁর দর্শন পেয়ে প্রথম আমার বাক্যস্মরণ হ'ল না, চরণতলে প'ড়ে কেবল কাদতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে মনের আবেগ একটু শিথিল হ'লে, বললাম—‘ঠাকুর বড় ঘুরেছি।’ তিনি বল্লেন, ‘তোদের কুলেরই ত এই ধরম।’ আমি বললাম—‘দেব, দয়া ক'রে পুনরায় প্রকাশ হ'য়ে, কলির মলিন জীব সকলকে উদ্ধার করুন।’ তিনি বল্লেন—‘প্রকাশ হ'লে কে আর আমাকে এখন বিশ্বাস করবে। সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।’ এইরূপ আরও কত কি বল্লেন।”

ঠাকুর তৎপরে নবীন বাবুকে বলিলেন—“আমার যেন মনে হয়, তাঁকে সে ভাবে দরদ করবার তেমন কেহ ছিল না ; থাকলে আরও কিছুদিন তিনি থাকতেন।”

নবীন বাবুর সহিত ঠাকুরের আরও মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল। সন্ধ্যার পর আমরা বাসায় পহঁছিলাম।

রাতিতে খুব সন্ধীর্জন হইল, মহাশির সম্বন্ধে আজ অনেক কথাবার্তা হইল। নগেন্দ্র বাবুর প্রশ্নে ঠাকুর বলিলেন—“মহাশির যখন হিমালয়েতে সাধন করতেন, তখন একদিন একটি হিমালয়-পর্বতনিবাসী মহাপুরুষ, দৃষ্টিদ্বারা মহাশির ভিতরে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। মহাপুরুষের কৃপার পর হ'তেই, মহাশির অবস্থা খুলে গেছে, ভগবদ্ধ্যানে মহাশির সমাধি হয়।”

প্রশ্ন—“ভগবৎধ্যান ব্যতীতও সমাধি হয় কি?”

ঠাকুর—“সমাধি দুই প্রকার। সগর্ভ ও বিগর্ভ। বায়ুরোধপূর্বক শরীর স্থির রেখে যে সমাধি হয়, সে বিগর্ভ সমাধি ; তাতে কোন উপকারই হয় না। বাজিকরেরাও কুন্তক ক'রে ঐ প্রকার সমাধি করে। ধর্মকর্মের সহিত ওর কোনও সম্বন্ধই নাই। যোগবান্ধিষ্ঠে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। একদিন বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে নিয়ে একটি নির্জন স্থানে উপস্থিত হ'য়ে, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটি পাকা কুঠুরী পেলেন ; উহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে রামচন্দ্রকে দেখালেন, একটি লোক শূণ্যে অবস্থান করছে। বশিষ্ঠদেব তার চৈতন্য সঞ্চার করবামাত্রই, সে তিনপাক ঘুরে, তানা-না-না-না ক'রে হাত পেতে—‘মহারাজ ! রূপিয়া দেও’ প্রার্থনা করল। বহুকাল পূর্বে, সে অর্থ প্রত্যাশায়, কুন্তক যোগে সমাধিস্থ হ'য়ে, শূণ্যে কি প্রকারে অবস্থান করতে হয়, তাই দেখাচ্ছিল। কোনও প্রকারে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, তার কুন্তক আর ছুটল না। রাজার রাজত্ব গেল, বাড়ী অরণ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু তার ঐ সমাধি আর ভাঙল না। বশিষ্ঠদেব তার জ্ঞান সঞ্চার করবামাত্রই, পূর্ব সংস্কার অনুসারে সে সেই রাজাকে অনুমান ক'রে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট, ‘রূপিয়া দেও’ প্রার্থনা করল। মুদ্রা ক'রে, কুন্তক ক'রে, হঠাৎ যোগের নানা প্রকার প্রণালী ক'রে যে সমাধি হয় তা কিছুই নয়। ভগবৎ চিন্তার সহিত যে সমাধি, তা-ই প্রকৃত সমাধি।

যাঁরা ভগবানের সঙ্গে যোগ আকাজক্ষা করেন, সকল প্রকার ঐশ্বর্য বা শক্তিকেই তাঁরা নিতান্ত অনর্থ মনে ক'রে ত্যাগ করেন। সমস্ত ঐশ্বর্য দাসীর মত সর্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কিন্তু তাঁরা একবার ফিরেও সে দিকে চান না। যথার্থ যোগ লাভ করতে

হ'লে বীৰ্য্য ধারণ কর্ত্তে হয়। সত্য কথা না বললে, বীৰ্য্য ধারণ হয় না। সত্য কথা বলতে হ'লে বাঁকা সংযম কর্ত্তে হয়। প্রায় মৌনই হ'তে হয়। আজকাল রাজযোগ বড়ই কঠিন। এতে কৃতকার্য্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভক্তিযোগই এ সময়ের উপযোগী, ভগবানের রূপা ব্যতীত কিছুই হবার যো নাই।”

সমস্ত অবতার—পূর্ণভগবান্। আনুষঙ্গিক প্রশ্ন।

আজ অবতারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—“কোন কোন সময়ে বিশেষ

২২শে অগ্রহায়ণ। কোন প্রয়োজনে, ভগবানের শক্তি ব্যক্তি বিশেষের ভিতর দিয়ে

কার্য্য করে দেখা যায়, তাহাই অবতার। ঐ কার্য্যাটি শেষ হ'য়ে

গেলেই, ঐ ব্যক্তিতে ঐ শক্তি আর থাকে না। তখন আর সে অবতারও নয়।

যেমন ‘পরশুরাম’ বিশেষ একটা সময়ের জন্ম অবতার। আবার যাবজ্জীবন অবতারও

থাকে, যেমন ‘রামচন্দ্র’। অংশ, কলা, আবির্ভাব, আবেশাদি বহুপ্রকার অবতার আছে।

অবতার সর্ব্বদাই পূর্ণ, কারণ ভগবংশক্তির প্রকাশই অবতার। ভগবান্ সর্ব্বদাই পূর্ণ।

তবে তাঁর অংশ, অংশাংশ ইত্যাদি বলবার তাৎপর্য্য এই যে, কোথাও জ্ঞানের কার্য্য,

বীৰ্য্যের কার্য্য, কোথাও বা ভক্তির কার্য্যই দেখা যায়। ভগবান যে কার্য্যে যতটুকু শক্তি

প্রকাশ করা আবশ্যক বুঝেন, ততটুকুই মাত্র করেন, তাই ব'লে অংশশক্তি তাতে নাই, বলা

ঠিক নয়। পূর্ণ মাত্রায়ই আছে, প্রকাশ করেন না মাত্র। এক মুহূর্ত্তের জন্মও যদি কোন

ক্ষেত্রে ভগবৎ শক্তির আবেশ হয়, তথায় পূর্ণ শক্তিই র'য়েছে বুঝতে হবে। ভগবান্

কোথাও অপূর্ণ নন, সর্ব্বত্র সকল অবস্থায়ই পূর্ণ। অবতার সমস্তই পূর্ণ, যতটুকু প্রকাশ

ততটুকুই লোকে জানে মাত্র।”

সাকার ধ্যানে ভগবানকে লাভ করা যায়, না নিরাকার ধ্যানে? কোন্ মত ঠিক জিজ্ঞাসা করায়

ঠাকুর বলিলেন—“মত একটা কিছু নয়। ওসব মতামতে হয় না। সাকার ধ্যানই কর,

আর নিরাকার ধ্যানই কর, যা-ই কর, কিছুতেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। তিনি

স্বপ্রকাশ, নিজে দয়া ক'রে যখন প্রকাশ হন, তখনই তাঁকে জানা যায়। চিত্তশুদ্ধ না হ'লে,

তাঁর প্রকাশ ধরা যায় না। সাধন ভজন যাই কর না কেন, আগে চিত্তশুদ্ধিটি চাই;

চিত্তশুদ্ধ না হ'লে, ভগবানের প্রকাশ হয় না। প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ কর।”

শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকালস্থায়ী কি উপায়ে রাখা যায় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন—

“শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকালস্থায়ী রাখতে হ'লে, আহারের পরিমাণ ও সময় ঠিক

রাখতে হয়। বীৰ্য্যধারণই মূল, কিন্তু ঐ নিয়ম ছুটির রক্ষা না হ'লে, বীৰ্য্যধারণও ঠিক মত হয় না। পূর্বে যোগী ঋষিদের সকলেরই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁরা কখনও ঐ নিয়ম ছুটির অন্তথা করতেন না।”

কালীঘাটে কালী দর্শন—উদাসী সাধু দর্শন— স্পর্শ করা বিষয়ে উপদেশ।

আজ ঠাকুর আমাদের সকলকে লইয়া কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কালীমন্দিরে লোকের খুব ভিড় ছিল। ঠাকুরকে পাওয়া খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত ভিতরে লইয়া গেলেন—সঙ্গে মাত্র আমরাই রহিলাম। কোন প্রকার অস্থবিধাই হইলনা। কালীকে মালা ও ভালী দিয়া নমস্কার করিতে করিতে, করষোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঠাকুর যখন ‘মা, মা’ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন ঠাকুরের আধ কান্নাস্বরে আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। কালীর নির্মালা মস্তকে ধারণ করিয়া ঠাকুরের আপাদমস্তক থবুথবু কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুর এদিকে ওদিকে চলিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিলেন, আমরা অতি সাবধানে ঠাকুরকে বাহিরে লইয়া আসিলাম। দলে দলে লোক আসিয়া ঠাকুরের চরণধূলি লইতে লাগিল, লোকের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরকে লইয়া আমরা রাস্তায় আসিলাম। একটু চলিয়াই ঠাকুর একটি ‘রকে’ বসিয়া পড়িলেন। এবং বলিলেন—“জগন্নাথের রূপের সহিত, এই কালীর রূপের সাদৃশ্য আছে, মা’র কত দয়া! সকলকেই মা দয়া করুছেন।”

কালীর মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবেশে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একটি বৃদ্ধা কান্ধালিনী আসিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “বাবা! আজ আমার জন্ম সার্থক! আর আমার কিছু নাই; একটি পয়সা মাত্র আছে, এইটিই তুমি দয়া ক’রে নেও,” এই বলিয়া বুড়ী পয়সাটি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত উহা হাতে লইয়া মস্তকে কিছুক্ষণ ধারণ করিয়া রহিলেন, পরে মহেন্দ্র বাবুর হাতে দিলেন। পাছে না নেন, তাই বলিলেন—“অযাচিত দান অগ্রাহ্য কর্ত্তে নাই, এই পয়সাটি আপনার কন্যাকে দিবেন।” মহেন্দ্র বাবু যত্ন করিয়া রাখিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই ঠাকুর অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি বটগাছের ধারে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কয়েকটি সন্ন্যাসী আপন আপন আসনে বসিয়া ধুনি তাপিতে ছিলেন। একটি সৌম্যমূর্ত্তি, ভস্মাবৃত্তাঙ্গ, ভজ্ঞনানন্দী সন্ন্যাসীকে ঠাকুর নমস্কার করিয়া কয়েকটি টাকা সেবার্থে দিয়া বলিলেন—এইজ্ঞান্ধই ভগবান আজ আমাকে এখানে এনেছেন।”

ঠাকুর আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার সময়েই কয়েকটি টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, তাঁদের অযাচক বৃত্তি, দুইদিন একেবারে আহার জুটে নাই।

সন্ন্যাসীটির প্রভাবে ঐ স্থানটি যেন অন্য প্রকার হইয়া রহিয়াছে। উদাস ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ, ঐ স্থানে পঁছিবামাত্রই আমাদের কারও কারও পরিষ্কার অম্লভব হইতে লাগিল। অল্প সময় ওখানে বসিয়াই ঠাকুর বাসায় যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। জ্বর হইল। অবিলম্বে গাড়ী করিয়া আমরা তাঁহাকে লইয়া বাসায় পঁছলিলাম। নিম্নমিত সন্দ্যাকীৰ্ত্তনের পর ঠাকুর সুস্থ হইলেন। অধিক রাত্রিতে কথায় কথায় বলিলেন, “ভাবাবেশে থাকলে অথবা অগমনক্ষ থাকলে, কখনও তাকে স্পর্শ কর্তে নাই। স্পর্শ কর্তে হ’লে, তিনবার ডেকে তাকে জানায়ে স্পর্শ কর্তে হয়। এখনও অনেক স্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। হঠাৎ কেহ স্পর্শ করলে, তার সমস্তগুলি ভাব দেহে সঞ্চার হয়। শরীরটি আগাগোড়া যেন জ্বলে যায়। এই নিয়ম সাধারণের জানা নাই ব’লে অনেক সময় অনেক উৎপাতে পড়তে হয়।”

রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আকাজক্ষা ও অনুরোধ।

কলিকাতার সুবিখ্যাত দানশীল বিপুল ধনাধিপতি কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে, শ্রীযুক্ত রামকুমার বিহারদ্র মহাশয় অল্প বেলা দুইটার সময় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া ২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ। বলিতে লাগিলেন—“কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রতিমাসে সহস্র সহস্র টাকা ধর্মার্থে দান করিতেছেন। উপযুক্ত পাত্রের অর্থ দান করিয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। আপনার সমক্ষে তিনি অনেক কথা লোকমুখে শুনিয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁর বড়ই আগ্রহ জন্মিয়াছে। আপনার নির্দিষ্ট আয় কিছুই নাই, অথচ অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানেরা বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, ধর্মলাভ আকাজক্ষায় আপনার আশ্রয় লইয়া সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন; আকাশবৃষ্টির উপরই আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই ঠাকুর মহাশয়, আপনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়া এই বিষয় জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার একান্ত আকাজক্ষা একলক্ষ টাকা আপনাকে তিনি উৎসর্গ করেন, এবং ধর্মার্থে আপনার ইচ্ছামত তাহা ব্যয়িত হয়। আপনার অবসর মত অল্পগ্রহ করিয়া একবার যদি তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় আপনাকে জানাইয়া, সাক্ষাৎসমক্ষে ঐ টাকা আপনার হাতে অর্পণ করেন। এখানে আগন্তুক লোকের সমাগম সংবাদ এবং তাঁহার সর্বদা আছেন, তাঁহারা কিরূপ অবস্থার লোক আর কি প্রকার অভাবে থাকিয়াও তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে আছেন ইত্যাদি তিনি বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন।”

বিহারদ্র মহাশয়ের কথা শুনিয়া, ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল; মুখটি ক্ষীত ও আরক্ত হইয়া উঠিল; ঠাকুর করষোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—“ঠাকুর মহাশয়কে বলিবেন—আমার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক’রে, ভগবান তা প্রতিদিন দিয়ে

থাকেন। একটি কাণাকড়িরও অভাব রাখেন না, তাঁরই দ্বারে দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়ে, তাঁর নাম নিয়ে, যেন প'ড়ে থাকতে পারি, এই আশীর্বাদ করতে বলবেন, তিনি ঐ টাকা ধর্ম্মার্থে যথায় ইচ্ছা দিতে পারেন। আমি তা গ্রহণ করলে, আমার বিশেষ অনিষ্ট হ'বে মনে করি। বড়লোকের বাড়ী যে'তে আমার ভয় হয়।”

বিচারক মহাশয় আর এই কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে চলিয়া গেলেন। কানীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় বহু সাধুকেই মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেছেন। বিচারক মহাশয়ও খুব সম্ভাবে এই কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

ছোট দাদার সেবা—ঠাকুরের অশ্রু।

আমরা কলিকাতা পছন্দিতই ঘরভাঙ্গা হইতে পত্র আসিল, শাস্তিস্বধা তথায় অতিশয় গীড়িতা, দাউজীও রক্ত আমাশয় রোগে খুব ভুগিতেছেন। ঠাকুর এই সংবাদ প্রাপ্ত

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

মাত্রেই, যোগজীবনকে তথায় পাঠাইয়া শাস্তিস্বধাকে এখানে আনাইয়াছেন। শাস্তিস্বধা কয়দিন বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া এখানে আসিয়াছেন। এখন প্রবল জরে ও পেটের অসুখে তিনি মরণাপন্ন, এখানে সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। আমরা সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কি করিব! সাংসারিক আরাম আনন্দ, সুখভোগ, বিষময় জ্ঞান করিয়া, শুধু ঠাকুরের অমৃতময় সঙ্গলাভেই আমরা মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। এখানে রোগীর উৎপাত ঘাড়ে নইয়া, বিষ্ঠা মূত্র ঘাটিতে ভাল লাগিবে কেন? স্ততরাং আমরা অনেকেই রোগী হইতে তফাৎ থাকিয়া, রোগীর সেবা শুশ্রূষা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এই প্রকার কর্তব্য বুদ্ধির উপদেশই একে অগ্রাহ্যে দিতেছি মাত্র। এদিকে শাস্তিস্বধার অবস্থাও ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

ছোটদাদা কলিকাতায় থাকিয়া এম, এ, ও আইন পড়িতেছেন। তাঁহার অবসর বড়ই কম; তথাপি ঠাকুরের সঙ্গলাভের লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, বামাপুপুর হইতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও আসিয়া প্রত্যহ ঠাকুরকে দর্শন করিয়া বাইতেন। শাস্তিস্বধার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি সকল দিকের প্রয়োজন, এমন কি ঠাকুরের সঙ্গলাভের আঁকাজ্ঞা পর্য্যন্ত একেবারে বিসর্জন দিয়া, অনামাত্র ধৈর্য্য সহকারে প্রায় অর্দ্ধক্ষিপ্তা, উৎকটপীড়িতা শাস্তিস্বধার সেবায় একটানা নিযুক্ত রহিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে বিকারী রোগীর বিষম উৎপাতে স্থির থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন এবং নিষিকার ভাবে বিষ্ঠা মূত্র বমি দুই হাতে পরিষ্কার করিতেছেন দেখিয়া গুরুভ্রাতারা সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুর সর্বদাই পার্শ্ববর্তী ঘরে থাকিয়া শাস্তিস্বধার সমস্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আজ প্রসঙ্গক্রমে, ছোটদাদার সেবা-পরিপাট্য বিষয়ে কথা তুলিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—“যথার্থ মায়ের মত দরদু ক'রে, রোগীর প্রাণে যা চায় সেটি বুঝে, সেবা শুশ্রূষা কর্তে

সারদাই পারেন। ওঁর স্পর্শে প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়। এক ঘণ্টা জল যে সারদা দেন, তাতেও যেন সমস্তটি প্রাণ ঢেলে দেন। সেবা অনেকেই করেন বটে, কিন্তু এমনটি আর দেখা যায় না।”

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ গদ ভাবে ছোট দাদার সেবাকার্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন শুনিয়া, আমার নিজ জীবনে ধিকার আসিল। ভাবিলাম হায়, কবে এমন দিন আসিবে যে ঠাকুর আমার সেবা দেখিয়াও এই প্রকার আনন্দ করিবেন! এত কাল এত সাধন ভজন করিয়া এবং ঠাকুরের সেবা গুশ্বা করিয়া তাঁর যে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না, হুই পাঁচ দিন একটা রোগীর একটু সেবা করিয়া, অনায়াসে ছোট দাদা ঠাকুরের সেই প্রসন্নতা লাভ করিলেন। সকলই অদৃষ্টে করে!

এই সময় ঠাকুর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন—“স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যে সেবা সে এক প্রকার। দরদের সেবাই প্রকৃত সেবা। সেটি কি আর চেষ্টায় হয়, না যার তার হয়?”

শান্তিগুণের সেবাকালে, ঠাকুরের রূপা বিষয়ে ছোট দাদা তাঁর ভায়েরীতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

“হু'হাতে বমি কাচাইতে কাচাইতে (পরিক্ষার করিতে করিতে), ওয়াক দিতে দিতে, গুরুজীর সাহায্য চাহিলাম, গুরুজীর রূপায়—তাঁরই নামের গুণে, কিঞ্চিৎ হইল। হায়! হায়! নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই। একটু সামান্য সেবা করিতে হইলেও গুরুজীর সাহায্য দরকার * * *। গুরুজীর অতিশয় উজ্জল মূর্তি হৃদয়যো প্রকাশিত হইল, * * * * *। গুরুজী আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। নিমেষশূন্য নয়নে। * * আমি উহা এড়াইতে প্রয়াস পাইলাম।”

ঠাকুরের বিরক্তি।

ছোট দাদা ও কুঞ্জ বাবু (গুহ) রাত্রিতে ঠাকুরের পদসেবা করিয়া থাকেন। একদিন নির্দিষ্ট সময়ে উহারা ঠাকুরের পদসেবায় যাইতে উদ্যোগ করিতেছেন, মহেন্দ্র বাবু ২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ। উহাদের বলিলেন, “আমার মাথাটা টিপে দেও।” উহারা ভিতরে ভিতরে একটু বিরক্ত হইয়া বাস্তবতার সহিত, ভাড়াভাড়ি মহেন্দ্র বাবুর মাথা টিপিয়া দিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র বাবু তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহারা যেমন ঠাকুরের পদসেবার উদ্যোগ করিলেন, ঠাকুর খুব বিরক্তির সহিত ধমক্ দিয়া বলিলেন—“যাও, যাও, পা আর টিপ্তে হবে না, শুয়ে থাক গিয়ে। স'রে যাও।”

উহারা মহেন্দ্র বাবুর নিকট ক্রটির এই ফল বুঝিয়া, লজ্জায় ও ভয়ে নীরাক হইয়া সরিয়া পড়িলেন। কারও ক্রোশে উদাসীন থাকিয়া বা কারও প্রয়োজন অগ্রাহ করিয়া, ঠাকুরের সেবায় গেলে, প্রায় সর্বদাই আমরা ঠাকুরের এ প্রকার বিরক্তি ভাব দেখি।

ভিতরে ত্রিভঙ্গ ।

ঠাকুর দিবারাত্রি ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নিয়মপূর্বক থাকাতে, আমাদেরও দৈনিক কাধ্যগুলি নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। সমস্তটি দিন কি প্রকারে যে চলিয়া যায়, বুঝিতে পারি

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

না। সারাদিনে ঠাকুরের সঙ্গে প্রাণ থুলিয়া একটা কথা বলিবারও কেহ অবসর পায় না। রাত্রিতে আহারের পর ঠাকুর কিছুকালের জন্ত শিয়বর্ণের সঙ্গে তাহাদেরই মত হইয়া গিয়া, হাসি গল্পে রাত্রি প্রায় বারটা পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। আর আর দিনের মত আজও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয়ও ছোট দাদা ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর নানা কথা তুলিয়া তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। তখন অবসর বুঝিয়া ছোট দাদা ঠাকুরকে বলিলেন, “একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, দশভুজা ভগবতী আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, একেবারে মিলাইয়া গেলেন। তখন একটা অসীম শক্তি অনুভব করিলাম—ইহা কি সত্য?”

ঠাকুর বলিলেন—“ওহে বাপু, এসব স্বপ্ন কি আর স্বপ্ন! এক ত্রিভঙ্গ আমার ভিতরে প্রবেশ ক’রে আমাকে ত্রিভুবন ঘুরাচ্ছেন। বা’র হ’তে চেপ্টা ক’রে, তিনিও আর পারছেন না, (হাত দিয়া উভয় পার্শ্ব দেখাইয়া) এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ঠেকে যাচ্ছেন। আর তোমার ভিতরে দশভঙ্গ, ক্রমে টের পাবে।”

ঠাকুর অগ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন - “আমার নামের অর্থ ঘুরে বেড়ান।”

কৃষ্ণের বিজয় অর্থাৎ কৃষ্ণের ঘুরে বেড়ান। ঠাকুরের কথার তাৎপর্য ইহাই কি না, জানি না।

স্বপ্ন-বিষয়ে কথা। ঠাকুরের রোগীর জন্য সহানুভূতি ও চিকিৎসা।

নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা বিষয়ে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিলেন - “অনেক সময় স্বপ্নেই মানুষের চরিত্রের পরীক্ষা হয়। স্বপ্নে যখন দেখবে নানাপ্রকার প্রলোভনে

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

প’ড়েও চিন্তা স্থির আছে, কোনও দিকে বিচলিত হচ্ছে না, তখনই ঠিক। আর স্বপ্নে মানসিক একটু চঞ্চলতা হ’লেই বুঝবে, ভিতরের দুর্বলতা যায় নাই। গুরুসম্পর্কে অথবা দেবতাসম্পর্কে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তা সত্য ব’লে জানবে। ওর ভিতরে অসংলগ্ন যা কিছু মনে হয়, তারও একটা তাৎপর্য থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখা, একটা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। বহুকাল সাধন ভজন ক’রে যে সব অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, এক মিনিটের স্বপ্নে, তা অনায়াসে লাভ হ’ল দেখা গিয়েছে। আমি যখন ডাক্তারী কর্তাম, শক্ত রোগীদের জন্য চিন্তা হ’লে, প্রায়ই পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার

স্বপ্নে আমাকে ঔষধের কথা বলে যেতেন। রোগীদের তাতে অব্যর্থ উপকার হ'তে দেখেছি।”

এই বলিয়া ঠাকুর যে ভাবে রোগীদের সেবা ও চিকিৎসা করিতেন, বলিতে লাগিলেন; শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। একবার শান্তিপুরে বিষম মড়ক লাগিয়াছিল, তিন চারিবার দাস্ত বমি হইয়াই লোক মরিতে লাগিল, শান্তিপুরে ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল, সহরের লোক চারিদিকে পলাইতে লাগিল। ঠাকুর আহাৰ নিজে ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি ঔষধের বাস্ন হাতে লইয়া, রোগীদের বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহারই কোন উপকার হইল না। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া একদিন রাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাতরভাবে ঔষধের জ্ঞাত প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয় ঠাকুরকে আদিয়া বলিলেন, “স্মাণ্টো-নিনের সহিত এই কয়টি ঔষধ মিলাইয়া দাও, খাইলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।” রাত্রি ৩ টার সময় এই ব্যবস্থা পাইয়া ঠাকুর অমনি উঠিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগীদের ঘরে ঘরে যাইয়া ঐ ঔষধ দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ ঔষধ সেবনের পর আর একটি রোগীরও মৃত্যু হইল না।

ঠাকুরের শান্তিপুরে অবস্থান কালে, একদিন তিনি গঙ্গার অপর পারে একটি মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার্থে আহৃত হন। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও তাহার সংসারের দুঃখ দেখিয়া তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রোগীকে ঔষধ দিয়া পরদিন সকালে আবার ঔষধ আনিতে তাহার বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া আসিলেন। কিন্তু ঐ দিন বিষম দুর্ঘ্যোগ উপস্থিত হইল। সকালবেলা হইতেই খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুর, রোগীর বাড়ী হইতে কেহ ঔষধ লইতে আসিবে মনে করিয়া, উৎকর্ষার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইল, এদিকে ঝড় বৃষ্টি আরও ভীষণাকার ধারণ করিয়া, সহরটিকে লগ্ন তগ্ন করিতে লাগিল। তখন তিনি রোগীর ক্লেশের অবস্থা মনে করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ঔষধের শিশিটি হাতে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে পার হইবার নৌকা নাই দেখিয়া, তিনি পরিধেয় বস্ত্রে ঔষধের শিশিটি জড়াইয়া মাথায় বাধিয়া লইলেন ও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সেই সময়ের প্রশস্ত ও তরঙ্গের প্রবল গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিতে কাটিতে অপর পারের কোন অনির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উঠিলেন এবং তথা হইতে দুর্গম অজ্ঞাত পথে ঘুরিতে ঘুরিতে, রোগীর বাড়ীতে গিয়া পহুছিলেন। বাড়ীর সকলে ঐ অবস্থায় ঐ সময়ে ঠাকুরকে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই দুর্ঘ্যোগে ঘর হ'তে বাহির হওয়া দুষ্কর, আপনি এই রাত্রিতে, এতদূর কি প্রকারে আসিলেন?” ঠাকুর তখন রাস্তার সমস্ত বিবরণ তাঁহাদিগকে বলিয়া, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিলেন এবং সেই রাত্রি তথায়ই অবস্থান করিয়া, রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইলে, পরদিন প্রাতে চলিয়া আসিলেন।

নবীন বাবুর * সেবা কার্য।

গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নবীন বাবুর স্ত্রী বহুকালযাবৎ উন্মাদগ্রস্তা। তাহার উপর নানাপ্রকার রোগের পীড়নে, বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। অনেক সময়েই

তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। নবীন বাবু নিজেই, প্রতিদিন অত্যন্ত যত্নের সহিত তাঁহাকে বাহ্য, প্রস্রাব, মল ও আহারাদি করাইয়া থাকেন। একটি দিনের জন্তও বি বা জন্ত কাহারও উপর নির্ভর করেন না। ঠাকুর উহার আন্তরিক দরদ ও অক্লান্ত সেবা বিষয়ে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—“আজকাল এ ভাবের সেবা প্রায় দেখা যায় না।”

প্রত্যহ প্রাতে ও মধ্যাহ্নে নবীন বাবুর বাড়ীতে গুরুভ্রাতাদের সমাগম হইতেছে। যে ভাবে তিনি স্ত্রীর আবদার রক্ষা করিয়া এবং সর্বদা তাঁহার প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে আদর যত্ন করিতেছেন, তাহার আর তুলনা নাই। আড়ম্বরশূন্য সদহুষ্ঠানে তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া অবাক হইতেছি।

নিয়মিত আফ্রিক সমাপনান্তে নির্জন ও অবসর বুঝিয়া, ফুল চন্দন তুলসী লইয়া প্রতিদিন তিনি ঠাকুরকে পূজা করিতে আসেন। ঠাকুরের সম্মুখে একটু সময় বসিয়াই, অশ্রুকম্পপুলকাদিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং ঠাকুরের চরণে তুলসী চন্দনাদি পূজোপহার অর্পণ করিবার উত্তোগমাত্রই—ঠাকুর “তুলসী পায়ে দিতে নাই, উহা আমার মাথায় দিন” বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নিদিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আমরা আসন হইতে উঠাইতে পারি না।

গুরুভ্রাতা বৃন্দাবন বাবু একদিন সকালে রাত্রিবাস কাপড়ে কিছু খাবার আনিয়া ঠাকুরকে দিতে উত্তোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নবীন বাবু বলিলেন—‘ও কি! নোংরা কাপড়ে খাবার আনিয়া ঠাকুরকে দিতে যাচ্ছেন!’ বৃন্দাবন বাবু একটু লজ্জিত হইয়া ধামিয়া গেলেন। পরে কথা-প্রসঙ্গে বৃন্দাবন বাবু ঐ বিষয় ঠাকুরকে বলাতে, ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—“ডাক্তার বাবু তাঁর ভাব মত ত ঠিকই বলেছেন; কিন্তু তুমি তোমার মত কাজ করলে না কেন? তিনি ত তোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছেন।”

* শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ - ইনি এক সময়ে ভারপ্রাপ্ত সিভিল মেডিকেল অফিসার ছিলেন। চাকরি করিতে হইলে আপন ধর্ম-প্রবৃত্তির অন্তকূলে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করা বড়ই দুষ্কর ব্যুত্থা। ইনি চাকরিটি পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইনি একজন আত্মত্যাগী ব্রাহ্ম ছিলেন। তৎকালে ইঁহার যুগ ব্রাহ্মসমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর, ক্রমে ক্রমে নবীন বাবুর মতের ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সেই সময় হইতে ইনি যথার্থ বৈষ্ণব আচাৰ্যে থাকিয়া, একটানা সাধন ভজনে দিন রাত অতিবাহিত করিতেছেন। জেলা চবিশ পরগণার অন্তর্গত বাগুড়ি গ্রামে ইঁহার নিবাস।

বৃন্দাবন বাবু বলিলেন—“কি জানি মশায়! আপনি যদি না খান!”

ঠাকুর বলিলেন—“আমি না খেলেও, তুমি ছাড়বে কেন? আমার গাল টিপে খাইয়ে দিবে।”

ভক্তের সেবা-সাহসে ঠাকুরের দুঃখ।

বিদেশ হইতে সপরিবারে গুরুভাতারা আসিয়া, আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্তি

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন। পক্ষাণ্ড ষাট জন লোক

সর্বদাই আশ্রমে রহিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় নবীন বাবু এবং চন্দ্রমণি দিদি অকাতরে গোপনে খরচ চালাইয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর মগ্নাবস্থায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ কান্দিয়া উঠিয়া বলিলেন—“ওরা আমাদের তাড়ালে, এখানে আর থাকতে দিলে না।” কিছুক্ষণ পরে গুরুভাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কারা আপনাকে তাড়ালে?”

ঠাকুর বলিলেন—“নবীন বাবু আর নেড়া।”

ইহা শুনিয়া চন্দ্রমণি দিদি কান্দিয়া বলিলেন—“বাবা! আমরা কিসে আপনাকে তাড়ানাম?”

ঠাকুর বলিলেন—“তাড়ালে না ত কি! তোমরা যে রকম কর্জ, আর কিছু দিন আমি এখানে থাক্লে, তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে।”

উহারা বলিলেন—“আমাদের কি বাবা! আপনার টাকা, আপনারই প্রয়োজনে লাগিতেছে। আমরা মাত্র উহা হাতে করে দিয়ে ধর হ'য়ে যাচ্ছি। এতেও আপনি বাধা দিবেন?” অতিরিক্ত সাহসে চন্দ্রমণি দিদি ও নবীন বাবুর ঋণগ্রস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া, ঠাকুর এই ভাবে তাঁহাদের চেষ্টায় বাধা দিলেন।

ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও সমাদর।

একদিন একটি খুব গরীব গুরুভাতা ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইবার আকাজক্ষায়, মাত্র দুই তিন আনা

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

পয়সা লইয়া প্রাতে সাতটা হইতে বেলা প্রায় দেড়টা পর্যন্ত কলিকাতা

সহর ঘুরিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার পছন্দমত খাবার, দুই তিন পয়সার এক এক স্থানে খরিদ করিয়া, বেলা দুটার সময় অনাহারে শ্রান্ত শরীরে শ্রামবাজারের বাসায় পহুছিলেন। কিন্তু ঠাকুর উহা গ্রহণ করিবেন কি না সংশয়ে ও ত্রাসে, তাঁহার নৃপ শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি নীচে (রাস্তায়) সিঁড়ির নিকট পহুছিলামাত্রই, ঠাকুর অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া, ছলছল চক্ষে ছুটিয়া উপরে সিঁড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কান্দকান্দ স্বরে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া গুরুভাতা-

টিকে বলিলেন—“ওহে! তুমি ও কি এনেছ? আন, শীঘ্র আন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।” ঠাকুরের স্নেহে আহ্বান শুনিয়া, গুরুভাতাটি কান্দিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের হাতে

খাবার দিয়াই পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও ছলছল চক্ষে, অতি আগ্রহের সহিত তাহা প্রায় সমস্তই খাইয়া, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে উহা গুরুভ্রাতাটির হাতে দিয়া, খাত্তের প্রশংসা করিতে করিতে এবং চোখ মুছিতে মুছিতে আসনে যাইয়া বসিলেন।

নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত ঠাকুর কিছু আহার করেন না। অসময়ে কিছু খাবার আসিলে, ঠাকুর কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত আমাদের বিলাইয়া দেন। কিন্তু এই গুরুভ্রাতাটির অসাধারণ আগ্রহ ও অহুসারগ বুঝিয়াই বোধ হয়, ঠাকুর নিয়ম ভুলিয়া গিয়া অসময়ে প্রায় সমস্ত খাত্ত নিজেই খাইলেন।

ডাক্তার হরকান্ত বাবুর * দীক্ষা।

কিছুদিন দীক্ষার খুব হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে। কাহারও দীক্ষা হইলেই, বড় দাদার কথা আমার মনে

২৮শে অগ্রহায়ণ।

পড়ে। এ পর্য্যন্ত তাঁহার দীক্ষা না হওয়ায় বড়ই মনঃকটে আছি। এবার দাদা আসিলেই ঠাকুরের দয়া হইবে ভাবিয়া দাদাকে পুনঃপুনঃ জেদ করিয়া আসিতে লিখিলাম। ঠাকুরের কৃপার উপর ভরসা থাকায়, অহুমতিরও অপেক্ষা করিলাম না। দাদা ফরজাবাদ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর দাদাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

২৮শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ত্রয়োদশী তিথিতে, দাদার আকাজক্ষা মত নির্জন গৃহে গিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষাকালে বিশেষ কিছু অহুভব হইল কি না জিজ্ঞাসা করাতে, দাদা বলিলেন—“আমি প্রাণায়াম করিতে পার্লাম না। কয়েকবার নাম স্মরণ কর্তেই কেমন যেন হ’য়ে গেলাম। মহাদেব এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ‘বেটারি’ হতে তড়িৎ-প্রবাহের জ্বাশ, অকস্মাৎ সর্বদিকে আমার আনন্দ ছড়াইয়ে পড়ল। গোসাই দুই হাতে আমার দুই বাহু ধ’রে ফেললেন। গোসাইকে ‘মহাদেব’ রূপে দেখলাম, ঐ সময়ে আমার যেন তন্দ্রাবেশ হ’ল; আর কিছুই জানি না।” দাদার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সাধন গ্রহণের পর দাদা, ঠাকুরের নিকটে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—“দীক্ষা ত দিলেন—কোন প্রকার আসনে বসিয়া জপ করিতে হইবে, তাহা ত ঠাকুর বলিলেন না।” ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন, দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া, ক্রমে ক্রমে তিন প্রকার আসন করিয়া দেখাইয়া, পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। দাদা মনে মনে খুব আনন্দিত হইলেন। (দাদার নিজ লেখা হইতে উদ্ধৃত)।

* ডাক্তার হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সহোদর। খ্যাতনামা মিঃ কে. জি. গুপ্ত, ডাক্তার পি. কে. রায় প্রভৃতি ইঁহার সমপাঠি ও বন্ধু ছিলেন। প্রথম বয়সে, কেশব বাবুর প্রথম উচ্চমের সময়, ইনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন; গোসাইয়ের সহিত ঐ সময় হইতেই জালাপ। বহুকাল পশ্চিমাকলে ফয়জাবাদ, লক্ষৌ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সরকারী এসিষ্ট্যান্ট সার্জন ও সিভিল মেডিকেল অফিসার স্বরূপে

হরকান্ত বাবুর স্বপ্ন।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে, ঠাকুর দাদার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। দাদার স্বপ্নবৃত্তান্ত বড়ই অভূত! ঠাকুর এবং গুরুভাতারা অনেকে দু'একটি স্বপ্ন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঠাকুরও দাদাকে বলিতে উৎসাহ দিলেন। দাদাও তাঁহার লেখা দুই তিনটি স্বপ্ন বলিতে লাগিলেন—

(১) “একদিন দেখলাম—ভয়ঙ্কর তরঙ্গযুক্ত কাল জল পরিপূর্ণ খরশ্রোতা একটি প্রকাণ্ড নদীর মধ্যস্থলে আপনি দাঁড়াইয়া আছেন; অনেক চেঁচায় হাবুডুবু খাইয়া দলে দলে লোক আপনার নিকট যেমনই যাইয়া পহঁছিতেছে, আপনি তাহাদের প্রত্যেককে দু'হাতে ধরিয়া নদীতে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। তাহাদের শরীর অমনই সাদা কাঁচের মত পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা সালে একই আকৃতি লাভ করিয়া, অনায়াসে নদী পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে।”

(২) দাদা আবার বলিলেন—“আর একদিন দেখিলাম—একটি মেম ডিস্ হাতে খাবার কটম আমার নারায়ণকে ভোগ দিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। এই প্রকার দেখিলাম কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“লক্ষ্মী এখন সাহেবদেরই ঘরে। তাই ওরূপ দেখেছেন। যেখানে শ্রীলোকের মর্যাদা নাই—লক্ষ্মী সেখানে থাকেন না। এ দেশে দ্রোপদীর উপর যে অত্যাচার ও অপমান হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তার যোল আনা প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।”

কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার চাকরির সময়ে, নানা তীর্থে অনেক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাহাদের কৃপায় ইঁহার সনাতন ধর্মে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তৎপরে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। ‘পেন্সন গ্রহণের পর জীবনের শেষভাগে, বিষয়ের সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজন লইয়া পুরীধামে নিজ গুরুদেব সমাধিস্থানে বাস করিতেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুরের কৃপা বিশেষভাবে ইনি প্রত্যক্ষ করেন। পুরীধামে সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া ইনি বঙ্গোপসাগরের পূর্বপারে মনোরম দৃশ্য সকল দর্শন করিতেন। বহুদূরে থাকিয়াও গঙ্গার কুলকুল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, অনেক আলৌকিক ঘটনা ইঁহার প্রত্যক্ষ হইত। যুত্মর একমাস পূর্বে, ইনি মধ্যম ভাতা শ্রীগুরু বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান করিয়া, তাঁহার যুত্মর সমস্ত নির্দেশপূর্বক শব্ধ বহন করিবার জন্ত বিমান প্রস্তুত করাইলেন। বেহত্যাগের দিন প্রাতঃকালে, সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, “আজ ঠাকুর আমাকে বলিলেন ‘তোমার কর্ম্ম শেষ হইয়া গেছে, তবে ইচ্ছা করলে আরও কিছুকাল তুমি থাকতে পার অথবা যদি ইচ্ছা হয় এখনই আমার নিকটে আসতে পার।’” “এতকাল ত আমি সাধ্যমত তোমাঘরেই সেবা ও প্রজ্ঞা করেছি, এখন ঠাকুর আমাকে দয়া করে ডাকছেন, আমি আর থাকতে পারি না। তোমরা সকলে আমাকে আশীর্বাদ কর।” এই বলিয়া তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের ঐশ্বর্য্যে তুলনীয় চলন দিয়া, একটু বালি নিবেদন করিয়া দিলেন। পরে নমস্কার করিয়া, ঐ প্রদাদ পাইয়া নিজ বিছানায় গমন করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সজ্ঞানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন।

মাধোদাস বাবাজীর সমাধিতে অন্তর্দান ও ঠাকুরের কথা।

অযোধ্যার নানকসাহী সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা মাধোদাস বাবাজীর, কি অবস্থায় দেহত্যাগ হইল, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায় দাদা বলিলেন—“বাবাজী প্রতিদিন সন্ধ্যায়

২৯শে অগ্রহায়ণ।

পর ভজন কুটীরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতেন, এবং সাধারণতঃ আসনে সমাধি স্থাপন করিতেন। যে রাত্রিতে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই রাত্রিতে শিষ্যদ্বিগকে বাধির দিক হইতে দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে, বাবাজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। একটু অবসর মত যাইব ভাবিয়া ঐ দিন আমি গেলাম না। শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম—বাবাজীর দেহটি সোণার হইয়া গিয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—“বাবা, তোহারা ভাল হোঁগা, আনন্দ কর। আবি হামু চলে যাতে।” এই বলিয়া অঙ্গচুটায় চারিদিক আলোকিত করিয়া, শূণ্যমার্গে অনন্ত আকাশে অদৃশ্য হইলেন। স্বপ্ন দেখিয়াই আমি জাগিয়া উঠিলাম; বুক আমার ছবুছুবু করিতে লাগিল; বাবাজীর ঐ রূপটি পুনঃপুনঃ মনে জাগিয়া, আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি, একটু করুণা হইতেই, বাবাজীর খবর জানিতে লোক পাঠাইলাম; কিছুক্ষণ পরেই লোক আসিয়া বলিল, প্রত্যুষে নির্দিষ্ট সময়ে, বাবাজী আসন ত্যাগ না করায় শিষ্যদের মনে সন্দেহ জন্মিল। পরে সকলে জানিলেন—ঐ রাত্রিতেই বাবাজী নিজ আসনে সমাধির অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে বাবাজী তাঁর প্রিয়শিষ্য নারায়ণদাসকে রাহুপালীতে উপস্থিত হইতে সংবাদ দিয়াছিলেন। এখন ঐ নারায়ণদাসই, বাবাজীর গদিতে আছেন। নারায়ণদাসেরও খুব স্বখ্যাতি শুনিতে পাই।”

মাধোদাস বাবাজীর কথা প্রসঙ্গে একসময়ে ঠাকুর বলিলেন—“বাবাজী বড়ই দয়াল ছিলেন। আমাকে বড়ই কৃপা করতেন। আমাকে নিয়ে একই পাত্রে, তিনি আহার করেছিলেন। ‘গ্রন্থসাহেব’ তিনিই আমাকে পাঠ করতে বলেন। তাঁরই কথামত প্রতিদিন আমি তাহা পাঠ করছি। নারায়ণদাস ঐ গদিতে থাকায় ভালই হয়েছে। নারায়ণদাসের প্রতি বাবাজীর অসাধারণ কৃপা ছিল।”

সাধু নারায়ণদাসের অদ্বুত জন্ম বৃত্তান্ত।

মাধোদাস বাবাজীর কৃপায় নারায়ণদাসের অলৌকিক জন্ম সংঘটিত হয়, তদ্বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যাব্বিত হইলাম।—বাবাজীর আশ্রম যখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, প্রত্যহ একটি বিধবা স্ত্রীলোক আসিয়া, দু’বেলা ঝাড়ু দিয়া যাইত। স্ত্রীলোকটির সংসারে আর কেহই ছিল না, বড়ই গরীব ছিল। ঝড়, বৃষ্টিতে, শীতে, গ্রীষ্মে, অবাধে তাহার সেবা দেখিয়া

২৯শে অগ্রহায়ণ।

বাবাজী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা শীঘ্রই তোমার গর্ভ হইবে এবং একটি সাধু স্ত্রীপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন।” স্ত্রীলোকটি বলিলেন, “বাবা! আমি যে বিধবা! এবং অতিশয় দরিদ্র! পুত্র হইলে আমার দশা কি হইবে?”

বাবাজী গুনিয়া বলিলেন—“সবই গুরুজীর ইচ্ছা! আমি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ত আর অশ্রুত হইবার ঘো নাই। তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ভালই হইবে। ছেলেটি পাঁচ বৎসরের হইলে, আমাকে দিও, আমি চেলা করিয়া রাখিব।” বাবাজীর কথামত বিধবাটিব পুত্র হইলে, পাঁচ বৎসর পরে, ঐ ছেলেটিকে আনিয়া, মা বাবাজীর চরণে অর্পণ করিলেন। ছেলেটির তের চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাবাজী উহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। পরে সমস্ত তীর্থ পর্যাটনে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময় হইতে নারায়ণদাস, গুরুজীর আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, এতকাল তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাবাজীর সহিত আর দেখা হয় নাই।

যখন আমি ফয়জাবাদে ছিলাম, অবসর পাইলেই দাদার সঙ্গে রাহুপালীতে বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতাম। আশ্রমটি ঠিক যেন মুনি ঋষিদের তপোবন। ওখানে পহুছিলামাত্রই চিত্তটি প্রফুল্ল হয়। উঠে। ভজনের একটা আশ্রম শক্তি ও গাণ্ডীয্য, আশ্রমে উপস্থিত হওয়ামাত্রই অল্পভূত হয়। গুনিয়াছি, বাবাজী অসাধারণ ঐশ্বর্য্য প্রভাবেই আশ্রমের ভিতর দিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত সবেও রেলপথ করা বন্ধ হইয়াছিল। বাবাজীকে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই, অসাধারণ সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সম্মান করিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তিনি দীনহীন কাঙ্গাল ছিলেন। ধীর, শান্ত, আনন্দময় বাবাজীর পবিত্র মূর্তি স্মরণে চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

পৌষ ।

ঠাকুরের পূজা ও আরতি—মহাভাব ।

আজ গুরুভাতা রামদয়াল বাবু ফুল, চন্দন, মালা, ধুসুচি, পঞ্চপ্রদীপাদি পূজোপকরণ ও আরতির সামগ্রী সকল লইয়া, বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঠাকুর ঐ সময়ে স্থিরভাবে আসনে বসিয়াছিলেন,

রামদয়াল বাবুর অভিপ্রায় বুঝিয়াই, বোধ হয় চোখ বুজিলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন । রামদয়াল বাবু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিলেন এবং করঘোড়ে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন । দরদর ধারে অশ্রুজল বর্ষণে গগনস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল । গদগদ ভাবে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক মস্তকে ধারণ করিয়া, ঠাকুরের চরণ যুগলে অর্পণ করিতে লাগিলেন । সর্বাঙ্গ তুলসী চন্দনে সাজাইয়া, গলায় ও মস্তকে মালা পরাইয়া দিলেন ।

ভাগ্যবান গুরুভাতারাও ঐ সময়ে চতুর্দিক হইতে উল্লসিত প্রাণে জয়ধ্বনি করিতে করিতে, অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প ঠাকুরের সন্মুখে বর্ষণ করিতে লাগিলেন । রামদয়াল বাবু পঞ্চ প্রদীপাদি দ্বারা যথারীতি ঠাকুরের আরতি আরম্ভ করিলেন । পুনঃপুনঃ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল । খোল, করতাল, কীসর তালে তালে বাজিয়া উঠিল । স্ত্রীলোকেরা মুহমুহঃ হ্রস্বধ্বনি করিতে লাগিলেন ।

গুরুভাতারা সকলে ভাব-বিহ্বল অন্তরে, নিনিমেষ নয়নে ক্ষণকাল ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলেন । ঐ সময়ে কেহ ‘জয় নৃসিংহ’, ‘জয় নৃসিংহ’, বলিতে বলিতে উর্দ্ধবাহ হইয়া, লক্ষ প্রদান পূর্বক ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন । কেহ বা ‘জয় রাম’, ‘জয় রাম’ বলিতে বলিতে ঠাকুরের সম্মুখে মগ্নবেশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সজোরে বাহু আফেটন করিতে লাগিলেন । কেহ ‘ঐ কিরে’, ‘ঐ কিরে’ বলিতে বলিতে, কম্পিত কলেবরে ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক দাঁড়ান অবস্থায়ই সংজ্ঞাহীন হইয়া রহিলেন ; আবার কেহ কেহ বা হৃদয় গর্জন করিয়া ‘ঐ জাখ্’, ‘ঐ জাখ্’ বলিয়া উদ্গত নৃত্য করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । ঠাকুরের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি করিয়াই এক এক জনের এক এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল ।

ঠাকুরকে এক এক জনে এক এক প্রকার দেখিয়া, কেহ কম্পিত ও কেহ বা স্তম্ভিত হইলেন, আবার কেহ কেহ বা হৃদয় গর্জন ও ভয়ঙ্কর আশ্রয়লাভ করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । সঞ্চারীভাবের মহাতরঙ্গে আজ প্রায় সকলেই চৈতন্যহার হইলেন । ধন্য গুরুদেব ! ধন্য গুরুদেব !!

এক ঘণ্টাকাল এই ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে সকলেই নিশ্চোখিতের ত্রায় উঠিয়া বসিলেন । ঠাকুরের বাম পাশে নিজ আসনে দাঁড়াইয়া, গুরুভাতাদের বিচিত্র ভাবের অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া,

পুলকিত ও বিস্মিত হইতে লাগিলাম। আজই ঠাকুরের প্রথম পূজা ও আরতি হইল। ধন্য গুরুপ্রাণ গুরুভ্রাতৃগণ! তোমাদের এই অসাধারণ গুরুপ্রেমের নিদর্শন চিরকাল স্মৃতিতে রাখিয়া আমার অবশিষ্ট জীবনও যেন ধন্য হইয়া যায়, এই আশীর্বাদ করিও। মধ্যাহ্নে নানা প্রকার সুখাত্ত্র ভব্যে শতাবধিক লোকের ভোজন হইল। সারাদিন আজ অনেকে ভাবাবেশেই রহিলেন। সন্ধ্যাকীর্তনে আবার ভাবের প্রবল তরঙ্গে মহা ঢলাঢলি ব্যাপার হইল। অধিক রাত্রিতে আহারান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন।

“আসন নেড় না, ফৌস করবে।”

গত কল্যা, ঠাকুরের পূজা ও আরতিকালে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যে সকল পত্র, পুষ্প, দূর্বা, চন্দনাদির বর্ষণ হইয়াছিল, অনবসর হেতু সে সকল আসন হইতে তুলিয়া লইতে পারা গেল না।

সুবিধা পাই নাই। মধ্যাহ্নে শৌচ যাইবার সময়, কোন কোন দিন ঠাকুর নিজ হইতেই তাঁহার আসন রৌদ্রে দিয়া, পাতিয়া রাখিতে বলিয়া যান, আমিও সেইরূপ করি। আজ শৌচে যাইবার সময়ে আসন অপরিষ্কার থাকিল, অথচ উহা তুলিতে বা ঝাড়িয়া রাখিতে বলিলেন না দেখিয়া ভাবিলাম, বুঝি ঠাকুর বলিতে তুলিয়া গেলেন। তাই আসনটি রৌদ্রে দিতে মনস্থ করিয়া, যেমন উহা শুটাইতে একটু সমুখের দিকে টানিলাম, অমনই মনে হইল যেন সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের শরীরেও টান পড়িল, কারণ তিনি তৎক্ষণেই পাইখানা হইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কবিয়া বলিলেন—“ওহে! আসন নেড় না, থেমে যাও, থেমে যাও! ফৌস করবে!”

আমি শুনিয়াই একেবারে চমকিয়া গেলাম। আসনের উপরের অংশ ঝাড়িয়া সরিয়া পড়িলাম। ঠাকুর যখন শ্রীবন্দনে দাঁড়জায় মন্দিরে ছিলেন, তখন ঠাকুরের আসনঘরে নিয়ত সাপ থাকিত জানি, গেলগরিয়াতেও ঠাকুরের সাধন কুটীরে আসনের ধারে সর্বদা একটি জাত সাপ অবস্থান করে; জানি না ইহার ভিতরে কি রহস্য আছে। ছুটি পাকা দেওয়ালের অন্তরালে পাইখানার ভিতরে থাকিয়া, আসনটি টানার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তৎক্ষণাৎ আমাকে বাধা দিলেন—ইহাতেও চমকিয়া গেলাম। ঠাকুর আসিলেন পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কলিকাতা সহরে তেতালার উপরে আসনের নীচে সাপ কোথা হ’তে আসিল?”

ঠাকুর বলিলেন—“বাস্তুসাপ প্রায় সকল পুরাণ বাড়ীতেই ত আছে, কলিকাতাই কি, আর অত্যাশ্চর্য্যই বা কি? কিছুকালের জন্য কোনও নিদ্রিষ্ট স্থানে আসন ক’রে বসলেই, নিকটবর্ত্তী বাস্তুসাপ আসনের নীচে এসে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে।”

আমি বলিলাম—“আসনের নীচে কি সর্বদাই সাপ থাকে?”

ঠাকুর বলিলেন—“এ সব স্থানে সর্বদা থাকবার সুবিধা পাবে কেন? আসনের নীচে

থাকার সুযোগ না ঘটলে, ঐ ঘরে অন্য যে কোনও স্থানে থাকতে পারে। নিকটে নিকটে থাকবারই ওদের চেষ্টা।”

আমি—আসন ত প্রায়ই রোদ্রে দিতে হয়। কখন কি বিপদ ঘটে ভয় হয়!

ঠাকুর—“বিপদের আশঙ্কা কিছুই নাই। বিশেষ উপদ্রব না হ’লে, ওরা কোন অনিষ্টই করে না। তবে অকস্মাৎ আঘাত পেলে ফৌস করতে পারে।”

আমি কখন আসনের নীচে গাপ থাকবে তাহা কিরূপে বুঝব?

ঠাকুর—“আসন কখনও নাড়া চাড়া করতে নাই। আমি যখন বলব, তখনই তুলে রোদ্রে দিও—না হ’লে শুধু উপর উপর পরিষ্কার ক’রে রেখো।”

যোগজীবনের পত্নীর গর্ভস্থ পুত্রের মৃত্যু বিবরণ এবং তদীয় জননীর ভবিষ্যৎ।

শান্তিস্বধার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইতেই গেণ্ডারিয়া হইতে খবর আসিল, যোগজীবনের স্ত্রী কিছুদিন হয় গর্ভনাশের ফলে দারুণ জ্বর-বিকারে ভুগিতেছেন। গুরুভ্রাতা ভক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয় খুব যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক। গেণ্ডারিয়াস্থ গুরুভ্রাতাভগিনীরা সকলেই উহাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই যোগজীবনকে ঢাকা যাইতে বাললেন। ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া যোগজীবন কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর তখন যোগজীবনকে ধীরভাবে বুঝাইয়া বলিলেন—“স্ত্রীর প্রতি যা একটুকু কর্তব্য আছে, এ সময়ে যেয়ে শেষ ক’রে নে। আর তোকে স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হবে না। খুব শীঘ্রই বউমা দেহ রাখবেন। এবার তাঁর আর নিষ্কৃতি নাই। তা হ’লেও যে ক’টা দিন আছেন, সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোন প্রকার ক্রটি না হয়। চিকিৎসাতে দৈহিক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অবিলম্বে ঢাকা যেয়ে এ সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত কর্। আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।”

আজন্ম উদাস প্রকৃতি যোগজীবন, স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হইবে না শুনিয়া, আনন্দে ঘেন লাফাইয়া উঠিলেন এবং অতাই রাত্রির গাড়ীতে গেণ্ডারিয়া রওনা হইতে প্রস্তুত হইলেন। অবসর মত গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যোগজীবনের স্ত্রীর পুত্র গর্ভেই নষ্ট হইল কেন? রোগ কি মায়ায়ুক?”

ঠাকুর বলিলেন—“একজন উন্নত অবস্থার যোগী কর্মবিপাকে প’ড়ে, একটি গুরুতর অপরাধ ক’রে ফেলেন। তাতে অভিশাপ হ’ল, সাতবার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

তাই জীবিত অবস্থায় কখনও ইনি ভূমিষ্ঠ হন না। আরও তিনবার ওঁকে গর্ভবাস ক'রে, পূর্বাবস্থা লাভ কর্তে হবে, যে—সে ক্ষেত্রে ইনি প্রবেশ করেন না। প্রসূতিও ইহার ভূমিষ্ঠ হবার পরই, দেহত্যাগ করেন।”

যোগজীবনের দ্বীপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই দুঃখ হইল। আহা! প্রথম গর্তের উপসর্গে ও অবসন্নতায় নিতান্ত ক্লমদেহ লইয়া, প্রতিকূল আচরণে উপযুক্ত দয়া এবং সদ্যবহারের অভাবেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, যে ভাবে সর্বদা নস্তুষ্ট চিত্তে অগ্নান বদনে, সহিষ্ণুতা সহকারে, তিনি আশ্রমস্থ ও পরিবারস্থ সকলের সেবা-কার্য্য চালাইয়াছেন, তাহা বড় সহজ নয় এবং সাধারণ দৈর্ঘ্যের পরিচয় নয়। এবার গেণ্ডারিয়াতে বাইয়া আবার কি তাঁর সেই দীনভাবাপন্ন সরলতা মাথা মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? ঠাকুরের কথায় মনে হইল খুব শীঘ্রই তাঁহার দেহত্যাগ হইবে এবং দেহত্যাগের পূর্বে ঠাকুরেরও তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমরা সকলেই যোগজীবনের দ্বীপ কখন কি সংবাদ আসে, এই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিলাম। ঠাকুর কখন গেণ্ডারিয়া চলিয়া যান নিশ্চয় নাই।

আহার বিষয়ে অনুশাসন—জাতিবিচার।

অপরাত্নে তিনটার পর উঠুন ধরাইয়া রান্না এবং আহার শেষ করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়ে ;
সুতরাং ঐ সময়ে ঠাকুরের অনেক কথা শুনিতে পাই না। এজ্ঞা আজ
এয়া পৌষ।

সহজে আহ্বারের ব্যাপার চুকাইব মনে করিয়া, সরকারী পাকের পরেই, সেই জলন্ত উত্তনে ভাতে-সিদ্ধ-ভাত রান্না করিলাম। পরে ঐ ঘরের এক কোণে উহা রাখিয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। “নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র ভাবে, স্বপাক আহার করিতে হইবে, “আমার আহার বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশের ইহাই সার মর্ম্ম। মতলবে ঠেকিয়া, মনকে এই প্রকার বুঝাইয়া নাড়ে তিনটার পরই আহার করিতে গেলাম। আহার করিতে প্রস্তুত হইয়া সন্মুখে অন্ন লইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে একটি কায়স্থ গুরুভগ্নী, পীড়িতা শাস্তিসুধার পথ্য প্রস্তুত করিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই আমার মাথা গরম হইয়া গেল। তাঁহাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলাম—“আমি নির্জনে আহার করি, তুমি তা জান না? তুমি ঘরে প্রবেশ করলে! আজ আমার অন্ন নষ্ট হইল। আজ আমি আর আহার করব না।” এই বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। গুরুভগ্নীটি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর ঠিক সেই সময়েই খুব উচ্চৈঃস্বরে আমাদের ডাকিতে লাগিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে?”

আমি বলিলাম—আমি আহার কর্তে বসেছি, শূদ্রা একটি গুরুভগিনী সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন।

ঠাকুর বলিলেন —“আচ্ছা, যাও, সেই অন্নই যেয়ে খেয়ে নেও।”

ঐ সময়ে ঠাকুর আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। আহাৰান্তে ঠাকুরের নিকট বাইয়া বসামাত্রই, ঠাকুর আমাকে বলিতে লাগিলেন—“মেজাজটি একটু ঠাণ্ডা রেখে চলতে চেষ্টা ক'রো। মেজাজ উত্তপ্ত হ'লে সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। আহাৰের সময়ে কায়স্থ ঘরে প্রবেশ করলেই, সমস্ত খাবার নষ্ট হ'য়ে যাবে, এ তোমাকে কে বলেছে? আর কায়স্থ ব্রাহ্মণ বুঝাও বড় সহজ নয়। শূদ্র কায়স্থের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। যাঁরা সত্ত্বগুণী তাঁরাই ব্রাহ্মণ। রজস্তমোগুণীদের স্পর্শেই আহার্য্য দূষিত হয়। সত্ত্বগুণী কায়স্থদের প্রতি তোমাদের যদি ঐ প্রকার ভাব হয়, তা হ'লে ঠিক হবে না! নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়বে। গুণ দ্বারাই জাতি বিচার, এসব বিচার ক'রে না চললে, মানুষ বড়ই ভ্রমে প'ড়ে যায়।”

অন্নের পাক করা অন্ন খাবে না, এই তোমার নিয়ম। সকলের আহাৰ শেষ হ'য়ে গেলে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে রান্না হ'লেই, নিবেদন ক'রে খেয়ে নিবে। পাক ক'রে রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আহাৰ করা ঠিক নয়। ঢেকে রাখলে মানুষের দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু পক অল্পে শুধু মানুষের দৃষ্টিই ত পড়ে না! ভূত প্রেত অপদেবতাদির দৃষ্টি এবং কুকুর বিড়ালাদির স্পর্শও ত যখন তখনই হ'তে পারে। সুতরাং পাকটি যেমনই হবে, অমনই নিবেদন ক'রে আহাৰ ক'রবে। সর্বদা বিচার ক'রে না চললে, অনেক সময়ে গোলে পড়তে হয়। অপরাধা হ'তে হয়।”

অবিচারে ভালমন্দ বুঝার সঙ্কেত।

প্রশ্ন—প্রতি কার্য্যে বিচার কর্ত্তে গেলে, কাজ কি আর করা যায়? বিচারের ত অন্ত নাই! এমন অবস্থা কি হয় না, যে বিচার না করলেও ভাল মন্দ বুঝতে পারা যায়?

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, খুব হয়। আমাদের অন্তরে প্রতিমূহূর্ত্তেই, প্রতিকার্য্য সম্বন্ধে এটি ভাল এটি মন্দ, এই প্রকার শব্দ আপনা আপনি উঠছে। যাঁরা নিয়মমত সর্বদা প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করেন, দমে দমে কুন্তক করেন, তাঁদের দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যায়, তাঁরাই ঐ ধ্বনি শুন্তে পান। একরূপ অবস্থা লাভ হ'লে, তাঁদের আর বিচার কখনও কর্ত্তে হয় না। তাঁদের আর কোন ভয় বা সংশয়ও থাকে না। কিন্তু যাঁদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁদের প্রতিকার্য্যে বিচার না করলে চলবে কেন? এই সকল বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন।”

বীৰ্য্যধারণাদি শারীরিক তপস্যার প্রয়োজনীয়তা ।

আমি একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলাম—আহার-শুদ্ধি, দেহ-শুদ্ধি এবং বীৰ্য্যধারণ এ সমস্তই ত শারীরিক তপস্যা ?

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন,—“তা বটে ! কিন্তু এসব ঠিক না হ’লে ত সহজে ধর্ম্মলাভ হয় না । ধর্ম্মলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়ই শরীর । সর্ব্বাঙ্গে এই শরীরটিকে রক্ষা কর্ত্তে হয় । দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি আহারে যে দেহের পুষ্টি, সে নিতান্তই অসার । বীৰ্য্যধারণেই যথার্থ দেহ রক্ষা হয় । আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হ’লে, বীৰ্য্যধারণ হয় না । শরীর সুস্থ ও পবিত্র না হ’লে, সাধন করবে কি নিয়ে ?”

আমি ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—পবিত্র আহার, পদাঙ্গুষ্ঠেদৃষ্টি, বাক্যসংযমাদি ও বীৰ্য্য-ধারণের যে সকল নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, প্রাণপণে করিয়া যাইতেছি ; কিন্তু বীৰ্য্যধারণ ত কিছুতেই হইতেছে না ! কি করিলে স্বপ্নদোষের হাত হ’তে রক্ষা পাই, বলে দিন ।

ঠাকুর বলিলেন—“ছ’টি ঘণ্টা খুব স্থির হ’য়ে ব’সে নাম ক’রো দেখি, কেমন স্বপ্নদোষ হয় ।”

নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—যে সব নিয়ম দিয়েছেন, সে ভাবে চললে কতকালে সিদ্ধ হ’ব ?

ঠাকুর বলিলেন—“সিদ্ধি কি ? কতকগুলি শক্তি লাভ করাই কি সিদ্ধি মনে কর ? যৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ বিষয় । কখনও ওতে আসক্তি রেখো না । যেক্রপ অধ্যবসায়ের সহিত সাধন ভজন ও চেষ্টা করছ, ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য ঐ রূপটি করলে একটি বছরেই চের ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত কর্ত্তে পার । মাত্র একটি বৎসর বীৰ্য্য ধারণ ক’রে, যদি সত্যবাক্য সত্য-চিন্তা ও সত্য-ব্যবহার কর্ত্তে পার, অনেক ঐশ্বর্য্য শক্তি লাভ হবে । কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না । যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম করবে, তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জানবে । কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাকতে, সে অবস্থা কখনও লাভ হয় না । সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লোভ ও অনাসক্ত হ’লেই হয় । এই অবস্থা হ’লেই প্রকৃত পক্ষে নামে রুচি জন্মে । নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি ।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার চমক লাগিল, আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—অসং বিষয়ে লোভই ত ক্ষতিকর ?

লোভ সর্বত্রই সমান ক্ষতিকর ।

ঠাকুর বলিলেন—“বিষয় সমস্তই অসৎ । লোভ যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, অনিষ্টকর জান্বে । রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দেখে, তাঁর প্রতি লোভ করাতে যে ক্ষতি, বাজারে মিঠায়ের দোকানে একটি রসগোল্লা দেখে তাতে লোভ করাও, ধর্ম্মলাভ বিষয়ে ঠিক সেইরূপ ক্ষতি । সামাজিক ইষ্টানিষ্টের কথা স্বতন্ত্র ।”

এই সময়ে মণি বাবু, অচিন্ত্য বাবু, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা রহস্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুরকে বলিলেন—মশায়! ওসব আমাদের দ্বারা হবে না । ধর্ম্মলাভ হউক আর নাই হউক, পৈত্রিক সম্পত্তি (গুরুকৃপা) কিছু ত পাবই ।

ঠাকুর বলিলেন—“ধর্ম্মলাভ সকলেরই হবে, বঞ্চিত কেহই হবেন না । তবে দু’দিন আগে আর পরে । সকলেই যে, সকল নিয়ম প্রতিপালন ক’রে চলতে পারবে, তা নয় । অন্ততঃ নিয়মগুলি প্রতিপালনের একটু ইচ্ছা যদি থাকে, তা হ’লেও যথেষ্ট ।”

একথা বলামাত্রাই, সকলে একবারে হাসিয়া উঠিলেন । মনে হইল, “এ যে বজ্র-আটুনির ফস্কা গেলো ।”

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে কতিপয় প্রশ্নোত্তর ।

শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যা ব’লে দিয়েছেন, সেই মত যাঁরা চলে, আর যাঁরা সেই মত চলে না, এই দু’য়ের মধ্যে তফাৎ কি ?

ঠাকুর উত্তরে বলিলেন,—“উপদেশ মত যাঁরা চলেন, তাঁদের সঙ্গে যে একটা যোগ রয়েছে, এ তাঁরা পরিকার বুঝতে পারেন, আর যাঁরা উপদেশ মত চলেন না, তাঁদের মাঝে কিছুদিন, ইহা চাপা প’ড়ে যায় ।”

দেবেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—সাধনের সময়ে যাকে যা ব’লে দিয়েছেন, সেই রকম সে চলতে না পারলে, অথবা তার বিপরীত আচরণ করলে, তার কি হবে ? আর এসব কারণে কাকেও ত্যাগ করা হয় কি না ?

ঠাকুর বলিলেন—“কাহাকেও একেবারে ত্যাগ করা হয় না ; এই জিনিস যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ইহা কখনও নষ্ট হয় না । সময়ে সকলেরই সব ঠিক হ’য়ে যায় ।”

দেবেন্দ্র বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কাঁহার সাধন লইয়া গিয়াছেন, জীবনে আর কখনও দেখা হয় নাই, তাঁহাদিগের সকলকে আপনি চিনেন কি না ?

ঠাকুর বলিলেন—“সকলের সঙ্গেই অন্তরের একটা যোগ রয়েছে ।”

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন—অন্তরের যোগের কথা বলছি না, বাহ্যিক তাঁদের চিনেন কি না ?

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ চিনি।”

তখন দেবেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে, আপনি নূতন কেউ এলে, ‘ইনি কে’ থেকে এলেন, ইনি কে’, ইত্যাদি বলেন কেন ?

ইহাতে ঠাকুর কোন উত্তর না দিয়া, কেবল একটু হাসিলেন। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহাদের প্রত্যেকের খোঁজ রাখেন কি না ?

ঠাকুর—“হাঁ।”

দেবেন্দ্র বাবু—তাঁহাদিগের বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে আপনার জানতে হয় কি ? (অর্থাৎ পূর্বে ঋষি-মুনিরা, যেমন কোন বিষয় জানতে হলে ধ্যানস্থ হ’য়ে জানতেন, সেইরূপ কি না ?)

ঠাকুর—“মনোযোগ দিয়ে জানতে হয় না। প্রত্যেকের জীবনের ভাল মন্দ, যাহা কিছু বর্তমানে ঘটছে, তাহা চোখে পড়ে।”

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঠাকুর সাহেব বাড়ীর দোকানের আয়নার কথা বলিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে না পারিলে কিরূপ হয় ?

ঠাকুর বলিলেন—“গুরুর আজ্ঞা কি কেহ প্রতিপালন কর্তে পারে !”

মনোরঞ্জন বাবু—সামান্য সামান্য আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারে ত, যেমন মাংস না খাওয়া ইত্যাদি—

ঠাকুর বলিলেন—“তাও পারে না।” পরে একটু থামিয়া—“যিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তিনি ত করেনই, যাঁর প্রতিপালন করবার ইচ্ছা আছে, দুর্বলতা বশতঃ পারেন না। তিনিও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যদি গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন নাও করেন, এমন কি বিরুদ্ধেও চলেন, সময়ে তাঁরাও ফল পাবেন ; ইহা নিশ্চয়।”

লোভে হতাশ—উপদেশ।

সকাল বেলা সাধন করিতে করিতে, বিষম একটা জ্বালা প্রাণে আসিয়া পড়িল—মনে হইল, আজ

৩রা পৌষ। ছয় বৎসর হইল দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ সময়টা যথাসাধ্য নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া

সাধন ভজনও করিয়া আসিতেছি, কিন্তু জীবনের উন্নতি কিছুই ত দেখিতেছি না।

ছেলেবেলা হইতে যে সকল কু-অভ্যাস স্বভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার একটিও ত এতকালে

বিন্দুমাত্র শিথিল হইল না ? এ সকল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্থির হইব কবে ? আর ভগবৎপাসনাই বা করিব কবে ? দিন ত এ সকল উৎপাত শাস্তির নিমিত্ত লড়াই করিতেই শেষ হ'য়ে গেল । ঠাকুরের অপরিণীম কৃপাওণে, ছরস্ত্র কাম বিপ্লব উত্তেজনার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু লোভের ভয়ঙ্কর উদ্দীপনায় দিনরাত জলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি । ঠাকুরের আদেশ অনুসারে, দিবসান্তে একবেলা স্বপাক ভাতে-সিন্ধু-ভাত মাত্র আহাৰ করিতেছি, তাহাতে ক্ষুধিবৃত্তি হইতেছে বটে, কিন্তু নানা প্রকার স্বেচ্ছাশ্রম মিষ্টান্ন, ঘৃতান্ন প্রভৃতি প্রতিদিন ঠাকুর আবার আমাকেই পরিবেশন করিতে আদেশ করায়, বিধম লোভাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিতেছি । যে সকল স্বেচ্ছা সামগ্রী প্রতাহ নাড়া চাড়া করিতেছি, এখন তজন সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারই রসাস্বাদন কল্পনায় সারাদিন জিহ্বা চুষিয়া কাটাইতেছি । সকলের অজ্ঞাতসারে, চুরি করিয়া ঐ সকল বস্তু খাইতে সময়ে সময়ে প্রবল ইচ্ছা পর্য্যন্ত হইতেছে ; কখনও কখনও আবার এমনই জালা হইতে থাকে যে, ঠাকুরের সঙ্গও ভাল লাগে না, মনে হয় ঠাকুরের সঙ্গে থাকিলে, যদি এ সকল লোভের বস্তু সর্বদা নাড়া চাড়া করিয়া জলিয়া পুড়িয়াই মরিতে হয়, এমন সঙ্গে আর লাভ কি ? ক্ষতিই ত হইতেছে, বরং তফাৎ হইয়া যাই । হায় ! হায় !! ভগবানের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব প্রত্যাশায় বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজন, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, শেষ কালে আমার এই দশা ! এখন লোভের বশীভূত হইয়া চুরির প্রবৃত্তি !! ছুর্ত ঠাকুরের সঙ্গলাভেও বিরক্তি !!!

প্রাণের জালা অসহ্য বোধ হওয়াতে, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—“আমি আর সহ্য করিতে পারি না, চেষ্টা কর্তে আমি কোন ক্রটি করছি না, তাহা ত আপনি দেখছেন ; এখন আর কি করব ?”

ঠাকুর বলিলেন—“ওর জগত তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ? একবারেই কি সব হয় ! ক্রমে ক্রমে সবই হবে । পুনঃপুনঃ চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হ'লে, তাঁর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে, ব'সে ব'সে তাঁর নাম ক'রো । ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাতই কেটে যাবে । নিজের কোন ক্ষমতা নাই বুঝলে, তাঁর উপর নির্ভর না ক'রে আর উপায় কি ? মনটিকে খোলসা ক'রে ফেল, নিজের ছরবস্ত্র পরিষ্কার বুঝে, সরল ভাবে একবার তাঁর দিকে তাকায়ে যদি বলতে পার, 'প্রভো ! আমি আর পারলাম না, আমাকে রক্ষা কর,' তিনি রক্ষা করবেন । এ ভিন্ন আর উপায় নাই ।”

মনে মনে ভাবিলাম—“নিজের চেষ্টায় কখনও পারিব না ইহা যথার্থ বুঝিলে, আর অহুতাপ হইবে কেন ? এখন ত বুঝি আমিই সমস্ত করিব, তবে সাহায্যও চাই ।”

দীক্ষাস্থলে বিচিত্র ভাব ।

ঠাকুরের শ্রামবাজারের বাণায় আসিবার পর বরিশাল, ফরিদপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলার বহু
ঈশা পৌর ।

দ্বীপুরুষ এবং কলিকাতা নিবাসী অনেক ভদ্র মহিলারা আসিয়া ঠাকুরের নিকটে

দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন । দু'পাঁচ দিন অন্তরই লোকের দীক্ষা হইতেছে । এই

দীক্ষা সময়ে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিতেছি, তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই । একই সময়ে
বহুলোকের দীক্ষাকালেও, এক এক জনের ভিতরে এক এক প্রকার দর্শন ও অল্পভূতি, তাহাতে
এক এক প্রকার ভাব ও উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও আবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি । মহাপুরুষ ও
পরলোকগত আত্মাদের, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আবির্ভাব হেতু, কেহ জ্ঞাত কেহ বা অজ্ঞাত,
বিবিধ প্রকার ভাষায় আনন্দ উল্লাস পূর্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন । আবার কেহ কেহ বা আত্ম-
পরিচয় প্রদানপূর্বক, ক্রেশ-হৃচক বিলাপ করিতে করিতে কাতর ভাবে দীক্ষা প্রার্থনা জানাইতেছেন ।
এইসকল দেখিয়া গুনিয়া অবাক হইয়া যাইতেছি । ঠাকুর এইসকল পরলোকগত জীবদের কাহাকেও
স্তবস্তুতি বা নমস্কার দ্বারা, কাহাকেও বা ভৎসনা ও তাড়না দ্বারা বিদায় দিয়া থাকেন । এই সাধনে,
প্রকৃতিভেদে কেহ কেহ উপদেশ ও দীক্ষা মাত্র, নাম শ্রবণান্তে প্রাণায়াম করিয়া সহজ অবস্থায়ই
অবস্থান করেন, দীক্ষাকালে বিশেষ কিছুই অল্পভব করেন না । কেহ কেহ মস্তলাভ করিয়া, দুই
চারিবার প্রণাম করিয়াই ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়েন । আবার কেহ কেহ বা নামটি কাণে
প্রবেশ করা মাত্রই, একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন । দুই তিন ঘণ্টাকাল বাহ্যজ্ঞানও থাকে না ।
অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামাদি আপনা আপনি চলিতে থাকে । অদ্য প্রত্যঙ্গাদিতে মহা সাত্ত্বিক ভাবের
বিকাশ প্রকাশিত হইয়া পড়ে । একই সময়ে দীক্ষাস্থলে বহুলোকের ভিতরে বিচিত্র ভাবের ও অবস্থার
সমাবেশ দেখিয়া, দিন দিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি, কিসে যে কি হয়, কিছুই বুঝিতেছি না ।

এই দীক্ষা গ্রহণই ত্রিবেণী-স্নান ।

ঈশা পৌষ শুক্রবার বেলা দশটার সময়ে বরিশাল, বানরীপাড়া ও ঢাকা জেলার কতকগুলি লোকের
দীক্ষা হয় । কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের মাতা, ভগ্নী এবং স্ত্রী প্রভৃতির

৫-১৮ই পৌর ।

দীক্ষাও এই তারিখে হইল । একটি প্রেতাঙ্গা, কুঞ্জবাবুর শালী শ্রীমতী বসন্ত-

কুমারীর, কলিকাতা আসিবার উদ্দেশ্যে অবগত হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ মানসে তথায়ই উহাকে আশ্রয়
করিয়াছিল । দীক্ষাকালে এই প্রেতের কান্নাকাটি, চীৎকার ও কাতরোক্তি গুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি ।
কুঞ্জবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী কুম্মকুমারী দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ মাত্র চৈতন্যশূন্য হইলেন, সারাদিন তিনি নেশা-
খোরের মত ভাবে চুলচুল অবস্থায় রহিলেন । কুঞ্জবাবুর মা, দীক্ষান্তে অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা

করিলেন—আমি যে আপনার নিকট মন্ত্র নিলাম, ইহা ত দেশে যাইয়া বলিতে পারিব না; কি বলিব ?” সকলে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, “গোঁসাই কি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দিবেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“তোমরা এঁদের অবস্থা জান না। এঁদের খুব বড় সমাজ, সমাজে সম্মানও এঁদের খুব, এ সব কথা সেখানে ইনি বলতে পারবেন না।”

তার পর কুঞ্জ বাবুর মাকে বলিতে লাগিলেন—“আপনি বলবেন যে, ত্রিবেণীতে স্নান ক’রে এসেছি, শাপ্ত্রে ইহাকে ত্রিবেণী-স্নান বলেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, ইহাদের মিলন স্থান কুণ্ডলিনীকে ত্রিবেণী বলে। কুণ্ডলিনী—শক্তিকে জাগানই ত্রিবেণী-স্নান।”

ঠাকুরের এই কথার পরই কুঞ্জ বাবুর মাকে ঘটনাতে পড়িয়া, ত্রিবেণীতে যাইয়া স্নান করিয়া আসিতে হইল। কুঞ্জ বাবুর মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি পূর্বে কুলগুরুর নিকটে যে পূজা নিয়াছিলাম, তাহা কি ছাড়িয়া দিব ?”

ঠাকুর বলিলেন—“তা কেন ? পূর্বে যে পূজা নিয়েছিলেন, তাও করবেন।”

কুলগুরু প্রদত্ত সাধনও করিতে হইবে কি না, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অনেকেই অনেক দিন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন।

ঠাকুর বহুদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন—“কোনও প্রয়োজন নাই, এই সাধন করলেই হবে।”

কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন—“ইচ্ছা হ’লে করবে।”

আবার এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—“হাঁ, তাও করবে, ইচ্ছা ক’রে ওসব কিছু ছাড়তে নাই।”

অবস্থাভেদে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে এ প্রকার ব্যবস্থা, না অতঃ কোনও কারণে আদেশের এরূপ পরিবর্তন, জানি না।

দীক্ষার বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে অপরাধ।

দীক্ষা গ্রহণের পরে, গুরুভাতা স্রীযুক্ত পরেশনাথ বাবু ঠাকুরকে একখানা মলিঙ্গা দিলেন। ঠাকুর উহা একটি শীতবস্ত্রশূণ্য কাঞ্চালকে দিয়া দিলেন। ইহাতে সকলেই বিশেষতঃ পরেশ বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রাত্রিকালে গল্পচ্ছলে মণি বাবু ঠাকুরকে বলিলেন—একখানা বস্ত্র যদি জামাইকে ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়, আর তাহা তিনি ব্যবহার না করিয়া অন্যকে দিয়া ফেলেন, তা হ’লে মনে বড় কষ্ট হয়।

ঠাকুর বলিলেন—“দান একেবারে করতে হয়। ওখানি যদি তাঁর নিজস্ব হ’ল, তবে তিনি দিবেন না কেন? গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে, কোন দান প্রতিদান নাই, সে অমূল্য। তবে যদি কেহ অন্য সময়ে, বৃদ্ধ পিতা জ্ঞানে বা অন্য অভিভাবক জ্ঞানে কিংবা পথের অন্ধকে দানের আয় দয়া ক’রে দান করেন, তবে গুরু লইতে পারেন, নতুবা গুরু ও শিষ্য উভয়েই অপরাধী হন। অতএব অন্যভাবে গুরুকে কেহ কিছু দিও না।”

অন্য সময়ে দীক্ষাকালে একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে কয়েকটি টাকা দেওয়াতে, ঠাকুর তাহাকে বলিলেন—“আমি সামান্য জীব, আমাতে সব দোষই সম্ভব, আমার কোন ব্যবহারে যদি এমন কিছু প্রকাশ হ’য়ে থাকে যে, আমি যাচঞা করছি, তা হ’লে আমার ক্রটি হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। অর্থের প্রত্যাশায় আমি দীক্ষা দেই না। দীক্ষার বিনিময়ে, টাকা যিনি দেন ও নেন উভয়েই নরকগ্রস্ত হন।”

দেব-দেবীর অনুরোধ—পূজাটি লোপ না হয়।

এবার এখানে আমার পর কিছুদিন হয় দীক্ষাসময়ে ঠাকুর সকলকেই একটি নূতন উপদেশ দিতেছেন। দীক্ষার প্রারম্ভেই তিনি বলেন—“যার যেটি দেশগত, সমাজগত, —১৮ই পৌষ।
বা কুলক্রমাগত রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি রয়েছে, যথাসাধ্য তা বজায় রেখে, এই সাধন পথে চলতে চেষ্টা করবে।”

এই উপদেশটি নূতন দেওয়া হইতেছে কেন, জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঠাকুর বলিলেন—“একদিন দেখলাম, হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি, অগ্নিময় হ’য়ে গেছে। সেই অগ্নির ভিতর হ’তে কালী, দুর্গা, মহাদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীগণ বা’র হ’য়ে এসে বল্লেন, ‘দেখ, আমাদের পূজা লোপ না হয় এই ক’রো!’ আমি বললাম, ‘কেন, আমার দ্বারা কি লোপ হ’চ্ছে’? তাঁরা বল্লেন ‘তুমি যাদের সাধন দিচ্ছ, তারা যদি আমাদের অগ্রাহ্য করে, তা হ’লেই ক্রমে পূজাদি সব লোপ হ’য়ে আসবে।’ তদবধি দীক্ষার সময় ঐ উপদেশটি দেওয়া হ’চ্ছে।”

একটি গুরুভ্রাতা প্রশ্ন করিলেন—“বিষ্ণু, শিব, এঁদের আবার পূজা পাইতে এত অগ্রাহ্য কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“এঁরাও ত ত্রিগুণেরই মধ্যে।”

প্রশ্ন—“ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পূজায় কি ভগবানের পূজা হয় না?”

ঠাকুর—“হাঁ, খুব হয়। ভগবদ্বুদ্ধিতে করলেই হয়। ভগবান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপে

পৌষ]

যেমন মায়িক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কৰ্ত্তা হ'য়ে আছেন, সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ, শিবলোকাদি ধামেও তাঁর ঐ প্রকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। ভগবানই এক এক রূপে ভক্তের নিকট লীলা করছেন।”

মহাত্মা মণিবার দৃষ্টি শক্তি।

ঠাকুর যখন ফয়জাবাদে দাদার নিকটে কয়েক দিন ছিলেন, সেই সময়ে একদিন মণিবার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মণিবাবা ঠাকুরকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিয়া-
 —১৮ই পৌষ। ছিলেন, “আপ্‌ রূপা করুকে হামারা আসন পরু রহিয়ে, হাম্‌ আভি দেহ ছোড়্‌ দেতে।” ঠাকুর এই মহাত্মার সহিত দাদাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। দাদা দু'দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া, চাকরি স্থলে চলিয়া গিয়াছেন এবং সম্ভ্রান্তি মণিবাবাকে দর্শন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন—“গৌসাইয়ের আদেশ মত, মণিবার দর্শনে গিয়াছিলাম। পূর্বেও কখন কখন মণিবার নিকটে আমি যাইতাম; তিনি আর দশটি লোকের প্রতি যেক্রপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার প্রতিও প্রায় সেই রূপই করিতেন। কিন্তু এবার আমি বাবাজীর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই, বাবাজী আমাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং খুব উল্লসিত ভাবে দুই হাত বিস্তার করিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—‘আহা হা! বহুত্‌ জনম্‌ জনম্‌ তপস্তা করুকে, আভি সদগুরুকা রূপা লাভ কিয়া হায়। সব পূরণ-হো গিয়া, ধন্য হো গিয়া! ধন্য হো গিয়া!!’ এই বলিয়া তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া, নিজের আসনের সম্মুখে লইয়া বসাইলেন ও আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। আমি অবাক্‌ হইলাম। গৌসাইয়ের নিকট আমার দীক্ষাগ্রহণ বিবরণ, বাবাজীর জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। তাঁর এই দৃষ্টি শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। বাবাজীর আশীর্বাদ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল।”

চরণায়ুত গ্রহণে প্রেতাঙ্গার উদ্ধার।

অত্যন্ত দুষ্কার্যকারী ব্যক্তিদিগের আত্মা, পরলোকে অবস্থান কালে, দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া শক্তির জগৎ কত প্রকার উপায়ই অবলম্বন করে, বলা যায় না। কেহ
 —১৮ই পৌষ। গয়াতে পিণ্ডলাভ আকাজক্ষায়, বংশধরদিগের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে, কেহ বা মহদাশ্রয় লাভ করিলে সমস্ত ক্রেশের উপশম হইবে মনে করিয়া, মহাপুরুষদিগের নিকট স্ববিধা পাইলেই ছুটাছুটি করে, আবার কোন কোন আত্মা সদগুরুর রূপার ত্রকটু ছিটা ফোটা লাভ হইলেই একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইবে নিশ্চয় করিয়া, তাহারই জগৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্‌ হইতেছি।

গভীর রাত্রিতে কয়েকটি ভক্ত গুরুভ্রাতার নিকটে প্রেতাঙ্গাদের কথা শ্রবণে, ঠাকুর বলিলেন—
 “আজ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। যমুনাতীরে কয়েকটি প্রেতাঙ্গা আমাকে খুব কাতর
 ভাবে বল্লে, ‘শত বৃশ্চিক দংশনের হায়ে আমাদের ক্লেশ হ’চ্ছে, আমাদের এই ক্লেশ
 হ’তে দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করুন।’ আমি বল্লাম, ‘আমি কিছুই জানি না। আমার
 গুরুদেবের হুকুম বিনা কিছুই আমার করবার উপায় নাই।’ তারা বল্লে, ‘আপনি যমুনায়
 স্নান করুন।’ পরে আমি যমুনায় স্নান ক’রে উঠলাম, ভিজা গায়ের জল, বেয়ে পড়তে
 লাগল। প্রেতেরা খুব আগ্রহ ক’রে উহা চেটে খেতে লাগল, তখন দেখলাম তাদের
 শরীর জ্যোতির্ময় হ’য়ে গেল, এবং দিব্যরথ এসে তাদের নিয়ে গেল।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া কয়েকটি গুরুভ্রাতা ভাবিলেন, চরণামৃত গ্রহণ করিয়া প্রেতাঙ্গারা যদি
 উদ্ধার হইল, তবে আমরাও একবার উহা খাইয়া রাখি না কেন? পরদিন সকালে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত
 মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, ঠাকুরের শৌচান্তে, জোর করিয়া চরণামৃত লইয়া আসিলেন। আশ্চর্যের
 বিষয় এই যে, পরিষ্কার কলের জলের চরণামৃত, শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, দেবেন্দ্র সামন্ত, মহেন্দ্রবাবু
 প্রভৃতি ঝাঁহার পান করিলেন, সকলেই পবিত্র মনোমোহন এক প্রকার সদগন্ধ পাইয়া অবাক হইলেন।
 ঠাকুর গন্ধ বস্তু কিছু ব্যবহার করেন না, ইহা আমরা জানি।

পাগলী ঠাকুরমা ও ঠাকুর, ঠাকুরের জন্মবিবরণাদি শ্রবণ।

শ্রামবাজারে আসিয়া অবধি, আশ্রমস্থ লোকের আহাাঁরাদির ব্যবস্থা, অতিথি অভ্যাগতদের আদর
 অভ্যর্থনা এবং নবাগত দীক্ষাপ্রার্থী স্ত্রীপুরুষের থাকার বন্দোবস্ত, ধীর প্রকৃতি
 ৫—১৮ই পৌষ। কার্যদক্ষ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপর বিশেষ
 ভাবে শ্রান্ত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় এবং ডাক্তার নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও
 এ সকল কার্যে নিযুক্ত আছেন। চন্দ্রগণি দিদি, অনার মা, সারদা পিসী এবং আগন্তুক গুরুভগ্নীদের
 দ্বারা এত কাল স্ফটিকরূপে, পাক কার্য নির্বাহ হইয়া আসিতেছিল। পরে পাগলী ঠাকুরমা আসা
 অবধি, সমস্ত উলটু পালটু হইয়া গিয়াছে। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই, প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকিলেন।
 গুরুভগ্নীদের রান্না কার্যে নিযুক্ত দেখিয়া বলিলেন—আরে, একি? তোরা এখানে কেন? গৌসাই
 বাড়ীর রান্নাঘরে শূদ্র! তোরা ত এঁটো মুক্ত করবি, আর বাসন মলবি। যতদিন বিজয়ের একটা
 বিয়ে না দিব, রান্না আমিই করব। তোরা এ ঘর থেকে বের হ।” ঠাকুরমা এই বলিয়া উহাদের
 কুটনা বাটনা সমস্ত ফেলিয়া দিলেন এবং নিজহাতে খোসা সহিতে তরকারি কুটিয়া, আধদিক্ করিয়া
 রাখিলেন। ডালও ঐ প্রকারে রাখিলেন, আধোয়া চাউল ফুটাইয়া পিণ্ড করিলেন। প্রথম দিন
 সকলেই ঠাকুরমার রান্না দেখিয়া, খুব আনন্দ করিয়া খাইলেন। ঠাকুরমাও প্রত্যহই ঐ প্রকার রান্না

করিতে লাগিলেন। একদিন চন্দ্রমণি দিদি, ডাল চাউল খুঁয়া রাখিতেই, ঠাকুরমা তাহাকে বাঁটা মারিয়া বলিলেন, “ঠাকুরের ভোগের জিনিস শূঁক হ’য়ে ছ’লি, বড়ই আশ্পর্কী দেখছি?”—ঠাকুরমার রান্না খেয়ে টেকা, সকলের শক্ত হইয়া উঠিল। একদিন সকলেরই পাতে ডাল, ভাত, তরকারি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, ঠাকুরমা ছুটিয়া ছেলের নিকট যাইয়া বলিলেন, “ওরে বিজয়! বল দেখিনি, কেমন রেদেছি? ঠাকুর অমনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন—“কেন মা! তাকি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়! ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ। ওঁরা সব কেমন খাচ্ছেন?” ঠাকুরমা বলিলেন, “ওরা খাবে কি! ওদের কি ভক্তি আছে! আমরা হ’লেম শান্তিপুরে গৌসাই, আমাদের হাতে দেবতার খান, বুক্লে! আমরা বাপু তেল ঘিও দিই না, আর বাটনা কুটনারও ধার ধারি না—যা তা সাদা জলে সিদ্ধ ক’রে দি, ছাখ্ দেখিনি তারই কত স্বাদ?”

ঠাকুর—“জগন্নাথের রান্না সাদা জলেই ত হয়।”

গুরুভাতারা তামাসা করিয়া বলিলেন, ‘ঠাকুরমা! হেলায় শ্রদ্ধায় কোন প্রকারে এই প্রসাদ, এক গ্রাস তল করিতে পারলেই যে হ’লো। একেরারে নিশ্চিন্তি। সারাদিন আর কিছু না খেলেও চলে।’ ইহা শুনিয়া ঠাকুরমা খুব খুসি! সময় সময় কিন্তু ঠাকুরমার রান্না খুব স্বাদগু হয়। কেন যে হয় বুঝি না!

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জিনিস পত্রও প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে। কিন্তু ঠাকুরমা একদিনের জিনিস অল্পদিনের জন্ত রাখেন না। প্রতিদিনই ভাণ্ডার উজার করিয়া ফেলেন। প্রচুর পরিমাণে রান্না করিয়া, রাস্তা হইতে কাঙ্গাল দুঃখীদের ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেছেন। অধিক রান্না করিতে নিষেধ করিলে, ঠাকুরমা ধমক্ দিয়া বলেন, তোরা মানুষ না পশু? মানুষকে না দিয়া কি কখন মানুষ খায়; সে ত শিয়াল কুকুরেই করে? ভগবান একমুঠো দয়া ক’রে দিলে, তা হ’তে একগ্রাসও অল্পকে দিতে হয়। ভগবানের দান, যার প্রয়োজন তারই জন্ত, সকলেরই জন্ত, পুঁজি করিবার জন্ত নয়।” এক বেলার কোন জিনিস অল্প বেলা থাকে না দেখিয়া, বৃন্দাবন বাবু একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ঠাকুরমাকে একটু হিসাব করিয়া চলিতে বলায়, ঠাকুরমা তাঁকে বলিলেন—“গিম্বি! আমরা গৌসাই বাড়ীর বউ, আজকের যা এলো তা হ’লো, কালকে গোবিন্দ আছেন।”

ঠাকুরের জন্ত মাত্র এক সের দুধ রোজকরা আছে; ঠাকুরমা ঐ দুধ আহ্বারের সময় সকলকে একহাতা করিয়া বিলাইয়া দেন। ঠাকুরকেও ভাগ মত এক হাতাই দেন। সকলে এজন্ত বিরক্ত, কিন্তু ঠাকুরমা কারও কথা গ্রাহ করেন না। একটি গুরুভগ্নী, এক সের দুধ গোপনে পৃথক রাখিয়া ঠাকুরকে দিতেছেন।

একদিন কি তাড়াতাড়ি কাজ মারিয়া বাড়ী ঘাইতে ব্যস্ত। ঠাকুরমা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

—“এত শীঘ্র যেতে বাস্তু হচ্ছিঁস্ যে?” ঝি বলিল, “মা! আমার ছেলেটির অসুখ, আজ তাকে একটু দুধ মাত্র খেতে দেব। তারই জোগাড়ে যাব।”

ঠাকুরমা শুনিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, দাঁড়া।” এই বলিয়া গুরুতরীটির ঘর হইতে ঠাকুরের দুধ আনিয়া ঝিয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, “এই নিয়ে যা। ছেলে রোগা কোথায় আবার তালস কর্তে যাবি, যদি না পাস।” এই ব্যাপার লইয়া ঠাকুরমার সঙ্গে কোন কোন গুরুভ্রাতাভগ্নী-দেব বগড়া হইল। সকলে ঠাকুরমাকে বলিলেন, “ঠাকুরমা! দুধ একটু না খেলে তোমার ছেলের যে অসুখ হয়, কষ্ট হয়, জান?”

ঠাকুরমা বলিলেন, “যাঃ, সব জানি। অসুখ হ'লে ঝিয়ের ছেলের কি কষ্ট হয় না? বিজয়ের তোর দশজন আছিঁস, দরকার হ'লে দশ দিকে ছুটাছুটি করুবি। ঝিয়ের ছেলের জন্ম কে আর কর্তে যাবি!” ঠাকুরমা খুব গালাগালি দিয়াও সকলকে জব্দ করিতে না পারিয়া, ছুটিয়া ঠাকুরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, “বিজয়! তোর সঙ্গে সর্বদা থেকেও এদের একরূপ বুদ্ধি হ'লো কেন?” ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল, তিনি মাকে ঠাণ্ডা করিয়া সকলকে বলিলেন—“মা'র প্রাণে যেকরূপ দয়া, তার এক আনাও আমার নাই। ছেলেবেলায় দেখেছিঁ, ঝিয়ের ছেলেটিকে মা আমাদের সঙ্গে বসায় প্রত্যহ খাওয়াতেন। আমাদের মতন আসন তারও ছিল। থালা বাটি, গ্লাস, মা তাকে আমাদেরই মত কিনে দিয়েছিলেন। কোনও প্রকার পৃথক মনে করতেন না। সে আমাদের সমবয়স্ক ছিল ব'লে ধুতি, চাদর, জামা, জুতা, মা যেমন আমাদের দিতেন, তাকেও দিতেন।”

আমাদের ভাণ্ডারঘরে ঠাকুরের সেবা হয়। ঠাকুরের আহারান্তে আমরা সকলে প্রসাদ বাটিয়া লই। ঝি পরে অবসরমত শূণ্য বাসনগুলি লইয়া যায়। ঠাকুরমা এক দিন হঠাৎ ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া, বাসন পড়িয়া আছে দেখিয়া একেবারে অগ্নিমূর্তি হইলেন; ঠাকুরকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে বিজয়! একি অনাচার! এঁটো বাসন ভাঁড়ারে! ইন্দুর, বিড়াল, কত কি এ ঘরে আসে; এ ঘরের জিনিস কি ক'রে ঠাকুরের ভোগে লাগবে?” এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শুনিয়া অমনই মার স্বরের উপর আরও স্বর চড়াইয়া বলিলেন—“রাম! রাম! এক্ষণই, এক্ষণই ওসব ফেলে দাও। ওসব কি রাখতে আছে? রাম! রাম! এঁটোটা যদি সঙ্গে সঙ্গে কেহ তুলে নিতে না পার, তবে কা'ল থেকে আমিই নিব।” ঠাকুরমা অমনই সমস্ত জিনিস রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন—“মা পঞ্চমে চড়লে, আমাকেও সেই তালে সপ্তমে চড়তে হয়, না হ'লে কি রক্ষা আছে! মাকে ঐ ভাবে ঠাণ্ডা না করলে, মা আজ একটা কাণ্ডই



শীকারপুৰে খ্ৰীষ্টগোষ্ঠ্যমী প্ৰভুৰ মাতৃশাল

ক'রে ফেলতেন। পাগলকে অনেক সময়ে, তার বাগে চ'লে ঠাণ্ডা রাখতে হয়, না হ'লে তারও অনিষ্ট করা হয়।”

ভোর-কীৰ্ত্তন শেষ হইলেই, গঙ্গানামে ষাওয়ার সময়ে, ঠাকুরমা একবার ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ঠাকুর নিবিষ্ট ভাবে চোখ বুজিয়া থাকিলেও, ঠাকুরমা ঠাকুরকে খুব স্নেহের সহিত ডাকিয়া বলেন, “ওরে বিজয়—নে পেরুণাম কর্। এখন উঠ'না; ভোর হয়েছে দেখ'চিস'না?” ঠাকুর অমনই ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় নেন্ এবং কচি থোকাটির মত মা'র পানে একদৃষ্টে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকেন। এই সময়ে ঠাকুরের চাহনি আর একরকম হইয়া যায়। উহা দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া বসিয়া থাকি। একদিন বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মশায়, আপনি ঠাকুরমার দিকে ওভাবে চেয়ে থাকেন কেন? আপনার ওরকম চাউনি দেখে, আমাদের ভিতরে যেন কেমন একটা হয়।”

ঠাকুর বলিলেন—“মা যখন এসে দাঁড়ান, মা'র প্রতিলোমকূপে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে আমি দেখতে পাই।”

ঠাকুরমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইল—‘ঠাকুরমা! আমাদের ঠাকুরের জন্মকথা কিছু বলুন না? লোকের মুখে ত কত রকমই শুনি।’ ঠাকুরমা বলিলেন—‘লোকের মুখে আর কি শুনি? লোকে তা কি জানে? সাধারণ লোকের জন্ম যে ভাবে হয়, ওর জন্ম ত আর সে ভাবে হয় নাই! তা বললে বিশ্বাস করতে পার'বি কেন? সে সময় ওর বাবা ব্রহ্মচর্য্য করতেন; শাস্তিপুর হ'তে নাট্যঙ্গ প্রণাম করতে করতে ব্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, কত ক'রে!—বুকেতে, হাতেতে, হাঁটুতে ছালা বেঁধে। ওরকম এখন কেউ করুক দেখিনি? তিনি জগন্নাথের দর্শন পেয়ে, যা প্রার্থনা করতেন তা-ই হ'লো। ভক্তের আকাজক্ষা ত ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বিজয় যখন আমার পেটে ছিল, উদয়াস্ত সূর্য্যের প্রতিরশ্মিতে আমি রাধাকৃষ্ণের দর্শন পেতাম।’

ঠাকুরমা কখন কখন আমাদের গকে পরিহাস করিয়া বলেন—‘যা, তোরা ত কচুবনের শিষ্য।’ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ঠাকুরমা, আপনি কি আর স্থান পেয়েছিলেন না? ছেলে হ'লো কচুবনে?’ ঠাকুরমা বলিলেন—‘আরে! তখন যে শীকারপুরের বাড়ী বরকন্দাজ এসে ঘেরাও করলে, বাড়ী ছেড়ে সকলে পালাল; ঝড়, বৃষ্টি, তুফান, যাব কোথা? আমি গিয়ে বাড়ীর ধারে কচুবনে বসলাম। কতক্ষণ পরে দেখি, বিজয় হয়েছে। প্রসব বেদনা ত হয় নাই, আগে বুঝ'ব কি ক'রে? তাই ওকে সকলে কচুবনে বলে। আর ওর বাবাকে পাড়ার লোকে খড়িধোয়া গোসাঁই বলত।’

প্রশ্ন—‘কেন, তাঁকে খড়িধোয়া গোসাঁই বলত কেন?’ ঠাকুরমা বলিলেন—‘আরে, তিনি যে ভারি আচারী ছিলেন, জানিস? নিজে রান্না ক'রে হবিষ্ণান করতেন; রান্নার সময়ে প্রতিদিন

প্রত্যেকখানা খড়ি জলে ধুয়ে নিতেন। এজন্য সকলে তাঁকে খড়িধোয়া গোঁসাই ব'লে ডাকতো, গুরুপ লোক কি আর এখন হয়? কত ভক্ত ছিলেন! তিনি যখন ভাগবত পাঠ করতেন, তিন চার ঘণ্টা জ্ঞান থাকত না, গায়ের সাদা পাতলা চাদর খানা, ঘামের মত রক্তে ভিজে যেত, লাল হ'য়ে যেত।”

ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—“ঠাকুরমা, আপনি নাকি আতুড়ঘরে ঠাকুরকে বিষ খাওয়াইয়া ছিলেন?” ঠাকুরমা বলিলেন—“রাম! রাম! তোরা কি বল দেখিনি! তা কি আবার কেউ করে? ছেলের ঠাণ্ডা লেগেছিল। মুসন্দের যে লাগাতে হয়, তা ত আমি জানি না, আমি মুসন্দের ভেবে, ছু'আনা আন্দাজ আফিং গুলে খাইয়েছিলাম; কালো হ'য়ে গিয়েছিল। তাতে আর ছেলের কি হ'ল? ভগবান্‌ই দয়া ক'রে রক্ষা করলেন।”

একদিন ঠাকুরমা, ঠাকুরকে বলিলেন—“বিজয়, তুই আর সব তীর্থে যাস, শ্রীক্ষেত্রে যাস না।” ঠাকুরমার একথা বলার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন—“ও যে শ্রীক্ষেত্র হ'তেই এসেছে; শ্রীক্ষেত্রে একবার গেলে আর কি ওকে আনতে পারবি? ওর স্থানে একবার ও গেলে, আর ফিরে আসবে না, সেইখানেই থেকে যাবে।”

ঠাকুরমা ঠাকুরের সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক কথা অনেক সময়ে বলেন, সে সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝি না। মাথা গরম অবস্থায় ঠাকুরমা যা তা বলেন বলিয়াই মনে হয়। এসকল কথা যথার্থ কি না, জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেছি, অবসর মত ঠাকুরকে এ সব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা রহিল।

প্রসাদ কাকে বলে, কার্য্যাকার্য্য বুঝা শক্ত।

৫—১৬ই পৌষ।

প্রতিদিন প্রসাদ লইয়া আমাদের মধ্যে বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। বাগড়াও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে।

ঠাকুর ইহা জানিয়া বলিলেন—“ভুক্তাবশিষ্টকে প্রসাদ বলে না। উহা উচ্ছিষ্ট, এঁটো। প্রসন্ন ভাবই প্রসাদ। প্রসাদ ভাবেতে হয়। কৃপাই প্রসাদ, দয়াই প্রসাদ। গুরু যে সকল নিয়ম ক'রে দেন, তা ঠিক মত রক্ষা ক'রে চল্লেই, গুরুর যথার্থ প্রসাদ পাওয়া যায়।”

কোন ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জ্ঞাত করায়, ঠাকুর বলিলেন—“যাঁরা অন্তর্দর্শী, তাঁরা বাইরের কার্য্যাকার্য্যের একটা মূল্যই দেন না। তাঁরা অন্তরের ভাবই দেখেন। কার কোন্ কার্য্যে উপকার হয়, তাও বুঝা বড় কঠিন। অনেক



মাতুলানিয় মংলয় কচুবন (গোষ্ঠামৌ প্রভুর জন্মস্থান)

রোগী আছে, কুপথ্য ক'রে উৎকট রোগ হ'তে আরোগ্য লাভ করে। যে সমস্ত কার্যকে সমস্যার লোকে নিতান্ত জঘন্য মনে করে, হয়ত তা অমূল্য ক'রে কারও জীবনের বিশেষ কল্যাণ হয়। কিসে কি হয়, তা বুঝা সহজ নয়। যিনি যা করেন না কেন, পরিণামে কল্যাণই হয়। নিজের কর্তব্যে স্থির থেকে, অমূল্য কার্য দেখে যেতে হয় মাত্র। তা হ'লেই রক্ষা। লোকের দোষ গুণের আলোচনাতে অনিষ্টই হয়।”

ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন—“কারও অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে যদি হঠাৎ একটা অমূল্য কার্য হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে সেজন্য অপরাধী হ'তে হয় না। জেনে শুনে অমূল্য কার্য করলেই অপরাধ। ভাল কর্তে গিয়ে, যদি একটা অনিষ্টও ক'রে ফেলে, তাতে অপরাধ হয় না।”

রাসলীলা ও গুরুশিষ্যসম্বন্ধ।

শ্রীমাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, “আপনার প্রতি এই—১৮ই পৌষ। সন্ধ্যা ভাব যায় না কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—(পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত) “নিজেকে যেমন পাণ্ডা ভাবেন, আমাকেও সেইরূপ মনে করবেন। নন্দ ও যশোদা, গোপালকে যে রূপ দেখতেন, আমাকে সেই ভাবে দেখবেন।”

এই কথার পর ঠাকুর একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন “শ্রীমতীর প্রতি বিশেষ অগ্রহ দেখালে তিনি গর্বিতা হন, ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করলেন। পরে সখীগণ ও শ্রীমতী একত্র হ'য়ে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ক্রন্দন করিতে লাগলেন। তখন আবার শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা করলেন। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখে আনন্দে বিহ্বল হলেন, শ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণের বামে সখীগণকে দেখে আনন্দিতা হলেন। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধও এই প্রকার। গুরু শিষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে, ভগবান্ গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু শিষ্য একত্র হ'য়ে ক্রন্দন করলে, ভগবান প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা করেন। তখন শিষ্য, গুরুকে কৃষ্ণের বামে দর্শন ক'রে, সুখী হন; গুরুও শিষ্যকে ভগবানের বামে দর্শন ক'রে, সুখী হন।”

ভোরকীর্তন—শিষ্যপদে লুটালুটি।

শেষ রাত্রে প্রায় চারিটার সময়ে নিত্যই ঠাকুরের আসনের সম্মুখে ধূপ ধূনা চন্দন গুগ্গুলাদি জালিয়া দেওয়া হয়। ঘরটি স্বগন্ধি ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর করতাল বাজাইয়া—

এই—১৮ই পৌষ।

“হরি বল্ব, আর মদনমোহন হেরিব গো ।
 যাব ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপিকার নুপুর,
 গোপীর রাক্ষা পায়ে ঝুঁঝু বাজিব গো ।
 তোরা সব ব্রজবাসী, পুরাও এ অভিলাষী
 আমি নিতই নিতই শ্রামের বাঁশী শুনিব গো ।”

গাইতে গাইতে অতি মধুর স্বরে ‘হরি ঠুঁ’, ‘হরি ঠুঁ’ বলিতে থাকেন, এবং কান্দিতে কান্দিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন ।

এ সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য বাবু ভাবাবিষ্ট হইয়া গাইতে থাকেন—

“কানাই ! এ কি ভাই, র’লি প্রভাতে অচেতন !
 উঠ’ল ভান্স ও নীলতনু, যায় না দেখু কাহ্ন ভিন্ন ।
 অঞ্জন আখিযুগলে, গুঞ্জাহার পররে গলে,
 কদম্বমঞ্জরী দিয়ে, সাজাও যুগল কর্ণ ।
 পর ধড়া, মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া রূপলাবণ্য ।
 একদিন বনে, রাখালগণে, বিষভোজনে জীবনশূন্য ।
 তুই যাই ছিলি, জীবন দিলি, তোর তুলনা নাই আর অল্প ।”

কখনও বা—

“শ্রীঅঙ্ক ত্রিভঙ্গ কেন, কেন বা বাঁকা নয়ন ।
 ওলো সখি, কহ দেখি, ইহার কি বিবরণ ।

শ্রাম চঞ্চল নয়নে চায়, কোথা থাকে কোথা যায়,
 কে বুঝিবে অভিপ্রায় ইহার কেমন ।

সরল বাঁশের অংশ, বংশীকুল-অবতংস,
 কুল ধর্ম্য ক’রে ধ্বংস, সে করে মন হরণ ।

শ্রাম অতনু সতনু করে, সতনুর মন হরে,
 শিখী পাখীর পাখা শিরে, সে করে মনোহরণ ।”

ঠাকুর কোন কোন দিন—

“আমার মন পাগ লাগে, হৃদয়ে গুরুজীর নাম লইও ।
 আরে দমে দমে লইওরে নাম, কামাই নাহি দিও ।”

ইত্যাদি গাইতে গাইতে ‘গুরু ঠুঁ’, ‘গুরু ঠুঁ’, বলিতে থাকেন এবং তাঁহার কর্ণ রোধ হইয়া যায় ।
 তখন ঢাকা ও বানরীপাড়ার শশীবাবু প্রভৃতি গুরুভাতারা খোলকরতাল সংযোগে সঙ্কীর্ণ আরম্ভ করেন—

“আমি গৌরপ্রেমে হ’য়েছি পাগল (ঔষধে আর মানে না)
 চল সজনী যাইগো নদীয়ার ।

নগরেতে হেঁটে যেতে পাড়ার লোকে মন্দ কয়,
 (আমি) পরের মন্দ পুষ্প চন্দন, অলঙ্কার প'রেছি গায় ।
 সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে, প্রেমের বিষ উজান ধায়,
 (ওলো) গৌরাদ্ভ ভুজঙ্গ হ'য়ে, দংশিয়াছে আমার গায় ॥”

ভাববিহ্বল অন্তরে মহা-উৎসাহের সহিত উহার কীর্তন করিতে থাকিলে, অবশিষ্ট গুরুভ্রাতারা সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া আপন আপন আসনে নিষ্পন্দ অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন । কখনও কখনও ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া বিতৃত ঘরের মেঝেতে গড়াইতে গড়াইতে শিষ্যদের পদতলে যাইয়া লুটাইয়া থাকেন, এবং শিষ্যদের চরণ মস্তকে বারংবার জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে—“আমাকে দয়া করুন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন” বলিতে বলিতে সংজ্ঞাহীণ হইয়া পড়েন ।

আহা ! তখন ঠাকুরের জটাত্মমণ্ডিত মস্তক, নগণ্য শিষ্যপদতলে লুপ্তিত দেখিয়া প্রাণে যে কি অবস্থা হয়, বলিতে পারি না । ধৃত দয়াল ঠাকুর ! আমাদের মত অবাধ্য, কলহপ্রিয়, দুর্বিনীত, দাস্তিক প্রকৃতি নিজ আশ্রিত জনের চরণতলে কাতর হইয়া লুটাপুটি করে, এ জগতে এমন আর কে আছে ?

পাপের মূল কিসে যায় ? ধর্ম কি ?

ই—১৮ই পৌষ ।

আজ একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“পাপের মূল কি চেষ্টা দ্বারা নষ্ট করা যায় না ?”

ঠাকুর বলিলেন—“পাপের মূলচ্ছেদ মানুষে সহজে করিতে পারে না ; এ বিষয়ে মানুষের শক্তি একেবারে নাই বললেও হয় । প্রায়শ্চিত্ত, ব্রতনিয়মাদি দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সাময়িক, কুঞ্জরস্নানবৎ । অন্তরে সংস্কার অবস্থায় পাপ থেকে যায়, একটা তেমন কারণ পেলেই আবার প্রকাশ হ'য়ে পড়ে । একমাত্র ভগবানের দর্শন লাভ হ'লে, তাঁরই কৃপায় পাপের মূল নষ্ট হ'য়ে যায় ।”

“ভিচ্ছতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিচ্ছন্তে সর্ববসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

ইহা শুনিয়া বলিলাম—“তা হ'লে আর আমাদের করবার কি আছে ! এমনি প'ড়ে থাকি, তাঁর কৃপা যদি কখনও হয় ত হবে ।”

ঠাকুর বলিলেন—“তা বললে চলবে কেন ! যতদিন পর্যন্ত চেষ্টা থাকবে, কার্য্য না ক'রে কি নিস্তার আছে ! কার্য্য কর্ত্তেই হবে । নানাদিকে নানা প্রকার চেষ্টা ক'রেও,

যখন মানুষ নিজেকে একেবারে অপদার্থ, অকর্মণ্য ব'লে বুঝতে পারে, তখনই সে ঠিক স্থানে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তা পরিষ্কাররূপে না বুঝা পর্যন্ত সে মনে করে, চেষ্টা করলেই কৃতকার্য হ'তাম। সুতরাং ভগবানের শক্তির উপর যথার্থ নির্ভরটি হয় না। এজন্য পুনঃপুনঃ নিষ্ফল হ'লেও, অত্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক চেষ্টা করতে হয়, না হ'লে হয় না।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“ধর্ম লাভ করতে হ'লে, প্রথমে কি কি বিষয় চেষ্টা করতে হয়?”

ঠাকুর বলিলেন—“বলা ত যাচ্ছে কত, কিন্তু কর কই! ধর্মার্থীদের প্রথমেই শৌচ, সত্য, ক্ষমা ও শান্তি এই চারিটি অভ্যাস করতে হয়।”

প্রশ্ন—“শৌচ কি শরীরটি শুদ্ধ রাখা?”

ঠাকুর—“হাঁ, তাই! গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে শারীরিক শৌচ, উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া, আর গৃহীর পক্ষে শুধু ঋতুগামী হওয়া। আন্তরিক শৌচ—‘সরলতা’। যথার্থ সরল হ'লেই অন্তর শুদ্ধ হয়।

২। ‘সত্য’ - সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার ও সত্য চিন্তা। অসত্যের কোন প্রকার সংশ্রব না রাখা।

৩। ‘ক্ষমা’—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা কারও হ'তেই উদ্বেগগ্রস্ত না হওয়া এবং কারও উদ্বেগের কারণ না হওয়া। এ বিষয়ে মনোযোগ রাখতে হয়।

৪। ‘শান্তি’—চিন্তের অবস্থা সর্বদা সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা, এক প্রকার রাখা। কোন কিছুতে উপেক্ষা বা অপেক্ষা না রাখা। এ সব নিয়ম ধ'রে খুব চেষ্টা কর না।”

আমি এই সকল শুনিয়া ভাবিলাম, “মন্দ নয়! সিদ্ধ হইলে যে সকল অবস্থা লাভ হয় বলিয়া এতকাল মনে করিয়া আসিতেছি, ধর্মলাভ করিতে হইলে তাহাই প্রথম আরম্ভ, ইহাই ঠাকুর বলিলেন; সুতরাং ধর্মলাভ আমার পক্ষে হাতে চাঁদ ধরার মত কল্পনা মাত্র। যাহা কখনও হইবে না, তাহা লইয়া চেষ্টা করিতেছি মাত্র।”

ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“তবে প্রকৃত ধর্ম কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“ধর্ম অতি সূক্ষ্ম বস্তু। বাহিরের বেশ ভূষা, বাহিরের কাজ কর্ম, এ সকল কিছুই ধর্ম নয়। তবে এখন নিজে ভাল হওয়া এবং অন্যের ভাল করা, ইহাই ধর্ম মনে করতে হবে। নির্জনে অন্ধকারে একাকী ব'সে আত্মানুসন্ধান ক'রে দেখবে, নিজের ভিতরে কোন দোষ আছে কি না। নিজের কাছে নিজে ভাল হ'লেই ভাল। মিথ্যাকথা, কু-দৃষ্টিপাত, হিংসা, বিদ্বেষাদি যা যা দোষ ব'লে জান, তা আগে ত্যাগ কর।

মহাপ্রভুর পুরাণ—চিত্রপট ।

চিত্রপটে মহাপ্রভুর চক্ষু দিয়া পিচকারীর মত বেগে অশ্রুজল পড়িতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম -“একি আবার কখনও হয়!” ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন—“নিশ্চয় হয়। চিত্রকর যেমন যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমনটিই এঁকেছেন ; তিন প্রভুরই আকৃতি ও নৃত্যের অবস্থা অধিকল দিয়েছেন।* এক সময়ে যা সত্য সত্য ঘটে, অল্প সময়ে তা অসম্ভব

প্রতিকৃতিই এই চিত্রপট।
ঠাকুর এই চিত্রপটখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এইট বাহাতে সোপান না হয় সে জন্য ফটো রাখিতে বলিয়াছিলেন।
এ কারণে পুরুষোত্তম দামে, ঠাকুরের (জটিলী বাবার) সমাধিসমিতির সেবায়ত ছোট দাবা শ্রীমুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় যত্নপূর্বক সংগ্রহ করিয়া, আমাদের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'জগন্নাথদেব' ও 'রাধাকৃষ্ণের' পটের সহিত সমাধিসমিতির রাখিয়া
নিয়মিতরূপে উহা পূজা করিতেছেন।

মনে হয়। প্রার্থনাসময়ে কেশব বাবু চোখ দিয়ে রক্তের ধারা কখনও কখনও পড়ত। যারা দেখে নাই, কখনও কি বিশ্বাস করতে পেরেছে? এ ত সে দিনের কথা।”

প্রশ্ন—“মহাপ্রভুর সময়ে তো ফটো তোলার প্রণালী ছিল না, অবিকল রূপ কি প্রকারে হবে?”

ঠাকুর বলিলেন—“কেন ধ্যানতে ক’রে! তখনকার চিত্রকরদের এমন শক্তি ছিল, যা আঁকবেন মনে করতেন, এমন একাগ্র হ’য়ে তা দেখতেন যে, ঐ চিত্র তাঁদের চক্ষে যেন ছাপ প’ড়ে যেত। কিছু দিন তাই তাঁরা ধ্যান করতেন এবং সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক’রে নিয়ে, পরে সেইরূপ আঁকতেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তাতে কি অবিকল রূপ হয়?”

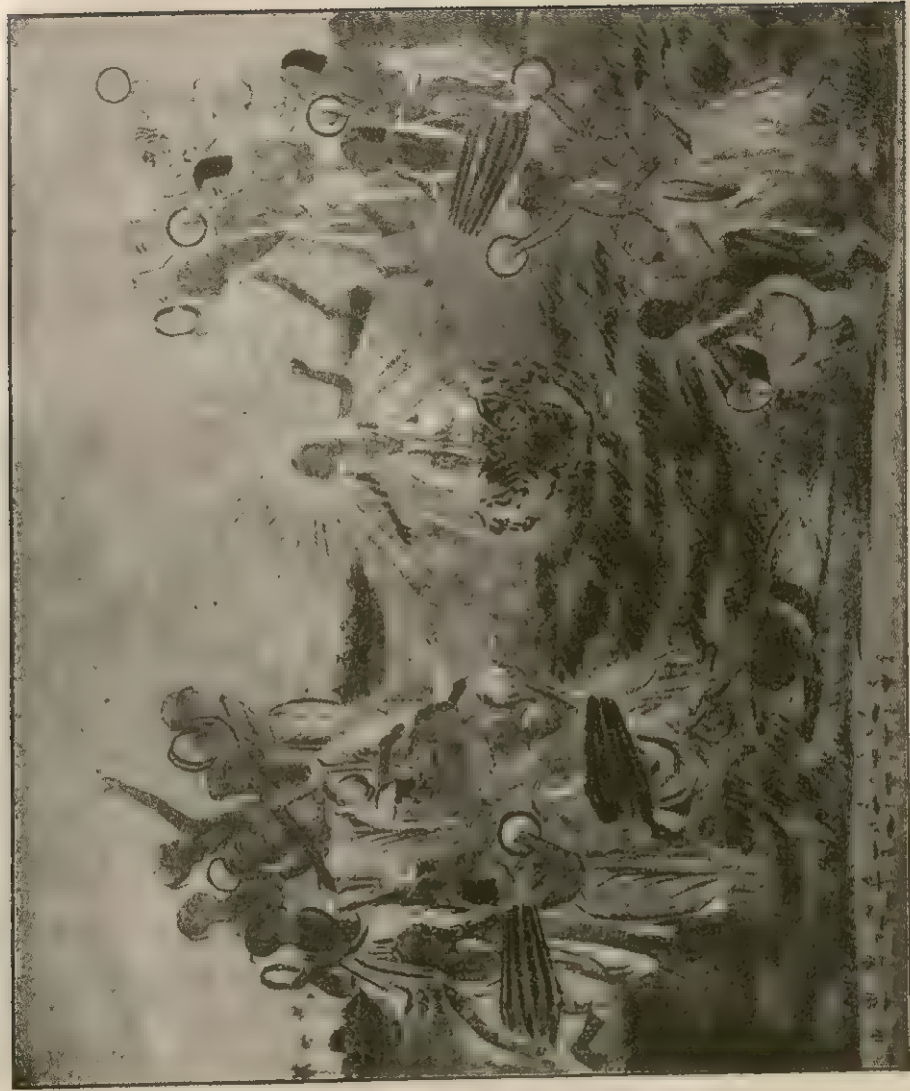
ঠাকুর বলিলেন—“একেবারে ঠিক কি আর হয়! তবে প্রায় ঠিকই হয়। এখনও কৃষ্ণনগরের কুমারদের মধ্যে কারও কারও এ শক্তি অনেকটা আছে। যার ইচ্ছা হয়, যেয়ে পরীক্ষা ক’রে দেখতে পার।”

ঠাকুর এই চিত্রপটখানিকে অত্যন্ত জীর্ণ দেখিয়া, ইহার একখানা ফটো রাখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন।

অদ্বুত সঙ্কীর্্তন—যাই যাই!

এখানে ষতই দিন যাইতেছে, লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের গুরুভ্রাতা-ভগ্নীরা প্রতিদিনই দলে দলে আসিতেছেন। প্রত্যহই শতাধিক পাতা পড়িতেছে। কেনারাম নামক এক প্রসিদ্ধ রত্নয়ে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতি সপ্তাহেই দুই তিন দিন, দেড়শত দুইশত লোকের লুচি, মিষ্টান্ন, ঘৃতান্ন প্রভৃতির বিপুল আয়োজন ও মহাঘণ্টার সহিত ভোজনোৎসব হইতেছে। কোথা হইতে কোন্ দিন কি ভাবে এ সমস্ত সামগ্রী জুটিতেছে, অনেক অহুসঙ্কানেও আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পরিচিত অপরিচিত বহুলোকের সমাগমে এবং সঙ্কীর্্তন মহোৎসবে আশ্রমটি দিনরাত ধেন বাম্ বাম্ করিতেছে।

আশ্রমে সাক্ষ্যকীর্্তন যে কি অদ্বুত ব্যাপার তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্্তনের আনন্দ স্মরণ করিয়া দলে দলে শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বণিক ও নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা প্রতিদিনই আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলেন। সন্ধ্যা হইলে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া “হরিসে লাগি রহরে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই” এবং “প্রভুজী এয়াসনা নাম তোহার। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার,” কখন বা “গগনমে থালে রবি চন্দ্রদীপক বনি, তারকামণ্ডল চমকে মতিরে” এই সকল গান করিয়া আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। তৎপরে গুরুভ্রাতারা সকলে হরি-সঙ্কীর্্তন আরম্ভ করেন। কোন কোন দিন প্রসিদ্ধ গায়ক মুকুন্দ ঘোষ বা



রামভারণ ঘোষ অথবা বৈষ্ণবচরণ কুণ্ড মহাশয় স্ব স্ব দলে মিলিত হইয়া মহা উৎসাহের সহিত মহাজন পদাবলী বা নামগান করিয়া থাকেন। এই সঙ্কীৰ্ত্তনে নিত্যই ঠাকুরের নব নব অবস্থার অভূত বিকাশ এবং ভক্তমণ্ডলীর চমৎকার ভাবোচ্ছাসের মনোমোহন চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ একদিনের জগুও উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। এ জীবনে আর কখনও এ দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ !

গতকল্য সন্ধ্যার পর মহাসমারোহের কীর্তনে তিন চারিটি খোল করতাল একতালে বাজিয়া উঠিলে, বহুলোকে যখন একতানে সমস্বরে উচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ঠাকুর ক্ষণকাল আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া দক্ষিণে বামে চলিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী একবার ঠাকুরের পানে, আরবার ভক্তগণের দিকে, উল্লসিত প্রাণে তাকাইতে লাগিলেন। ঠাকুর হস্তদ্বয় সম্মুখের দিকে উত্তোলন করিয়া, “জয়শচীনন্দন” “জয়শচীনন্দন” বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোকই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ লক্ষ্য প্রদান করিয়া উদ্ভূত নৃত্য করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতৃগণ ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ প্রকার নৃত্য ও হরিধ্বনিতে আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। জানি না কি দেখিলাম! ঠাকুরের প্রকাণ্ড শরীরটি ক্রমে ক্রমে খৰ্ব্বাকৃতি হইয়া গেল; “এঁরে, এঁরে” বলিতে বলিতে তিনি বালকের মত মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় সম্মুখে ও পশ্চাতে ঘন ঘন আন্দোলিত করিয়া, বিস্তৃত হলঘরের এদিকে সেদিকে উর্দ্ধধামে দৌড়িতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ ও করতালের তালি ঘন ঘন পড়িতে লাগিল; সঙ্কীৰ্ত্তনের ধ্বনি চতুর্দিক বৃদ্ধি পাইল। মুহূৰ্ত্তে হরিধ্বনি হুকার গর্জনে মিলিত হইয়া, আশ্চর্য্য চমকে সকলকে দিশাহারা করিল। এ আবার কি অভূত দৃশ্য! ঠাকুর “ধর” “ধর” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অকস্মাৎ একস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্বক নতশিরে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুনঃ উৎক্ষেপণ পূর্বক, ‘জয়রাধে’ ‘জয়রাধে’ বলিতে বলিতে নিষ্পন্দ নয়নে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। শরীরটি স্থির, অথচ বাহ বক্ষঃস্থলাদি প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকিত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখের ও উভয় পার্শ্বের লম্বিত জটাতার থরথর কম্পিত হইয়া মস্তকোপরি খাড়া হইয়া উঠিল এবং উহা সর্পফণার গ্রায় অগ্রভাগ বিস্তার করিয়া স্রস্র কাঁপিতে লাগিল। ঐ সময়ে মস্তক হইতে চন্দ্রশিখর গ্রায় উজ্জল ছটা এবং নেত্রদ্বয় হইতে জ্যোতির্শয় ক্ষুদ্রিকরাশি বিহ্বাতের মত ছুটিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, অনেক গুরুভ্রাতা-ভগ্নি বিশ্বয়স্কচক চীৎকার করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর উর্দ্ধদিকে তর্জনী নির্দেশপূর্বক, ‘ঐ দেখ, আমাকে সকলে নিতে এসেছেন, আমি যাই, আমি যাই’ বলিতে বলিতে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া দিলেন। ‘ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,’ ‘ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,’ বলিয়া চারিদিকে কান্নার শব্দ উঠিল। বহুলোকের উপর

লক্ষ দিয়া আমরা চারি পাঁচজনে যাইয়া ঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিলাম। ব্রাহ্মধর্মপ্রচাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু উন্নতের মত হইয়া, “দোহাই পরমহংসজী! দোহাই পরমহংসজী!” কখনই যেতে দিব না, কখনই যেতে দিব না” বলিতে বলিতে, মস্তক ও হস্তদ্বয় ঘন ঘন নাড়া দিয়া ভয়ঙ্কর হুকার করিতে লাগিলেন। ভিতরে বাহিরে সীলোক পুরুষের ভীষণ কান্নার রোল উঠিল। ঠাকুর অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর, “জয়গুরু!” “জয়গুরু!” বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ! আগন্তুক ভক্তলোক সকল ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এঁরা সব কে এসে আপনাকে টানাটানি করছিলেন? আমাদের ত মনে হ’লো, বুঝি এবার আপনি চলে গেলেন।”

ঠাকুর বলিলেন “গতিক তাই বটে! গৌরশিরোমণি মশায়, যোগজীবনের মা, শ্রীবৃন্দাবনের সখিগণ এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। ঐ সময়ে পরমহংসজী * হঠাৎ উপস্থিত হ’য়ে বাধা দিলেন। গুরুজীর ইচ্ছা না হ’লে কারও চেষ্টাতে ত কিছু হবার যো নাই!”

প্রশ্ন—“গৌরশিরোমণি মহাশয় কি এ শক্তি লাভ করেছিলেন?”

ঠাকুর—“এ শক্তি লাভ না করলে রাসমণ্ডলে প্রবেশ করবেন কিরূপে?”

প্রশ্ন—“রাসমণ্ডলে প্রবেশকালে নাকি সখিদেহ লাভ হয়?”

ঠাকুর—“হাঁ, পুরুষের ওখানে প্রবেশাধিকার নাই।”

গত কল্যাণের ভাবোন্মাদের মধ্যে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমার দৃষ্টি কিন্তু ঠাকুরের দিকেই ছিল। স্মৃতিতে যতটুকু জাগরুক আছে, তাহাই নিপিবদ্ধ করিলাম। সমস্ত অবস্থা ও ভাবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রাখিতে পারিলাম কি না, জানি না।

সঙ্কীর্ণনে গুরুভ্রাতাদের নানাপ্রকার ভাবেচ্ছাস দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সাধন ভজন কোন গুরুভ্রাতা হইতে যে কম করিতেছি তা নয়, সকলেই ত বিষয় কাণ্ডে বা বাজে গল্পে দিন কাটাইতেছেন। আমি ত প্রায় সারাদিনই নাম করি। তবে আমার এরূপ গুরুতা কেন? এসব অবস্থা সাধনসাপেক্ষ হইলে, আমারই ত সকলের আগে হইবার কথা। আর কুপাসাপেক্ষ হইলে, অযোগ্যো কুপা হইল, যোগ্যো হইল না, ভগবানের এই বিচারই বা কেন?

ঠাকুরদম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবুর কথা।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি খবর আসিল, যোগজীবনের স্ত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিছুকালধাবৎ অবিরাম জরে ভুগিয়া এখন তিনি একরূপ মৃত্যুশয্যায় আছেন। গেণ্ডারিয়ার

* মানসসরোবরবাসী ৩শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দস্বামী পরমহংস, যিনি গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে প্রভুজীকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ষাঁহার নির্দেশে তিনি ৮কালীধামে শ্রীশ্রীহরিরানন্দস্বামী স্বরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সকলেই তাঁহাকে লইয়া অস্থির। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই ঢাকা যাইতে ইচ্ছা জানাইলেন। আমরাও সকলে পৌষ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুরের সঙ্গে ঢাকা যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

ঢাকাযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ নির্জনে আলাপ করিলেন। কি বলিলেন, কিছুই তখন জানি না। পরে এক সময়ে ছোট দাদা ও কুঞ্জ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—“গৌসাই মনের কথা বলিতে পারেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতাম না। গৌসাইকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘গৌসাই! বলুন ত আমি কোন্ চক্রে?’ গৌসাই অমনি ঘটচক্রের মধ্যে ঠিক সেই চক্রের নাম লইয়া বলিলেন—‘আপনি *** চক্রে ঘুরিতেছেন।’ গৌসাইয়ের নিকট আমার দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে তিনি বলিলেন, ‘আপনাকে আমি বন্ধুভাবে দেখি, আপনার আর প্রয়োজন নাই।’

নগেন্দ্র বাবু এই দুই জনকে এবং আরও কাহাকে কাহাকে ঠাকুরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “গৌসাই যে দিন কলিকাতা আসিলেন, সেই দিন শূতপথে তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমি পরিক্ষার বুঝিয়াছিলাম, গৌসাই আসিতেছেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। গৌসাই ষ্টেশন হইতে সোজা আমার বাসায়ই ঐ দিন রাত্রে আসিয়া উঠিলেন।”

ঠাকুরের ঢাকাযাত্রা—গুরুভ্রাতাদের অবস্থা।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে ট্রেন ছাড়িবার কাল নিদিষ্ট থাকিলেও, ঠাকুরের তাড়াতে আমরা ছয়টার সময়েই বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর ট্রেনযোগে যখনই যে কোন স্থানে যান, দুই তিন ঘণ্টা পূর্বে ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকেন, ইহা ছেলেবেলা হইতে ঠাকুরের একটি অলঙ্ঘ্য নিয়ম। আমরা বহুপূর্বে ষ্টেশনে যাইতে ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়া পড়ি।

ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন—“অনর্থক বাসায় সময় কাটায়ে, পরে অস্থির হ’য়ে ছুটাছুটি করার চেয়ে, বরং দুই তিন ঘণ্টা পূর্বে ষ্টেশনে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ব’সে থাকা ভাল। আমি কোথাও যেতে হ’লে ওরূপই করি। জীবনে আমি কখনও ট্রেন ‘মিস্’ করি নাই।”

সন্ধ্যার একটু পবেই গুরুভ্রাতারা সকলে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। আজ আনন্দের হাট তাকিল। গুরুভ্রাতাদের কাহারও মনে শান্তি নাই। সকলেরই মুখ মলিন এবং চিত্ত স্ফুর্তিহীন। ঠাকুর যতক্ষণ ষ্টেশনে ছিলেন, সকলেই ঠাকুরকে ঘিরিয়া নির্বাক অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। গাড়ি ছাড়িবার অল্পক্ষণ পূর্বে, সকলে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও ছল্ ছল্ চক্ষে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া করযোড়ে মন্তক অবনত করিয়া প্রতিনমস্কার করিতে লাগিলেন। এ সময়ে গুরুভ্রাতারা আর কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাদের কাতর প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেহ কেহ দাঁড়ান অবস্থায় থাকিয়া, কেহ

কেহ বা অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। ঈহাদের ঐ সকল অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। গাড়ির ভিতরে বাহিরে কারার রোল পড়িয়া গেল। এমন সময়ে গাড়িও ছাড়িয়া দিল। আহা! মাসাধিক কাল ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী নবীন বাবু, অচিন্তা বাবু, মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু, দেবেন্দ্র সামন্ত, কৃষ্ণ গুহ, শ্রীচরণ বাবু, মহেন্দ্র বাবু, ছোট দাদা ও মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতির অমুরাগ-বিহ্বল বিষয় মূর্তি ভাবিতে ভাবিতে হুঃখিত মনে আমরা গোয়ালন্দ চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, 'হায় অদৃষ্ট! এ সকল গুরুভ্রাতাদের অমুরাগের কণিকামাত্র পাইয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্যও যদি আমি এইরূপ কাদিতে পারিতাম, এ জীবন ধন্য হইয়া যাইত।'।

পদ্মার জল হাওয়া; সাহেবের পরিহাস।

আমরা সমস্ত রাত্রি গাড়িতে থাকিয়া সকালবেলা গোয়ালন্দ ষ্টামারে উঠিলাম। একখানা বড় কক্ষল বিছাইয়া সকলে ঠাকুরের চতুর্দিকে বসিয়া পড়িলাম। ঠাকুর পদ্মানদী দেখিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—“গঙ্গার প্রবল ধারাটিই এই পদ্মায় মিলে প্রবাহিত হ'চ্ছে। পদ্মার হাওয়াতে শরীরের জড়তা নষ্ট করে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ক'রে তুলে। জলের অসাধারণ গুণ। আধফুটা চাল বা কাঁচা চিড়ে আধ সের খেলেও, পদ্মার এক ঘটি জল খেলে তা অনায়াসে হজম হ'য়ে যায়। পদ্মাতীর-বাসী মাঝিরা যেরূপ সবল এবং সুস্থ এরূপ প্রায় দেখা যায় না। পদ্মানদীর বিস্তৃতি দেখলে চিত্তটি যেন প্রশান্ত হ'য়ে পড়ে।”

ঠাকুর পদ্মার জল হাওয়ার গুণ কিছুক্ষণ বলিয়া চুপ করিলেন। এ স্থলে সুন্দর একটি ঘটনা লিখিতেছি। মধ্যাহ্নকালে ঠাকুর শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, ভাবের প্রগাঢ়তায় বারংবার চলিয়া চলিয়া পড়িতেছেন, আবার মাথা তুলিতেছেন; অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণে গুণ্ডুল ভাসিয়া যাইতেছে। গুরুভ্রাতারাও নির্ঝাঁক, আপন আপন ইষ্টনাম স্মরণে স্থির। দূর হইতে একজন উচ্চপদস্থ সাহেব ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া মাতাল অম্মমানে, ঠাকুরের সম্মুখীন হইয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, “ক্যা জী, দারু পিয়া? কেৎনা পিয়া? আরে তোম্ কায়্ সা দারু পিয়া?” সাহেব হুঁতিন বার ঐ প্রকার বলাতে ঠাকুর মাথা তুলিয়া দীর্ঘ হাস্তমুখে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“হাঁ, দারু পিয়া, বহুত পিয়া। তুম্‌হারা যীশুখ্রীষ্ট যো দারু পিতে থে, হাম্ তো আভি ওহি দারু পিয়া।”

সাহেব শুনিয়া একটু চমকিয়া কয়েক সেকেন্ড ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে লজ্জিত ভাবে একটু হাসিয়া, মাথার টুপি তুলিয়া হুঁহাতে ঠাকুরকে সেলাম দিতে দিতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে আমরা দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া গেওয়ারিয়া আশ্রমে পহুঁছিলাম। আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ; ঠাকুরকে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামীর স্ত্রী বসন্তকুমারীর দেহত্যাগ ।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়াছেন । আশ্রমস্থ এবং সহরনিবাসী গুরুভ্রাতা-ভগিনীদিগকে
পাইয়া আমাদের যেমনই একটা আনন্দ ও উৎসাহ প্রাণে জাগিয়াছে,
২৫শে পৌষ, শুক্রবার । যোগজীবনের স্ত্রীর মূর্খু অবস্থা দেখিয়া তেমনই আবার একটা আতঙ্ক ও

বিমর্ষভাব সকলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে । ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দিবারাত্র
বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করিয়াও একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন । এ সময়ে ঠাকুর
আশ্রমে উপস্থিত হওয়াতে কাহারও কাহারও প্রাণে একটু ভরসা জন্মিয়াছিল, বুঝি এ যাত্রা
বসন্তকুমারী রক্ষা পাইবেন ; কিন্তু দেখিতে দেখিতে উহার অবস্থা ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইয়া পড়াতে
সকলেই একেবারে হতাশ হইলেন ।

বসন্তকুমারীর সেবার বন্দোবস্ত করিবার জন্যই ঠাকুর যোগজীবনকে গেণ্ডারিয়া পাঠাইয়াছিলেন ।
কিন্তু সেবা কার্যে নিতান্ত অপটু বলিয়াই হউক অথবা আজন্ম উদাসপ্রকৃতি বলিয়াই হউক, তিনি
স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যথানিয়মে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার যাতনা লাঘবের তেমন সাহায্য করিতে
পারেন নাই ; তথাপি তাঁহার আগমন ও উপস্থিতিই বসন্তকুমারীকে যে আনন্দ ও সান্ত্বনা প্রদান
করিয়াছে ইহাই পরমকারুণিক গুরুদেবের ব্যৱস্থা ও আদেশেরই ফল মনে হয় ।

২৩শে পৌষ বধুর বিকারের মত অবস্থা ও স্থানের ক্রিয়া চলিতে লাগিল, ঠাকুরকে উহা জ্ঞাত
করায় ঠাকুর বলিলেন—“দৈহিক সামান্য যাহা একটু ভোগ আছে, প্রাণায়ামে তাহাই পরিষ্কার
হ’য়ে যাচ্ছে ।”

২৫শে তারিখে বসন্তকুমারী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আঁকাজ্জা প্রকাশ করিলেন । ঠাকুর উহার
শয্যা পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন । বসন্তকুমারী কৃতজ্ঞলি হইয়া কান্দিতে কান্দিতে ঠাকুরকে বলিলেন,
‘বাবা, আর কত দুঃখ দিবে বাবা ?’

ঠাকুর অশ্রুসিক্ত নেত্রে বলিলেন—“মা ! তোমার ক্লেশের অবসান হ’ল ব’লে ।”

ঐ দিন ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া ঠাকুরকে গিয়া বলিলেন—‘তিন দিন যাবৎ
বসন্তকুমারীর ভয়ঙ্কর শ্বাস চলিয়াছে, এ অবস্থায় আর কত কাল থাকিবে ? এ অবস্থা ত আর
দেখা যায় না ।’

ঠাকুর বলিলেন—“আর বিলম্ব নাই, সময় প্রায় হ’য়ে এলো ; তবে সাংসারিক ব্যাপারে
বুড়োঠাকুর হ’তে সময়ে সময়ে গালিগালাজ খাওয়াতে, বুড়োঠাকুরের উপর এখনও
উহার একটা বিরক্তিবাব আছে, সেটুকু গেলেই সব পরিষ্কার হ’য়ে যায় ।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন—‘তা আর হবে কিরূপে ?’

ঠাকুর বলিলেন—“বুড়োঠাকুরগণ যেয়ে ওঁকে একটু প্রসন্ন করলেই হয়। এজন্য আর ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।”

ইহার পর রোগীর অবস্থা নিতান্তই খারাপ হইয়া পড়িল দেবিয়া, দিদিমা অস্থির হইয়া পড়িলেন। বউ এবার চলিলেন বুঝিয়া, দিদিমা কান্দিতে কান্দিতে বধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, ‘বউ! আমি যদি কিছু অন্য় ক’রে থাকি, কষ্ট দিই থাকি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।’ বসন্তকুমারী দিদিমার আকুলভাবে কান্না ও এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া ছল্‌ছল চক্ষে বাহুদ্বারা দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খুব বিনয়পূর্বক বলিলেন, ‘দিদিমা! আপনি ত কোনও অপরাধই করেন নাই।’ এই ঘটনার পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, পুণ্যশীলা ভাগ্যবতী বসন্তকুমারী অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, জ্যেষ্ঠ সহোদর জগবন্ধু বাবুর সমক্ষে, আশ্রমস্থ সমস্ত গুরুভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে কান্দাইয়া, স্বামীর পদান্তিকে, গুরুর আশ্রমে দেহরক্ষা করিলেন।

মাঘ ।

যোগজীবনের দ্বীপ শ্রদ্ধ ও পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে ।

প্রশ্নোত্তর ।

বসন্তকুমারীর অচিরে দেহত্যাগ ঘটবে অল্পমান করিয়াই, আমি ঠাকুরের নিকট হোমের দ্বত ও
আহাবের চাউলের অভাব হইয়াছে জানাইয়া, অল্পমতি গ্রহণ পূর্বক বাড়ী
ই—মাঘ, সোমবার । গেলাম । সাতদিন পরে আবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । শুনিলাম

বহু গুরুভ্রাতা ময়বেত হইয়া হরিধ্বনিসহকারে বসন্তকুমারীর পবিত্র কলেবর শ্রাদ্ধপুণ্ড্র শ্রাদ্ধশানঘাটে
লইয়াছিলেন । ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে, যোগজীবনই উহার মুখাণ্ডি করিয়াছিলেন । দেহে
অগ্নিসংস্কার কালে অকস্মাৎ একটি গোলাকৃতি জ্যোতিঃপিণ্ড চিতা হইতে উথিত হইয়া নক্ষত্রবেগে
উর্দ্ধদিকে অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়াছিল । শ্রাদ্ধ-বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিলেন ।

গেণ্ডারিয়া পঁছবিবার পরদিনই সকালে চা সেবার পর, ঠাকুর আমাকে বলিলেন—“তুমি যোগ-
জীবনকে শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি পড়াতে পারবে ?”

আমি বলিলাম—“শ্রাদ্ধমন্ত্র আমি জানি না ।”

ঠাকুর বলিলেন—“পুস্তক দেখে পড়াবে, ওতে আর জানা না জানা কি ?”

আমি—“শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়ার সময়ে ত কতপ্রকার প্রক্রিয়া করে দেখেছি, সে সব ত আমার কিছুই
জানা নাই । আর সংস্কৃতও আমি ভাল জানি না । শ্রাদ্ধমন্ত্র আমাকে পড়াতে হ’লে, এখন থেকে
পুস্তক দেখে অভ্যাস ক’রে রাখতে হয় ; না হ’লে শুদ্ধমত পড়াতে পারব না ।”

ঠাকুর আমাকে আর কিছুই বলিলেন না । একাদশ দিবসে ঠাকুর নিজেই শ্রাদ্ধপদ্ধতি দেখিয়া
যোগজীবনকে শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়াইলেন, এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মত শ্রাদ্ধকার্য্য করাইলেন । শ্রাদ্ধের পর
ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন—“বসন্ত শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত থেকে হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ
করলেন ; সুস্থ দেহটি পরিত্যাগ ক’রে, দুর্বল কারণেই লাভ করলেন ।”

সময়মত জিজ্ঞাসা করিলাম—“জীবের কি প্রকার অবস্থাতে, দেহত্যাগের পরেই আবার দেহ
আশ্রয় করতে হয় ?”

ঠাকুর বলিলেন—“বিষয়েতে যাঁদের অতিশয় বাসনা রয়েছে, ভোগ-ইচ্ছা যাঁদের অত্যন্ত
প্রবল, তাঁরাই দেহত্যাগমাত্রে অপর দেহ আশ্রয় করেন ।”

প্রশ্ন—“পিতৃলোকে কাহারো ঘান ?”

ঠাকুর—“বিষয় উপস্থিত হ'লে যাঁরা ভোগ করেন, কিন্তু তা লাভের জন্য তেমন প্রবল স্পৃহা রাখেন না, সাধারণতঃ তাঁরাই পিতৃলোকে গমন করেন।”

প্রশ্ন—“বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোকে এবং তারও অতীত লোকে জীব কি অবস্থা হ'লে যায়?”

ঠাকুর—“যাঁরা ধর্ম্মমাত্র লক্ষ্য রেখে, কোনও প্রকার সদনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করেন, কর্ম্মানুসারে বাসনানুযায়ী এক এক প্রকার লোক তাঁদের লাভ হয়। আর সমস্ত বাসনার মূল পর্য্যন্ত যাঁদের নষ্ট হ'য়ে যায়, একমাত্র ভগবান্‌ই লক্ষ্য থাকেন, তাঁদেরই ব্রহ্মলোকের অতীত স্থানে গতি হয়। শুধু বাসনাহেতু জীবের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয়।”

ইহা ব্যতীত লোকান্তর প্রাপ্তির অস্ত্র কোনও হেতু আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব মনে করা মাত্র, ঠাকুর নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন—“এ সকল বিষয়ে আরও অনেক মীমাংসা আছে, কিন্তু সকলের কাছে সকল অবস্থার কথা বলতে নাই। যেযে অবস্থার লোক, যার যে দিক্ দিয়ে বুঝবার অধিকার, তাকে সেইরূপই বলতে হয়; নইলে সে তা ধরতে পারে না, বললে উপকার না হ'য়ে বরং অনিষ্টই হয়। এ সব শুনে কিছু লাভ নাই, কাজ ক'রে যেতে হয়।”

আশ্রমে অশান্তি ।

ঠাকুরের নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে সহস্র অসুবিধাকেও অসুবিধা মনে করি না, এ প্রকার আশ্রমের আমরা অনেকেই যখন তখন পরস্পরের নিকটে করিয়া নই মাঝে, শুক্রবার। আসিতেছি। এবার গোপালিয়া-আশ্রমে আসা অবধি, আমাদের সেই অভিমান, ভগবান পদে পদে চূর্ণ করিতেছেন। কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুরের সন্নিধিসম্বন্ধে আশ্রমে বিষয় অশান্তি চলিতেছে। গুরুভ্রাতারা সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; কি করি, কোথায় যাই, সকলেরই ভিতরে একটা উদ্বেগের আন্দোলন হইতেছে।

আশ্রমে একটিমাত্র চাকর, সে বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। রস্ময়ে ব্রাহ্মণ, আশ্রমে কোনকালেই ছিল না, এখনও নাই। শান্তিস্থধা রোগে অকর্ম্মণ্য; একাকিনী দিদিমা, রোগে শোকে জর্জরিত হইয়াও, এই বৃদ্ধাবস্থায় আশ্রমস্থ সকলের এবং অতিথি অভ্যাগত লোকদের রান্না, পরিবেশন এবং বাসনমাঝা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া একেবারে হয়রান হইয়া পড়িলেন। স্তবরাং নিজের অসমর্থতা জানাইয়া প্রতিদিনই তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে এ সকল কার্য্যভার লইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা এতকাল এ সকল সেবা গুরুপরিবার হইতে অবাধে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, একারণেই এখন দিদিমার এ সকল আপত্তি বা গালাগালিতে কেহ কর্ণপাতই করিলেন না। এদিকে অর্থেরও অতিরিক্ত অনটন উপস্থিত হইল। শুধু ভাতের সঙ্গে ভাল বা তরকারি ব্যতীত আহারের

আর কোন ব্যবস্থাই রহিল না। প্রতিদিন একই প্রকার, অতএব অধিকতর অরুচিকর খাওয়াইয়া এবং বিরক্তির সহিত প্রদত্ত আহারের সঙ্গে গালাগালি ভোগ করিয়া, গুরুভ্রাতারা অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। দিদিমার কোনও কাণ্ডে কেহ কোনও প্রকার সাহায্য বা অর্থকৃচ্ছতায় সহানুভূতি না করিয়া বরং তীব্রভাবে তাঁহার অর্থলোভ, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বশতঃই এখানে এ সমস্ত অসুবিধা ভোগ হইতেছে, এই প্রকার আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই অশান্তির সহিত বাগড়া বিবাদ ক্রমে ক্রমে এতই বৃদ্ধি হইল যে, অবশেষে গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইলেন, কেহ কেহ অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের বাড়ীতে আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন; আবার কেহ কেহ আশ্রম ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। দিদিমার দোষালোচনাই সকলের ভজন সাধন হইয়া উঠিল।

পবিত্র আশ্রমে, সামান্য আহার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহার লইয়া, পরস্পরের ভিতরে মনোবাদ ও সময়ে সময়ে তুমুল বাগড়া বিবাদ চলিল দেখিয়া ভাবিলাম—‘এ আবার কি! ঠাকুরের পরম শাস্তিপ্রদ সঙ্কলভাই ঠাহাদের এখানে থাকিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ আহার ব্যবহার লইয়াও ঠাহাদের চিত্ত এত উত্তপ্ত হয়! ঠাকুর আমাকে স্বপাক আহারের আদেশ করিয়া বড়ই স্নেহে রাখিয়াছেন। আমি এই সকল গোলমাল হইতে তফাৎ থাকিয়া, বেশ আনন্দে আছি।’ গুরুভ্রাতাদের অবস্থা দেখিয়া, আমি দিন দিন গৰ্বিত হইতে লাগিলাম। এ সময়ে কিছুদিনের মধ্যেই, আশ্রমের গরম হাওয়াতে, আমাকেও ফাঁফর করিয়া তুলিল। আমিও পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম।

আমার চাউলের অভাব হইলেই, বাড়ী হইতে লইয়া আসি। দিবসান্তে একবার মাত্র ভাতে-সিদ্ধ ভাত বা খিঁচুড়ী আহার করি। দক্ষিণের চৌচালা ঘরে বিকাল বেলা বহু লোকের আড্ডা হয় বলিয়া, ভাঁড়ার ঘরের বারেন্দায় রান্না করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের আদেশমত পদ্মা খাটাইয়া, নির্জনে আমাকে আহার করিতে হয়। ভাণ্ডার ঘরের বারেন্দায় আহারের ব্যবস্থা করিতে, ভাণ্ডারের তরিতরকারি, ডাল, লবণ প্রভৃতি চুরি করি বলিয়া, মিথ্যা অপবাদ আমার নামে রটনা হইল।

আহারের সময় কি আহার করি, আড়ে থাকিয়া কেহ কেহ তাহারও অহুসন্ধান লইতে লাগিলেন। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া জলিয়া যাইতে লাগিলাম। অবিলম্বে দক্ষিণের চৌচালার বারেন্দায় রান্না করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও অপবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। ছুঁমুঠো চাউল সিদ্ধ করিতে দুই তিনখানা কাঠই যথেষ্ট। এই কাঠ, আমি অবসরমত বৃক্ষের শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখি। যদি কখনও আমার কাঠ না থাকে, আশ্রম হইতে প্রয়োজনমত উহা গ্রহণ করি। তাহা লইয়াও নানা কথা উঠিল। আমি এ সকল উৎপাত দেখিয়া আশ্রমের কোন বস্তুতেই হাত দিব না সঙ্কল্প করিলাম। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এত অশান্তি আশ্রমে ঘটতেছে, অথচ ঠাকুর নির্বাক ও উদাসীন রহিয়াছেন দেখিয়া, ঠাকুরের উপর বড়ই বিরক্তি

ও রাগ হইল। জানি না কত কাল এ সকল স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন হিংসা, বিদ্বেষ, জালা, যন্ত্রণা, আমাদের ভিতরে বর্তমান থাকিবে। ঠাকুর সকলকে নিজ প্রকৃতিমত চলিতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ইহারই বা তাৎপর্য কি ?

সময়মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“মায়িক বিষয়ের সম্বন্ধ হেতু, কত কাল জালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ?”

ঠাকুর বলিলেন—“আরে বাপু ! কত জানী, কত যোগী, কত বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তির, মায়ার চক্রে প’ড়ে, একেবারে অস্থির হ’য়ে যান। কোন্ সময়ে, কার ভিতরে, কোন্ ছিদ্র দিয়ে পাপ প্রবেশ করে বলা যায় না। এ জন্ম সর্বদা কেবল ভগবানকে নিয়ে থাকতে হয়। সংসঙ্গে, সদালাপে, সদনুষ্ঠানে, সচ্ছিত্তায় প্রাতঃকাল হ’তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাটায়ে দিতে হয় ; আর মনে মনে সর্বদা প্রার্থনা করিতে হয়—‘ঠাকুর ! আমাকে তোমার ক’রে নেও। তোমাকে ছেড়ে আর কিছুই যেন আমি না চাই।’ দিবা রাত্রি এই ভাবে কাটায়ে দিতে পারলে, ভগবানের দয়াতে মায়া মোহ হ’তে ক্রমে ক্রমে রক্ষা পাওয়া যায়। তাঁর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হবার যো নাই, তাঁর বিন্দুমাত্র কৃপা হ’লে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্তই সম্ভব হয়।”

বসন্তকুমারীর দেহত্যাগের পর যোগজীবন ভাবিলেন, ‘এবার সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম ; এখন সর্বদা নিরুদ্ধেগে ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে থাকিতে পারিব।’ যোগজীবনের স্ত্রীর জন্ম সকলের বিষয়ভাব হইলেও যোগজীবনের বিন্দুমাত্র তাহা দেখিলাম না ; গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথায় বার্তায়, আর সংসার করিতে হইবে না বলিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর শৌচে বাইবার সময়ে, যোগজীবনকে সম্মুখে দেখিয়া হঠাৎ বলিলেন—“যোগজীবন, নিশ্চয় জেনে রাখিস, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও, বড় জোর সাময়িক একটা আনন্দের ঢেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারব্ধের ভোগ নষ্ট ক’রে দিতে পারেন না ; সে শুধু একজনাই হাতে।”

দিদিমা কয়েক দিন পরেই যোগজীবনের বিবাহের জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতারাও কেহ কেহ ঠাকুরের নিকটে এ বিষয়ে কথা তুলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—“আমি ওকে আর বিবাহ করিতে বলি না, তবে ওর তেমন ইচ্ছা হ’লে করবে ; বিবাহ আর করা ঠিক নয়।”

দিদিমা ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, গুরুভ্রাতা-ভগ্নীরাও অনেকে যোগজীবনের আর বিবাহ হইবে না, গুরুবংশ লোপ হইবে ভাবিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

কিন্তু আশা কেহ একেবারে ছাড়িলেন না, মনে করিলেন, ঠাকুর এখন নিষেধ করিলেন, আবার হয় ত কখনও বা বিবাহের অমুখ্যাত দিতেও পারেন।

ঠাকুরের এ সময়ে দৈনন্দিন কার্য্য।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিয়াছেন প্রচারিত হইলে সহর হইতে দলে দলে লোক আশ্রমে আসিতে লাগিল। সকাল বেলা ঠাকুরের কথাবার্তা বলিবার অবসর হয় না, ১১ই মাঘ, রবিবার।

সুতরাং বিকাল বেলাই লোকের ভিড় হইতেছে। ঠাকুর প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে আসন ত্যাগ করিয়া কুম্ভাভয় যান। শৌচান্তে আসনে না যাইয়া খড়ম পায়ে ও দণ্ড হাতে লইয়া আশ্রমের দক্ষিণ দিকে পা-চালি করিতে থাকেন। বৃক্ষ লতার নিকটে যাইয়া উহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কোন কোনটিকে কতই যেন স্নেহভাবে স্পর্শ করেন। চারা গাছের বৃদ্ধি এবং দূর হইতে লতার বৃক্ষাবলম্বনের কৌশল ও চেষ্টা দেখিয়া, আনন্দ করিতে থাকেন। উহাদেরও আপন আপন প্রয়োজন মত চলিবার জ্ঞান দৃষ্টিশক্তি আছে; সুখ দুঃখ অমুখ্যাত ও বিচারবুদ্ধি মনুষ্য অপেক্ষা কম নয়, তাহার প্রমাণ দেখাইতে থাকেন। সবুজ গাছে লাল ফুল, এক এক ফুলের নানা রং, শৃঙ্খলাবদ্ধ পাপড়ি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে ভাবে ডুবিয়া যান। বেড়াইবার ছলে মাঠাকুরের মন্দিরটিকে পরিক্রমা করিয়া, কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে ঘাসের উপরে যাইয়া দাঁড়ান; পুকুরের দক্ষিণপাড়ের ভয়ঙ্কর জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে চাহিয়া থাকেন। ঐ সময়ে মশার কামড়ে অস্থির হইয়াই যেন, ঠাকুর সজোরে পা তোলা ফেলা আরম্ভ করেন। পরে পাখীদের খাওয়ার কয়েক মুঠো চাউল দেওয়া হইলে, আপন আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় নিজ বাড়ী হইতে চা প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। এত কাল ঠাকুরকে নারিকেলের মালায় চা-সেবা করিতে দেখিয়াছি, এবার কুঞ্জ বাবু ঠাকুরের চা-সেবার জ্ঞান একটি এনামেলের বাটি লইয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর তাহাতেই চা-সেবা করিতেছেন। চা-সেবার পর কুঞ্জ বাবু চরিতামৃত পাঠ করেন। পরে ঠাকুর নিজেই 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ দেখিতে আরম্ভ করেন। অনেক সময়েই গ্রন্থ হাতে থাকে মাত্র, ঠাকুর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বেলা এগারটা পর্য্যন্ত কাটাওয়া দেন। এগারটার পর আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। মস্তকমাত্র বাদ দিয়া সর্বদা জলে ধুইয়া ফেলেন। পরে আসনে আসিয়া তিলক-সেবার পর ঔষধ সেবন করেন। আহাৰ প্রায় বারটার সময়ে হয়। আহাৰান্তে আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর ধুনি সম্মুখে রাখিয়া নির্ণিমেষ নয়নে একটানা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল পূর্বমুখে কোনও বৃক্ষের দিকে চাহিয়া থাকেন। ঠাকুরের শরীর নির্ঝাঁপ প্রদীপের ত্রায় স্থিরভাবেই থাকে; অবিরলধারে অক্ষবর্ণণে গাত্রের বস্ত্র ভিজিয়া যায়, চক্ষু দু'টি নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে। কখনও কখনও শরীরের বর্ণও অমুখ্যাকার

হইয়া যায়। আমি ঐ সময়ে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল মহাভারত পাঠ করিয়া নাম করিতে থাকি, এবং সময়ে সময়ে ঠাকুরের মৃগাবস্থায় শ্রীঅঙ্গের বিচিত্র রূপান্তর দেখিয়া, হুষ্ঠ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ি।

বিকালে সহরের লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করেন, আমি আহ্বানের চেষ্টায় চলিয়া যাই। সন্ধ্যার সময়ে প্রত্যহই খুব উল্লাসের সহিত হরিসঙ্গীর্জন হয়। সঙ্গীর্জন পূর্বের ঘরেই হইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে গুরুভাতারা স্ব স্ব আবাসে চলিয়া যান। ঠাকুর জলযোগ করিয়া নিজ আসনে বসিয়া থাকেন।

ঠাকুরের হাসি ও বগড়ার শাস্তি।

এবার গেল্লিয়াতে ভয়ঙ্কর শীত। ঠাকুরের ঘরের বেড়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে

১২ই মাঘ।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে। চারি পাঁচটি গুরুভাতা ঠাকুরের ঘরে রাত্রিতে থাকেন; তাঁহাদের ভাল শীতবস্ত্র নাই, ঠাকুর এজ্ঞা রাত্রিতে ধূনি রাখিতে

বলিয়াছেন। অর্থাভাববশতঃ আশ্রমে রান্নার কাঠই সব সময়ে থাকে না, ধূনির কাঠ আর কোথা হইতে জুটিবে? অধিক রাত্রিতে মহেন্দ্র বাবু, শ্রীধর প্রভৃতি গুরুভাতারা ধূনির কাঠের অল্পসন্ধানে আশ্রমসংলগ্ন গুরুভাতাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে থাকেন। সকলে একটু নিশুন্ধ হইলেই তাঁহারা অবিচারে কাহারও দরজার জগ্ন রক্ষিত চৌকাঠের কাঠ, কাহারও বা রান্নাঘরে লাগাইবার খুঁটি, কোন বাড়ীর মাচা প্রস্তুত করিবার ভাল তক্তা আনিয়া ধূনিতে চাপাইতে থাকেন। সকাল বেলা গৃহস্থের লক্ষ্য পড়িলেই উহা লইয়া বগড়া আরম্ভ হয়। আমি অতিকষ্টে রান্নার জগ্ন কিছু কাঠ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উহাদের ভয়ে গুরুভাতা বাধারমণ বাবু গোয়ালঘরে তাহা রাখিয়া দেই। রাত্রিতে অন্ধকার গোয়ালঘরে প্রবেশ করিলে গরুর গুঁতা খাইয়া উঁহারা ভাগিয়া পড়িবেন, আমার ইহাই মতলব। কিন্তু জ্ঞানি না গুরুভাতারা তাহাও কিরূপে কখন কৌশলক্রমে আনিয়া, আমার এক মাসের জ্বালানী কাঠ এক রাত্রিতেই সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। ভোরবেলা উঠিয়া প্রত্যহই কাঠ আছে কি না, একবার অল্পসন্ধান করি। আজ গোয়ালে ঢুকিয়া দেখি কাঠ নাই, আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। অমনই উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়া কাঠ সম্বন্ধে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ কেহ বলিলেন, “ঠাকুরের ধূনিতে তোমার কাঠ লাগিয়াছে, ইহা ত তোমার সৌভাগ্য! এজ্ঞা এত রাগ করছ কেন?” আমি বলিলাম, “ঠাকুরের ভাণ্ডার হতে রান্নার জগ্ন একটি দিন আমি একখানা কাঠ নিলে, দশ দিন আমাকে চোর বলিয়া প্রচার করা হয়, আর এ বেলা বুঝি চুরি হয় না?” ঠাকুর চুপ করিয়া স্থির ভাবে থাকিয়া আমাদের বগড়া শুনিতে লাগিলেন, পরে বগড়ার মাত্রা যখন খুব বৃদ্ধি হইয়া পড়িল, ক্রমে আরও অধিক গড়াইতে পারে এরূপ আশঙ্কা হইল, ঠাকুর তখন একবার আমাদের পানে তাকাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আশ্চর্য্য দেখিলাম—হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেরই ভিতরে শাস্তি আসিল, সকলেরই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং আনন্দের একটা ঢেউ সকলেরই প্রাণে উঠিয়া পড়িল।

শ্রীধরের বৈরাগ্যে বিষম উৎপাত ; ঠাকুরের উপদেশ ।

আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আমার আসন, এই ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীধর থাকেন। ঘরের অবশিষ্ট স্থানে ঢালা বিছানা করিয়া ১০ই মাঘ, মঙ্গলবার। অত্যাগ্ন গুরুভ্রাতারা রাত্রে শয়ন করেন। শ্রীধরের ও আমার আসনের মধ্যস্থানে দরজা। বসন্তকুমারীর দেহত্যাগের পর, শ্রীধরের মহা বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, এক এক দিন উহার এক এক প্রকার বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের ধাক্কা আমাদের প্রাণ অস্থির। একদিন শ্রীধর নিজ আসন গুটাইয়া সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ, সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ ভূমিতে ত্রস্ত হইয়া কোদালি মারিতে লাগিলেন। প্রায় ১ ফুট গর্ত করিয়া ঘরের মেজেতে মাটি স্তূপাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীধরের এই অবস্থায় কারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই! কি জানি, যদি কোদালিই ঘাড়ে বসাইয়া দেন! দিদিমা খবর পাইয়া অগ্নিমূর্তি হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীধরকে আনিয়া বলিলেন—“পাগল! এ কি করছ? মেজেতে গর্ত করে ঘরটিকে শেষ করলে! এ পাগলামী কেন?” শ্রীধর বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া খুব মনোযোগের সহিত ধমাম্ ঘরের মেজেতে কোদালি মারিতে লাগিলেন; দিদিমার কথা কোনও গ্রাহ্যই আনিলেন না। দিদিমাও খুব চীৎকার করিয়া ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীধর স্বর বিকৃত করিয়া দিদিমাকে বলিলেন, “যান যান, আপনি গিয়ে ভাণ্ডার দেখুন। ঘর শেষ করলে! ঘর শেষ করলে!! আমার যখন দফা শেষ হবে, তখন কি ভাণ্ডার দেখুন।” শ্রীধর এই বলিয়া, হাতের কোদাল বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং একটি কলসী লইয়া পুকুরের দিকে ছুটিলেন; পরে কলসী কলসী জল আনিয়া ঘরের মেজেতে মাটির উপর ঢালিতে লাগিলেন। জলে কাদায় সমস্তটি ঘর একাকার হইল। আমার আসনের ধারে জল আসিতেছে দেখিয়া, আমি আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলাম এবং খুব ধমক দিয়া শ্রীধরকে বলিলাম, “শ্রীধর! সাবধান! এক ফোঁটা জল আমার হোমকুণ্ডে পড়লে বা আসনে লাগলে, আজ তোমাকে খুনই করব।” শ্রীধর তখন বেগতিক দেখিয়া অমনই খুব ব্যস্ততার সহিত জলের ধারা অগ্নি দিকে টানিয়া লইয়া নরম স্বরে বলিলেন, “ভাই! আর একটু থাম না। তার পর খুন করলে আর দুঃখ নাই।” আমি বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিয়া রহিলাম। অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেহ অত্যাচার করলে তাকে শাসন করা কি অগ্নায়?”

ঠাকুর বলিলেন—“মানুষের সহিত ব্যবহার প্রকৃতি বুঝে করতে হয়। যদি কেহ নিজ প্রকৃতি মত চলাতে, কারও কিছু অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে, কিন্তু অগ্নের অনিষ্ট করা তার অভিপ্রায় না থাকে, তা হ'লে শান্তভাবে তাকে তা বুঝিয়ে দিতে হয়। যতটা সম্ভব তার ভাবে মিশে, তার পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হয়। আর যদি দেখা যায়, সত্য সত্যই কোন

প্রকার ছুরভিসন্ধিতে মতলব ক'রে, কেহ একটা অত্যাচার করছে, তা হ'লে তাকে শাসন করতে হয়। অনেক সময়ে সদভিপ্রায়ে মানুষ কাজ করে, অথচ তাতে কারও অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে; কিন্তু তাতে তাকে দোষী বলা যায় না। ভুল ভ্রান্তি ত লোকের হ'য়েই থাকে। সময় হ'লে সে নিজেই তা আবার বুঝতে পারে। সমস্ত কার্যেই খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হয়। ধৈর্য্যের অভাবেই ত যত বিরোধ।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, ‘বাঃ, এ মন্দ নয়! এক জনে কেবল অত্যাচার করুক, আর এক জনে কল্লনা করিয়া তার শুভ উদ্দেশ্য ভাবিয়া ঐ অত্যাচারে কেবল ধৈর্য্য ধ'রে থাকুক! এ উপদেশ মন্দ নয়! শ্রীধরের নাম উল্লেখ না করিলেও, ঠাকুর উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ সব উপদেশ আমাকে দিলেন বুঝিলাম; কিন্তু শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যে সকল উদ্বেগজনক কর্মকে সকলেই পাগলামী ভিন্ন কিছুই বলে না, তাহাতে ঠাকুর উহার কি শুভ উদ্দেশ্য দেখিলেন বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীধর সমস্ত দিন জলকান্দা ঘাটিয়া আসনপরিমিত গর্তের চতুর্দিকে উচ্চ বেদি প্রস্তুত করিলেন। পরে কতকগুলি তুলসী গাছ আনিয়া, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া উহার উপর গুতিলেন। তৎপরে গর্তের ভিতরে চাটাই বিছাইয়া তাহার উপর কঞ্চল আসন পাতিলেন। অনন্তর একটি একতারা লইয়া ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন—“শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।” শ্রীধরের ভজন শেষ না হইতেই, সহরের গুরুভাতারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় অর্ধেক ঘর শ্রীধরের পাগলামীতে জোড়া দেখিয়া সকলে বলিলেন, “এ কি শ্রীধর! এসব কি ক'রেছ?”

শ্রীধর খুব তেজের সহিত উত্তর করিলেন, “এ কি, দেখ'চো না, চো'ক নাই? তুলসীকানন।” গুরুভাতারা বলিলেন, “পাগল, কানন কি তোমার ঘরের ভিতরে? বাইরে গিয়ে তুলসীকাননে ভজন কর না?” শ্রীধর বলিলেন, “এত শীতে পাছে বাইরে যেতে হয়, সেই জন্তই ত এত করা। আমার দেহ ত্যাগ হ'লে, এই তুলসীকাননেই হবে; তোদের শীতে কোন কষ্টই হবে না; এই গর্তে আমাকে রেখে এই সব মাটি দিয়েই কবর দিস।” এই বলিয়া শ্রীধর হাতের একতারা রাখিয়া কঞ্চল-মুড়া দিলেন এবং লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শ্রীধর নীরব হইলে, গুরুভাতারা কেহ কেহ হরিধ্বনি দিয়া, ‘শ্রীধর মরিয়াছে’, বলিতে বলিতে চারিদিকের মাটি ঠেলিয়া উহার গায়ে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তখন শ্রীধর ধড়মুড়াইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলের সঙ্গে শ্রীধরেরও হাসি অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী চলিল। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ঠাকুরের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিলাম এবং শ্রীধরের পাগলামীতেও শুভ উদ্দেশ্য থাকে জানিয়া অবাক হইলাম।

শ্রীধর প্রকৃতিস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাই, এ পাগলামী কর'ছিলে কেন?”

শ্রীধর বলিলেন—“ভাই, ঠাকুর ব'লেছিলেন আমার শরীরে সন্ন্যাসরোগের বীজ প্রবেশ ক'রেছে,

স্বতরাং কোন্ মুহূর্তে আমি কি অবস্থায় মরব, কিছুই ত নিশ্চয় নাই! এই জ্ঞাত তুলসীকানন ক'রেছিলাম; তুলসীর নিকটে যদি মরি, তা হ'লেও ত একটা সদগতি হবে! তার পর এখন যে বিষয় শীত! যদি সম্ভাব্য সময়ে মরি, তা হ'লে যারা শ্রাশ্রানে নিয়ে যাবেন, তাঁদের কি কম কষ্ট! ইহা ভেবেই মাথায় খেল্লে, আমার দেহ নিয়ে পাছে কেহ উদ্বেগ ভোগ করে, তাই সে ব্যবস্থা এখনই করিতে হবে। অমনই অত পরিশ্রম ক'রে ঘরের ভিতরেই কবরের স্থান প্রস্তুত করেছিলাম।” শ্রীধরের মাথা ঠিক হইলে, নিজের পাং-গ্লাসী নিজেই ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন।

স্বপ্নে ফকিরদর্শন।

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, গেওয়ারিয়া-আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কঠোর সাধক তিনটি মুসলমান ফকির রহিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণকলেবর, গোরবর্ণ অতি ১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার। তেজস্বী বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন—“দেখ, এই আমি বসিলাম; যে পর্যন্ত না সিদ্ধ হইব, এই আসন হইতে উঠিব না, অনাহারে এই আসনেই কলেবর ত্যাগ করিব।” ফকির সাহেব এই বলিয়া বামপদের গুল্ফোপরি সোজা হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ পদ সম্মুখে বিস্তার পূর্বক, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠ আকর্ষণ পূর্বক, নাসাগ্রে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অপর দুইটি ফকির অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক; চেহারা কিঞ্চিৎ স্থূল, স্বভাব ধীর, বর্ণ দীঘল গৌর; পুরুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নিবিড় অরণ্যের ভিতরে, মাটির নীচে আসন করিয়া বসিলেন। কিছুদিন পরে উহাদের খবর লইতে আসিয়া পূর্বোক্ত ফকির সাহেবকে দেখি, তাঁর আর সে আকৃতি নাই, সর্বদ্বন্দ্ব বাতে ফুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ফাটিয়া রস গড়াইতেছে, উরু ও কোমরের স্থানে স্থানে পচিয়া মাংস খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। ফকির সাহেব অসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াও, আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন। অপর দু'টি ফকিরের কি অবস্থা ঘটিল জানিবার জ্ঞাত যেমন জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, পায়ে হাঁচটু লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। ফকিরদের তীব্র তপস্যার চিত্র ভাবিতে ভাবিতে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত হইল।

প্রত্যুষে ঠাকুর আর আর দিনের মত পায়চারি করিতে করিতে কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর দক্ষিণে, ইস্কু-ক্ষেতের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘাসের উপর যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্য যে স্থানে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎকাল দক্ষিণ মুখে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া থাকেন, ঠিক সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া হুঁচর বার পা তোলা ফেলা করিয়া নিদ্রা আসনঘরে চলিয়া আসিলেন। স্বপ্নযোগে যে স্থানে ফকির সাহেবকে দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানে ঠাকুর নিত্য যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তাই বিস্মিত হইয়া অবসর মত জিজ্ঞাসা করিলাম, “সকাল বেলা পুরুরের কোণে যে স্থানে আপনি যেয়ে দাঁড়ান, ঠিক সেইস্থানে একটি ফকিরের আসন রয়েছে স্বপ্নে দেখলাম, স্বপ্নটি কি সত্য?”

ঠাকুর বলিলেন—“স্বপ্নটি সমস্ত পরিষ্কার ক'রে বল না?”

আমি স্বপ্নবৃত্তান্ত আংগাগোড়া ঠাকুরকে বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—“স্বপ্নটি সত্য ; ফকির সাহেবের যথার্থ অবস্থাই দেখেছ। ইনিই কাল কৃষ্ণ-সর্পের দেহ আশ্রয় ক’রে আমার সাধনকুটীরে আসনের নীচে এসে রয়েছেন। আর পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যাঁদের দেখেছ, তাঁদের মধ্যেও একজন সর্প হ’য়ে আছেন— তাঁর বর্ণ হুধের মত সাদা, চক্ষু রক্তবর্ণ, অত্যন্ত উজ্জ্বল ; সময়ে সময়ে আমতলায় এসে থাকেন ; লক্ষ্য রাখলে দেখতে পাবে।”

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিবার পর আর একটি দিনও, ঠাকুরকে ঐ স্থানে ঘাইয়া দাঁড়াইয়া পা তোলা ফেলা করিতে দেখি নাই। ইহার ভিতরে যে কি রহস্য আছে জানি না! স্বপ্নটি শুনিয়া ঠাকুর আমাকে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। গেণ্ডারিয়া—আশ্রমটি এক সময়ে মুসলমান ফকিরদের নির্জন ভজনভূমি ছিল। বহু সিদ্ধ ফকিরের কবর এই আশ্রমে এবং আশ্রমসংলগ্ন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ত্রিযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে রহিয়াছে। বাড়ীর পূর্ব দিকে প্রকাণ্ড আমগাছের গোড়ায়, একটি মুসলমান মহাশ্মার কবর আছে। দয়া করিয়া তিনি সময়ে সময়ে মনোহরা দিদি (সতীশবাবুর মাতাকে) দর্শন দেন। ফকির সাহেবের তৃপ্তির জন্ত বা মর্যাদা রক্ষার্থে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঐ বৃক্ষমূলে ধূপ, ধুনা, প্রদীপাদি দেওয়া হয়।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ; ঠাকুরের উপদেশ।

আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাদের বাগড়া কোন্দল ও বহিস্কৃত ভাব দেখিয়া, আমি ভিতরে ভিতরে গম্বিত হইতে লাগিলাম। তাবিত্তে লাগিলাম—‘বাড়ী ঘরে নানাপ্রকার উদ্বেগ ১২শে মাঘ। অশান্তি ভুগিয়া ষাঠাদের দিনপাত করিতে হয়, তাঁহারা ইহা স্থখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্ত এখানে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। যথার্থ সাধন ভজন বা ঠাকুরের সঙ্গলাভ করা ইহাদের এখানে থাকিবার উদ্দেশ্য নয় ; তাই সামান্য সামান্য স্বার্থ লইয়া ইহারা বাগড়া বিবাদে সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের আকর্ষণে এবং ধর্ম্মলাভাকাজ্জায় মাত্র আমিই এখানে রহিয়াছি। অশ্রান্ত গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা ঠাকুরের আদেশ আমিই অধিক প্রতিপালন করিয়া চলিতেছি এবং ঠাকুরের সঙ্গও আমিই অধিক সময় করিতেছি।’ এই সব কারণে ঠাকুরের নিকট আর দশটি অপেক্ষা আমি বেশী আদরের হইয়াছি কি না বুঝিবার অভিপ্রায়ে, কৌশলক্রমে একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“সদগুরুর আশ্রয় লাভ করে, কেহ বা নিয়মনিষ্ঠা পূর্বক চলতেছে ; আবার কেহ বা উন্টা বাগে চলতেছে। কারও সামান্য দোষে গুরুতর শাসন, আবার কারও বা গুরুতর অপরাধেও উপেক্ষা প্রদর্শন, এরূপ কেন ?”

ঠাকুর বলিলেন—“মানুষের প্রকৃতি দেখে, অবস্থা বুঝে, তাকে চলতে দিতে হয় ও

চালাতে হয়। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, তিনটি লোক একই ঘরে আরে পড়লে, আরোগ্যের জন্য একমাত্র কুইনিন্ সকলের পক্ষে ব্যবস্থা করলে সব সময়ে চলে না। কারও কুইনিনে উপকার হ'তে পারে, আবার কারও বা মৃত্যুও হ'তে পারে। রোগ এক হ'লেও রোগের হেতু এবং রোগীর শরীরের অবস্থাাদি বুঝে, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। একই অবস্থা লাভ বা একই দোষ ত্যাগ করতে হ'লে, এক এক জনের এক এক ভাবে চলা আবশ্যক হ'তে পারে। যার যেটি, সে সেইটি নিয়ে থাকবে, অন্যের কিসে কি হ'চ্ছে তা দেখবার প্রয়োজন কি? আর দেখেই বা কি বুঝবে! আমার মত না চললে কারও কিছু হবে না মনে করা অত্যন্ত ভুল।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“সদগুরুর নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করলেই কি সকলের একই অবস্থা লাভ হবে?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তা হ'তেই হবে; কোন একটি ষ্টেশনের টিকেট ক'রে দশটি লোক গাড়ীতে চেপে বসলে, জেগে থাক বা ঘুমিয়ে থাক, ঝগড়াবিবাদ ক'রে, কি তাস-পাশা খেলেই চলুক, সকলকে একই স্থানে যেয়ে পৌঁছাতে হবে।”

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“তা হ'লে আর আদেশ বা নিয়মাদি প্রতিপালন করায় লাভ কি?”

ঠাকুর বলিলেন—“লাভ খুব আছে। যাবে সকলেই একই স্থানে, তবে কেউ পাক্ষিতে ব'সে, আবার কেউ বা পাক্ষি ঘাড়ে নিয়ে, পথের পার্থক্য এই মাত্র।”

ঠাকুরের প্রথম দু'টি প্রশ্নোত্তরে মনে মনে একটু দুঃখিত হইয়াছিলাম, এবার মনে বেশ ক্ষুণ্ণি আসিল; পাছে শ্রীমুখ হইতে আবার অগ্র প্রকার কিছু বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া ধীরে ধীরে আসন গুটাইয়া সরিয়া পড়িলাম।

অভিमाने दुर्दशा ; ঠাকুরের অনুশাসন।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি, আমার রাশিতে বিষম কুগ্রহ চাপিল। সেই সময় হইতে গুরুভ্রাতাদের

উপর তাচ্ছিল্য ভাব এবং তাহাদের কাৰ্য্যকলাপে দিন দিন দোষদৃষ্টি পড়িতে

২০শে—২৭শে মাঘ।

লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা ভাবিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়া

উঠিলাম। নীলকণ্ঠবেশ, মালা, তিলক, একাহার, পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি, নিত্য হোম, পাঠ ও ঠাকুরের সঙ্গে অধিকক্ষণ বাস ইত্যাদি বাহিরের অলুচানে আমার অতিরিক্ত নজর পড়িয়া গেল। সারা দিন আমি নাম করিয়া যে অপূৰ্ব আনন্দ সন্তোগ করিতাম, এ সময়ে ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। আহাৰ্য্যে রাতি ১১।১২টা পর্যন্ত নিদ্রা যাই, এই সময়ের মধ্যেও প্রায়

হুই একদিন অন্তরই স্বপ্নদোষ হইতে লাগিল। নামে অকচি ও মনে বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও নানাপ্রকার উপাধি উপস্থিত হইল। হস্ত, বাহু, মস্তকাদি যে সকল স্থানে রুদ্রাক্ষ আঁটিয়া ধারণ করি, সে সকল স্থানে জ্বালা অল্পভূত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ এই জ্বালা বৃদ্ধি পাওয়াতে লোম্হা-পোড়ার মত যন্ত্রণা সর্বদা ভোগ করিতে লাগিলাম; এবং সেই সকল স্থানে কোম্বার মত ছাল উঠিতে লাগিল। মাথাটি আগুন হইয়া গেল। ভিতরের অশান্তি ও শরীরের ক্লেশ অসহ্য হওয়াতে ঠাকুরের নিকট যাইয়া বলিলাম, “কয়েকদিনযাবৎ আমার সপ্তাহে তিন চার দিন করিয়া স্বপ্নদোষ হইতেছে, মনে সর্বদা বিরক্তি, শরীরেও বিষম জ্বালা দিনরাত ভুগিতেছি, এরূপ হৃদশা আমার হইল কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“হৃদশা আর হ’য়েছে কি? এখন থেকে খুব সাবধান হ’য়ে না চল্লে, আরও কত হৃদশায় পড়বে। ধর্ম্মটি তামাসার জিনিস নয়। সকলের পায়ের তলা দিয়ে ধর্ম্মের পথ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের পায়ের নীচ দিয়ে ধর্ম্মের সিঁড়িতে উঠতে হয়। মাথা উঁচু ক’রে কখনও ধর্ম্মলাভ হয় না। অভিমান বড়ই বিষম জিনিস। জটা, মালা, তিলকাদি ধর্ম্মের বেশভূষা ধারণ ক’রে, বিন্দুমাত্রও যদি প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, তনুহুর্ন্তেই তাহা ত্যাগ করিতে হয়। না হ’লে উহাই সর্প হ’য়ে দংশন করে। সর্বদা এ সব বিচার ক’রে চলতে হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে যে বস্তু ধারণ করা হয় না, এবং যাতে শুধু একটা প্রতিষ্ঠার লোভই বৃদ্ধি পায়, তা যাই হোক না কেন, কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করবে। আর যেটি তাঁর উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ’লেও তাতে অক্ষিপ করবে না। এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চলতে হয়। ধর্ম্মাভিমান বড়ই ভয়ানক। এত অনিষ্ট আর কিছুতেই হয় না। মদখোর, বেশ্যাসক্ত, নিতান্ত ছুরাচার ব্যক্তিও যদি নিজের ছুরবস্থা বুঝে, নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ জঘন্য মনে করে, সে একজন সদমুষ্ঠানী, চরিত্রবান্, ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অত্যাচার অপরাধের পার কিনারা আছে, কিন্তু ধর্ম্মাভিমানীর পার সহজে নাই। সাধন, ভজন, তপস্শা, কথা-বার্তা, বেশভূষা, যে কোনও বিষয়ে ধর্ম্মের অভিমান হয়, প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, বিষম রোগ মনে ক’রে, তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ করবে। শরীর মন ঠাণ্ডা হ’লে রুদ্রাক্ষ ধারণ সহ্য হবে না, গরম হ’য়ে যাবে। এখন যেয়ে রুদ্রাক্ষ মালা তুলে রাখ, শুধু তুলসীর মালা ধারণ কর।

আহারসম্বন্ধেও কোনপ্রকার অনিয়ম অত্যাচার করলে স্বপ্নদোষ হ’তে রক্ষা পাওয়া যায় না। অশুদ্ধ আহার একবার পেটে গিয়ে রক্তে পরিণত হ’লে, ক্রমে ক্রমে শরীরের সমস্ত রক্তই দূষিত করে। ঐ রক্ত যত কাল দেহে থাকে, নানাপ্রকার বিকার জন্মায়।

উহা একেবারে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত, নানা প্রকার উৎপাত ভোগ করতে হয়। এক প্রকার রসে এক এক প্রকার বিকারের উৎপত্তি করে। রস ত্যাগ না করলে, শরীরটি সহজে নির্মল হয় না। শরীর বিকারশূন্য না হ'লে ভজন সাধনও হয় না। বিগুহ সাত্ত্বিক আহার দ্বারাই শরীর শুদ্ধ হয়। আগে শরীরটাকে ঠিক ক'রে নেও। শরীর নিয়েই সব। শরীর ঠিক না হ'লে, কি দিয়ে কি করবে?"

ঠাকুরের অমুশাসন বাক্য শুনিয়া, আমি নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম, এবং সমস্ত রুদ্রাক্ষের মালা খুলিয়া রাখিলাম। আহাের পবিত্রতা ও মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্ত, ঠাকুরের প্রসাদ মিলাইয়া শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাইতে লাগিলাম।

প্রসাদের গুণ ও তাহাতে অবিশ্বাস।

গেওয়ারিয়ানিবাসী আমাদের প্রদ্বৈ গুরুভাতা শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ বক্সি মহাশয় প্রতিদিনই সন্ধ্যার

কিঞ্চিৎ পূর্বে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন; ঠাকুরের নিকট কিছুক্ষণ ২৮শে মাঘ, বুধবার।

নীরবে বসিয়া থাকিয়া, বাড়ি যাওয়ার সময়ে আমার নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া যান। ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও, প্রসাদে বক্সি দাদার অচল ভক্তি। দুইটি বা তিনটি অন্নপ্রসাদমাত্র তাঁহাকে গণিয়া দিয়া থাকি; অধিক দিতে চাহিলেও তিনি নেন না। প্রসাদ হাতে পড়া মাত্রই, তিনি থবু থবু কাঁপিতে থাকেন। আকিংখোরের মত তাঁর চোখ দুটি বুজিয়া আসে। তিনি ক্ষণমাত্রও না দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে বাড়ী চলিয়া যান। অবসরমত নিজ আসনে বসিয়া, ঐ প্রসাদ মুখে রাখিয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন, তিন চার ঘণ্টাকাল সমাধিস্থ থাকেন। আমাদের জেদে পড়িয়া কখনও তিনি দু'এক গ্রাস প্রসাদ পাইলে, দু'তিন দিনের জন্ত তাঁহার পাইখানা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে তিনি নেশাপোরের মত ঢুলু ঢুলু অবস্থায় দিন রাত কাটান। কথায় কথায় আজ তিনি বলিলেন 'প্রসাদ পাইলে এমনই একটা নেশা হয় যে, অল্প কোন দিকে মন টানিয়া আনিবার ক্ষমতা থাকে না; প্রসাদের গুণে মনটিকে নামেতেই নিবিষ্ট করিয়া রাখে, শরীরও অবসর হইয়া পড়ে।' বক্সি দাদার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইতেছি। ভাবিলাম, এই প্রসাদ ত গ্রাসে গ্রাসে প্রত্যহই খাইতেছি। আমার এরূপ হয় না কেন?

কিছু কাল হয়, রুদ্রাক্ষমালা ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহাতে মনের উৎসাহ উজ্জ্বল যেন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে; শরীরও পূর্বের মত নাই, নিশ্বেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ত এলোমেলো স্বপ্ন দেখা বন্ধ হইতেছে না! সকল প্রকার নিয়ম নিষ্ঠা করিয়াও যখন কোন ফল পাইলাম না, তখন বক্সি দাদার কথা মনে হইল। ভাবিলাম, শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রাখিয়া নিদ্রা যাইব। জাগ্রত অবস্থায় শরীর স্বভাবতঃই অস্থির এবং মন চঞ্চল থাকে বলিয়া, প্রসাদের অসাধারণ গুণ অহুভব হয়

না ; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় দেহ মন স্থির থাকে, সুতরাং আহারের বা সঙ্গের কোনও প্রকার দোষে, নিদ্রিতাবস্থায় যদি অকস্মাৎ বিকারের সম্ভাবনা হয়, মহাপ্রসাদ মুখে রাখিলে, তাহার গুণে অবশ্যই উহার শাস্তি হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া অতঃপর একগ্রাস প্রসাদ মুখে রাখিয়া নিদ্রিত হইলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—“ঠাকুর আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই ঠাকুরকে দেখিয়া আনন্দ উৎসাহ করিতে লাগিল। বহুবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের ভোগ রান্না হইল। ঠাকুর পরম পরিতোষে সেবা করিলেন। অত্যাশ্চর্য্য দিনের মত ভোজনের পাত্র হাতে নইয়া আমি সকলকে প্রসাদ বাটিতে লাগিলাম। আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ১৫১৬ বৎসরের যুবতী প্রসাদ পাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আমার হাতে প্রসাদ পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই ঐ পাত্র হইতে প্রসাদ তুলিয়া লইয়া খাইতে লাগিল। আমি তাহার হাতখানা বা হাতে আঁটিয়া ধরিয়া, অপর হাতে প্রসাদ তুলিয়া তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিলাম। মেয়েটি তখন হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল। তনুহুর্ন্তেই আমি জাগিয়া পড়িলাম। দেখিলাম স্বপ্নদোষ হইয়া গিয়াছে। মুখের সেই প্রসাদই খুব ব্যস্ততার সহিত চিবাইয়া খাইতেছি। অবশিষ্ট রাতি কান্দিয়া কাটাইলাম। ভাবিলাম—‘হায়, এ কি হইল? বহুকাল যাহাকে তুলিয়া গিয়াছি, মহাপ্রসাদের গুণে আজ নিদ্রিতাবস্থায় তাহার স্মৃতি জাগাইয়া আমার এই সর্বনাশ করিল! নির্জিত দোষকে পুনর্জীবিত করাই কি মহাপ্রসাদের গুণ? বোধ হয় অন্ধভক্তদের কল্পনারই একটা পরিণাম মাত্র।’

মধ্যাহ্নে মহাভারতপাঠান্তে অবসর পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—“স্বপ্নদোষ না হয় সেজন্ত শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রেখেছিলাম। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে একটি মেয়ের সহিত প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করে খাওয়াতে স্বপ্নদোষ হইল। মুখের প্রসাদ চিবাইতে চিবাইতে জাগিয়া পড়লাম। ঐ মেয়েটিকে ত আমি একমত ভুলে গিয়েছিলাম, তবে এমন হ’ল কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“তা বল্লে কি হয়? প্রকৃতিতে যা কিছু দোষ লুকায় আছে, তা সমস্তই ত ফুটে বের হবে। উহার প্রতি আসক্তি তোমার বহুকালই ত ছিল। কল্পনাতেও যখন কোন প্রকার কামভাব উহার প্রতি আনতে না পারবে, তখনই বুঝবে এই প্রবৃত্তি তোমার নষ্ট হ’য়ে গেছে। অষ্টপ্রকার মৈথুনই ত্যাগ করতে হবে। স্ত্রীলোকের স্পর্শে ক’রে যেমন উত্তেজনা হ’য়ে থাকে, উহাদের স্মরণে, দর্শনে এবং উহাদের সহিত আলাপাদি ক’রেও সেই রূপই হয়। সুতরাং বীৰ্য্যরক্ষা করতে হ’লে, ইহার একটিও অবহেলা করলে চলবে না। একটা বিষয়ে চেষ্টা করতে হ’লে, ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা ক’রে লেগে যেতে হয়। না হ’লে কিছুই হবার যো নাই। মাটির দিকে মাথা হেঁট ক’রে রেখে, আড়ে আড়ে এদিক্ সেদিক্ তাকালে ব্রতরক্ষা হয় না ; বরং চোরের মত কপট ব্যবহারই করা হয়। কোন প্রকার অসৎ কল্পনা মনে এলে, চীৎকার ক’রে গান ক’রো অথবা পাঠ ক’রো।

আমি যে পাত্রে রান্না করি সেই পাত্রেই আহার করিয়া থাকি, অনেক সময় কলাপাতা সংগ্রহ করিতে পারি না, এজন্য বড়ই অসুবিধা বোধ হয়। আজ একটি গুরুভ্রাতা আমাকে একখানা এনামেলের ডিস্ আনিয়া দিয়া বলিলেন, 'ইহাতে তুমি আহার করিও, মাজিতে কোনও কষ্ট হইবে না।' আমি ঐখানা ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এই পাত্রে আমি আহার ক'রিতে পারি?'

ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন—“রাম ! রাম !! ওতে কি খেতে আছে ? ওসব স্পর্শও করতে নাই। আমি কয়দিন ওতে চা খেয়েছিলাম, এখন আবার আমার নারকেলের মালাতেই চা খাচ্ছি। ঐ পাত্র শুদ্ধ নয়।”

আমি ডিস্খানা লইয়া যিনি দিয়াছিলেন তাঁহাকেই দিয়া দিলাম।

ফাল্গুন ।

গেণ্ডারিয়ার সিদ্ধ ফকিরদের আশ্চর্য্য কথা ।

মাঘ মাসটি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু গেণ্ডারিয়ায় শীত কিছুই কমিতেছে না । রাত্রিতে দু'এক ঘণ্টা আসনে বসিলেই শীতে খেন শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলে ; ধুনি না জ্বালাইয়া রাখিলে, হবিবার । জালিয়া স্থির থাকিতে পারি না । প্রত্যহই আমি ধুনির কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখি । ফাল্গুন মাস পড়িতেই একদিন আমার ধুনির কাঠ সংগ্রহ ছিল না ; নিজাভঙ্গ হইতেই বাহিরে যাইয়া ধুনির কাঠ আনিবার সঙ্কল্প করিয়া যেমনই আসন হইতে উঠিলাম, তন্মুহূর্ত্তেই ঠাকুর আমাকে পূবেরঘরে নিজ আসনে থাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন—
“ওহে, এখন বাইরে যেও না, একটু অপেক্ষা কর ; বাঘে চ'ড়ে ফকির সাহেব আসছেন, এখনই চ'লে যাবেন ।”

আমি ঠাকুরের কথা শুনিয়া অমনই আসনে বসিয়া পড়িলাম । ভাবিলাম, ‘মানুষ কি কখনও বাঘে চ'ড়ে চলতে পারে ! পাছে ফকির সাহেব আমাকে দেখিয়া আশ্রমে না আসিয়াই চলিয়া যান, সেইজন্যই বুঝি ঠাকুর আমাকে বাঘের কথা বলিয়া, এ সময়ে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন ।’ সকাল বেলা উঠিয়া দেখিলাম, আমতলায় ও আশ্রমের দক্ষিণ দিকের উঠানে স্থানে স্থানে পরিষ্কার বাঘের পায়ের চিহ্ন রহিয়াছে । অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘ফকিরের সঙ্গে বাঘ কেন ?’

ঠাকুর বলিলেন—“অনেক ফকির তান্ত্রিক সাধনের কোনও প্রণালী ধ'রে সাধন ভজন করেন । ইহারা শক্তির উপাসক । সাপ বাঘ সঙ্গে রাখা ইহাদের প্রয়োজন হয় ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—রাত্রিতে ফকির সাহেব আসেন কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—“দেখা করুতে ।”

আমি বলিলাম—আপনি ত আসন ছেড়ে উঠেন না । দেখা হয় কি প্রকারে ?

ঠাকুর বলিলেন—“তা হয় ।”

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব ফকিরদের কি আমরা রাত্রিতে বাইরে থাকলে দেখতে পারি ?

ঠাকুর বলিলেন—“তারা দয়া ক'রে দর্শন দিলেই পার ।”

আজ মহাভারতপাঠের পর বেলা আড়াইটার সময়ে, একটি দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ মুসলমান ফকির আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ফকির সাহেব আসা মাত্রেই, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন । ফকির সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে, কিন্তু

তাঁহার কথায় বার্তায় যাহা বুঝিলাম, তাহাতে অস্বস্তি হয় অনেক বেশী। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গেলারিয়ার নিবিড় জঙ্গলে থাকিয়া, সাধন ভজন করিতেছেন। ধর্মসম্বন্ধে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ঠারে ঠোরে সাম্প্রতিক ভাষায় যে সব আলাপ করিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কথায় কথায় ফকির সাহেব বলিলেন—‘বহু কাল আমি জাহাজে চাকরি করিয়াছিলাম। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করাই মাত্র আমাদের কাজ ছিল। একবার ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ সমুদ্রে আমরা যাইতে যাইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা একটি দেশ দেখিতে পাইলাম, দেশটি খুব বড় বলিয়াই মনে হইল। ক্রমশঃ আমরা সেই দিকে জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন দূর হইতে একখানা জাহাজ আমাদের দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া, আর আগে যাইতে নিষেধ করিল। পরে ঐ জাহাজখানার সহিত মিলিয়া আমরা আরও কিছু দূর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বহুস্থানব্যাপী বিস্তৃত ঘূর্ণীজলরাশি ভয়ঙ্কর শ্রোতে সাঁ সাঁ শব্দে চলিয়া একটা কেন্দ্রস্থানে যাইয়া পড়িতেছে। ঐ শ্রোতে একবার জাহাজ পড়িলে, কোনও উপায়েই উহা আর রক্ষা করা যাইবে না। ঐ জাহাজের লোকের মুখে শুনিলাম, ঐ শ্রোতে পড়িয়া কয়েকখানা জাহাজ ডুবিয়াও গিয়াছে। বোধ হয় সমুদ্রের ভিতরে এমন কোন বস্তু আছে, যাহাতে জাহাজ আকর্ষণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলে, অথবা জলেরই এমন গুণ যে, তাহাতে কিছু ভাসিতে পারে না। ঐ পাকজলের বাহিরে থাকিয়া কয়েক দিন আমরা ঘুরাঘুরি করিলাম। তিথি বিশেষে ঐ আবর্তজলের কেন্দ্রস্থানে সোনার মত রং, অতি উজ্জল খুব বড় একটা জ্বালার মত, কি যেন দেখা যায়, আবার ডুবিয়া যায়। উহা যে কি, দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঘূর্ণীজলের সীমা অতিক্রম করিয়া ঐ দেশে পঁছছিবার কোন সুবিধাই আমরা পাইলাম না।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—রামায়ণে যে লঙ্কার কথা আছে, এই দেশই কি সেই লঙ্কা ?

ঠাকুর বলিলেন—“তা হ’তে পারে। এখন যাকে লঙ্কা বলে, সেই সিলোন, লঙ্কা নয়। সমুদ্রপথে জাহাজাদিতে ক’রে লঙ্কায় যাওয়া অসম্ভব। শূণ্যপথেও নাকি মহাজে যাওয়া যায় না। জল টেনে নেয়, এরূপ শুনা আছে। লঙ্কার চতুর্দিকে ঘূর্ণী জলের বিবরণও পাওয়া যায়। লঙ্কা বহু দূরে।”

ফকির সাহেব বলিলেন—‘আর এক বার আমরা উত্তর মহাসাগরে গিয়াছিলাম, সেখানেও আমরা উত্তর দিকে যাইতে যাইতে বহু বিস্তৃত এক দেশ দেখিতে পাইলাম। বরফ কাটিয়া আমাদের জাহাজ বেশী দূর যাইতে পারিল না। আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে কিছু খাবার লইয়া, একখানা ক্রতগামী কলের গাড়িতে ঐ দেশের দিকে বরফের উপর দিয়া চলিলাম। ক্রমে আমরা সেই দেশের দক্ষিণ প্রান্তে পঁছছিলাম। দেখিলাম সেখানেও মানুষ আছে, তাহাদের আকৃতি সমস্তই

আমাদের মত, কিন্তু মুখটি ঠিক ঘোড়ার মত। তাহারা অতি সুন্দর গান করে। স্বর বড়ই মধুর। অন্তরে তাদের বড়ই দয়া—ব্যবহারে বুঝিলাম।’

ঠাকুর বলিলেন—“ঐ দেশকে কিম্পুরুষবর্ষ বলে। হয়মুখ নর ঐ দেশে বাস করেন, পুরাণাদিতে একরূপ বর্ণনা আছে। তাঁহারা অসভ্য নর, খুব ভদ্র।”

রমণার বুড়োশিবের কৃপা। ঠাকুরের পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা।

ঢাকা সহরের উত্তর দিকে পুরান রমণার অধিকাংশ স্থানই ভয়ঙ্কর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ জঙ্গলে একাকী দিনের বেলাও, কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস পায় ৬ই কানুন, বুধবার। না। বহুকালের পুরান বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, উহার ভিতরে স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটি মন্দিরে পঁহুছিলাম। মন্দিরে দুই তিন জন নানকশাহী সন্ন্যাসী আছেন। শুনিলাম প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে, গুরু নানক যখন ঢাকা আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁর এই পদচিহ্ন রহিয়াছে। সাধুরা ঐ নির্জন অরণ্যে থাকিয়া এই পদচিহ্নের সেবা পূজা করিতেছেন। আমাদেরিগকে তাঁহ রা খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং ‘কড়া প্রসাদ’ দিলেন।

ঠাকুর ওখান হইতে বাহির হইয়া রাস্তার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বনের ভিতরে বুড়োশিবের মন্দিরে আমাদেরিগকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বুড়োশিবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মন্দিরের সম্মুখে বহু কালের প্রাচীন বটগাছের তলায় বসিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতারাও সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ দু’তিন সেকেণ্ডের ভিতরে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটয়া গেল। ভগবান্ মহেশ্বরের অপরিসীম রূপার বিশ্বয়জনক নিদর্শন পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকে একেবারে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ ‘এ কি হইল’ বলিয়া উর্দ্ধদিকে চঞ্চলদৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। আমরা ঘটনাটি স্মরণ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বেলা অবসানে গেগারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—যে স্থানে কোনও কালে যাই নাই, যাহা কখনও দেখি নাই সেরূপ কোন কোন স্থানে যেয়েও মনে হয়, যেন পূর্বে কখনও সেই স্থান দেখেছি। একরূপ হয় কেন ?

উত্তর—“পূর্বজন্মে যে সকল স্থানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, সেখানে উপস্থিত হ’লে কারও কারও উহা পরিচিত ব’লে মনে হয়।”

এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহার পূর্বজন্মস্মৃতির বিষয় বলিতে লাগিলেন—

ঠাকুর বলিলেন—“গয়াতে যখন আমি ছিলাম, এক দিন বেড়াতে বেড়াতে ফল্গুর অপর পারে রামগয়ায় উপস্থিত হ’লাম। সেখানে একটি মন্দিরে নৃসিংহদেব দর্শন ক’রে

তখনই আমার মনে পড়ল, যেন পূর্বের কখনও আমি এই মূর্তি দেখেছি। তার পরেই আমার ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা স্মরণ হ'তে লাগল। ঐ স্থানে ফক্সের পারে পুরান বান্ধান ঘাটের উপরে একটি অশ্বখ গাছ আছে, সেই গাছের পশ্চিম দিকের একখানা ডালাতে ছুরি দিয়ে “ওঁ রামঃ” এই নামটি বড় ক'রে কেটে লিখে রেখেছিলাম। তাও আমার মনে হ'ল। অমনই আমি উঠে সেই গাছটির কাছে উপস্থিত হ'লাম, দেখলাম আমার সেই লেখা ঐ ডালাতে রয়েছে। তবে ডালার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলি অনেকটা তফাৎ তফাৎ হ'য়ে পড়েছে। তারপরে রামগয়ায় যেখানে থেকে, সাধন ভজন করেছিলাম এবং সে সময়ে আমার সঙ্গে যে ছা'টি পরমহংস ছিলেন, সে সমস্তই আমার মনে হ'ল। ক্রমে অনেক কথাই মনে পড়ল। আমি পাহাড়ের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে, সেই সমস্ত স্থানও চিহ্ন দেখে অবাক হ'লাম। পূর্ববঙ্গের সমস্ত স্মৃতিই সেই দিন সেই মুহূর্তে জেগে উঠল।

বহুতীর্থ দর্শন ও বহুস্থান পর্যটন করতে করতে, কেহ পূর্ববঙ্গের সাধন ভজনের বা বিশেষ সম্বন্ধের একটা স্থানে উপস্থিত হ'লে, অকস্মাৎ তাঁর পূর্বভাব বা স্মৃতি, মুহূর্তমধ্যে উদয় হ'তে পারে। বহু সাধন ভজনেও এটি সহজে হয় না। কোন্ স্থানের সহিত, কোন্ তীর্থের সহিত, কোন্ বিগ্রহের সহিত, কার জীবনের কি সম্বন্ধ আছে বলা যায় না। সমস্ত যোগাযোগ হ'লে কারও কারও ভাগ্যে তাহা প্রকাশ হয়। সকলেরই যে হবে এমনও নয়।”

প্রশ্ন—নোংরা অপরিষ্কার একটা স্থানেতে উপস্থিত হ'লেও অনেক সময়ে দেখা যায়, মন সেখানে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে, চিত্ত যেন আপনা আপনি জমাট হ'য়ে পড়ে। আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানের বাগানবাড়ীতে গিয়েও, যেন মন বিরক্তিপূর্ণ হ'য়ে যায়, চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এর কারণ কি ?

উত্তর—“বিশেষ বিশেষ ভাবে, যে যে স্থানে, যে যে কার্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে সে সকলের একটা ভাব ঐ সকল স্থানে জমাট হয়ে থাকে। ওখানে উপস্থিত হ'লেই, সেই সকল ভাবে চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত যত নির্মল হয়, ততই এসকল অনুভবে আসে, নচেৎ হয় না। ভজন-সাধন, তপস্যা, দেবদেবীর অধিষ্ঠান, মহাপুরুষদের বাস বা পরলোকগত পুণ্যাস্থানের অবস্থান যে সকল স্থানে হয়, সহস্র বৎসর পরেও সেখানে উপস্থিত হ'লে, সেই সকল ভাবে চিত্তকে অভিভূত করে। সে প্রকার আবার যে সব স্থানে বিষম অত্যাচার, অনাচার, হুকার্যাদির অনুষ্ঠান হয়, বহুকাল পরে সেখানে গেলেও, সে সকল ভাব চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত নির্মল হ'লেই স্থানের প্রভাব বুঝতে পারা যায়।”

আদেশপালনে অসমর্থতা ; ঠাকুরের সহানুভূতি ও উপদেশ ।

স্বভাবে যে সকল দোষ বহুকালধাবৎ রহিয়াছে এবং যাহা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া, এত কাল একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম—‘এসব দোষ ৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার। ছাড়াইতে আর চেষ্টা করিতে হইবে কেন, ইচ্ছামাত্রই ত ত্যাগ করা যায়,’ এখন তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিতেছি, একটিও ছাড়াইতে পারিতেছি না। মূল অল্পসম্মান করিতে গিয়া দেখি, এ সকল দোষের শিকড় স্বভাবের এত নিভৃত স্তরে ঘাইয়া ঢুকিয়াছে যে, তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। স্বভাবের সেই বিন্দুমাত্র দোষকেই, এখন যেন অপার সিদ্ধ মনে হইতেছে। নিজের দুর্বলতা বুঝিয়া হতাশ হইয়া ঠাকুরকে ঘাইয়া বলিলাম—‘সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া স্বভাবের একটি দোষও তাড়াইতে পারিলাম না। এখন কি করিব?’

ঠাকুর খুব মেহভাবে সহানুভূতি করিয়া বলিলেন—“স্বভাবের দোষ কি কেহ ইচ্ছামাত্রেরই ত্যাগ করতে পারে? নিষেধ বর্জন আর বিধির অনুষ্ঠান—ইহার মধ্যে নিষেধ বর্জন অপেক্ষা বিধির অনুষ্ঠানই সহজ। বিধির অনুষ্ঠান কর্তে কর্তে নিষিদ্ধ বিষয়গুলি আপনি আপনি ধীরে ধীরে ত্যাগ হ’য়ে আসে। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক’রে চলতে চেষ্টা কর, দোষ সমস্ত আপনিই যাবে।”

আমি বলিলাম—‘যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ক’রে চলতে বলেছেন, তাহা ত ঠিকমত পারছি না।’

ঠাকুর বলিলেন—“চেষ্টা ক’রে যাও। পার না পার, সে দিকে লক্ষ্য রেখো না। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা কি সহজেই লোকে করতে পারে? এজন্য বার বৎসর সময় দিয়েছেন। বার বৎসরের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হ’য়ে আসে। ছ’চার বারের চেষ্টায় ফল না পেলো, হাত পা ছেড়ে দিতে নাই; যতদিনে ঠিক না হয়, ততদিনই চেষ্টা রাখতে হয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ও নিষেধ বর্জন কর্তে বলে দিয়েছেন, তা না পারলে কি আপনি অপরাধ গ্রহণ করেন?’

ঠাকুর বলিলেন—“কিছু না। আমি ত কতই বলুব, সবই কি আর একেবারে ঠিক মত করতে পারবে? তা হ’লে ত সিদ্ধই হ’লে। যতটা পার ক’রে যাও। চেষ্টা ক’রেও যদি না পার, কোন অপরাধই হবে না। ইচ্ছা ক’রে একটা অনিয়ম না করলেই হ’ল। হঠাৎ যা হ’য়ে পড়ে, তা নিজে করলে মনে কর কেন? নিজে করলাম ভাবলেই ত

অপরাধ সমস্তই ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। তিনিই সব করছেন, তিনিই সমস্ত করায় নিচ্ছেন—এটি বুঝলেই শান্তি।”

আমি বলিলাম—একটা দৃশ্যীয় কার্য না করবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করেও, যখন পরাস্ত হ’য়ে করে ফেলি, তখনও ত অহুতাপ হয়; মনে হয়, ‘বুঝি আরও চেষ্টা করলে উহা না করে পারতাম।’

ঠাকুর বলিলেন—“যথার্থ পাপ পুণ্য, ধর্ম অধর্ম, আমরা কিছুই ত বুঝি না। ছোটবেলা হ’তে দেখে শুনে একটা ভাল মন্দের সংস্কার মাত্র দাঁড়ায়ে গেছে। বাস্তবিক তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। লোকের লজ্জায়, লোকের ভয়ে, আমরা কতকগুলি কার্য্য করি না; মনে করি—পাপ। যথার্থই উহা পাপ কি না, ঠিক বলা যায় না। পাপ পুণ্য সকলেরই একটা একটা স্বরূপ আছে, সেটি দর্শন হ’লেই পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে ঠিক বুঝতে পারে। কোনও কর্য্যে পাপ বোধ হ’লে তাকি সে আবার করতে পারে? এখন যাহা পাপ পুণ্য মনে করছ, সমস্তই একটা সংস্কার মাত্র।”

বারদি নিবাসী জমিদার ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বর্তমান খ্যাতনামা প্রিন্সিপ্যাল আমাদের শ্রদ্ধাঙ্গদ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় কোনও সময়ে নানা কথাপ্রসঙ্গে একদিন “ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—“আমরা প্রত্যহ রাশি রাশি অপরাধ করিয়া থাকি, তার সঙ্গে আরও একটি গুরুতর অপরাধের যোগ করিয়া যেন আপনি আমাদেরকে আরও বিপন্ন করিলেন।”

ঠাকুর বলিলেন—“কেন?”

উত্তর—আপনি যে সকল বিধি নিষেধ বিধান করিয়াছেন, তাহা পালন করা হুঙ্কর। আমাদের অপর অপরাধের উপর, গুরুনির্দেশ লঙ্ঘন নামে আরও গুরুতর অপরাধের যোগ করিয়াছেন।

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত বলিলেন—“তুমি এ সম্বন্ধে কি ভেবেছ?”

কুঞ্জ বাবু বলিলেন—আমি মনে মনে একটা সম্বন্দ করিয়া লইয়াছি, তাহা ঠিক কি না, আপনি জানেন।

ঠাকুর বলিলেন—“কি সম্বন্দ?”

উত্তর—আপনার বিধি নিষেধ আপাততঃ সহজ বোধ হইলেও তাহা অতি কঠিন। একটা দিনও যদি তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারি, তবে ত জীবমুক্ত হইয়া যাই। আপনি এরূপ আশাও ইচ্ছা করেন না যে, একদিনে আমরা তাহা পালন করিতে সমর্থ হইব। কতকগুলি উচ্চলক্ষ্য আমাদের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। তাহার দিকে চাহিয়া সাবধান ও সচেতনভাবে চলিলে ক্রমে আমরা সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হইয়া ধন্য হইব, ইহাই আপনার অভিপ্রায়। তাহা না হইলে, আমাদের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের পথ প্রস্তুত হইয়াছে মনে করিতে হয়।”

ঠাকুর বলিলেন—“ঠিক, ঠিক তাই ত ঠিক।”

সাধুর প্রতি অনাদরে ও উৎপীড়নে বিপত্তি ।

১০ই ফাল্গুন, রবিবার । আজ অপরাহ্নে সহর হইতে অনেক লোক আসিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন । ধর্মবিষয়ে নানা প্রকার আলাপ আলোচনা হইতে লাগিল ।

একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে বলিলেন—ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী আছেন স্মৃতিতে পাই, তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন না কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—“এ সম্বন্ধে আমি কোন কোন জমাতের মহাস্তুদের জিজ্ঞাসা ক’রেছিলাম, তাঁরা বললেন, ‘বাঙ্গলা দেশে তাঁদের আদর যত্ন নাই, থাকবারও স্থান নাই । এদিকে এলে আহার ও বাসের অসুবিধাতেই তাঁদের ভোগে পড়তে হয় । ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই সাধুদের থাকবার বড় বড় ধর্মশালা, সত্রাদি আছে ; যত কাল ইচ্ছা সাধুরা তাতে আরামে থাকতে পারেন । স্থানীয় জমিদার, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি ধনী লোকেরা তাঁদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে সেবা করেন । বাঙ্গলা দেশে সে প্রকার স্থানও নাই, আর তাঁদের সেবা করে এমন লোকও নাই । বরং গুণ্ডা, চোর বদ্‌মাইস মনে ক’রে, বাঙ্গালীরা তাঁদের অবজ্ঞাই করে ।”

একজন বলিলেন—পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলোকেরা খাবার না পাইলে, গায়ে ভস্ম মেখে, লেটী প’রে, সাধু হয় । অনেক গুণ্ডা বদ্‌মাইসেরাও সাধুর বেশে ঘুরে । স্রবিধা পাইলে তারা সর্বত্রই চুরি ডাকাতিও করে । ভাল সাধুরা একটু পরিচয় দিলেই ত পারেন ।

উত্তর—“পরিচয় নিতে জান্‌লে তাঁরাও পরিচয় দেন । অনেকে সাধুদের পরখ্ করতে গিয়ে বিপন্নও হ’য়ে পড়েন ।”

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুদিন পূর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন । যথা—“একবার গঙ্গাসাগরের পথে একদল সাধু রামপুরহাটে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । রাস্তার ধারে অনাবৃত মাঠে তাঁহারা ধুনি জালিয়া দিনরাত থাকিতেন । স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অপরাহ্নে তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিতেন । একটি বাঙ্গালী বাবু—উকিল, প্রত্যহই আসিয়া সাধুদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে তিনি সাধুদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন । স্থূল শরীর দেখিলে, তিনি কোনও সাধুর পেটে লাঠি দিয়া খোঁচা মারিয়া বলিতেন, ‘আরে তোম্ তো হালুয়া মালপোয়াকা সিধ্ হো, ক্যাত্না খাতা ছায়’ ; কোন সাধুর জটাটি ঝাঁকরাইয়া বলিতেন, ‘চোরাই মাল ক্যাত্না ইসমে রাখা ছায় ? রাত্‌মে চুরি কর্তা ছায়, আউর দিন মে সাধু বন্‌কে বৈঠা ছায় ।’ সাধুরা ঐ বাঙ্গালী বাবুকে দেখিলেই ভয়ে জড়সড় হইতেন । জমাতের ভিতরে একটি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি মহাস্তুকে বলিলেন, ‘মহারাজ, বাঙ্গালী বাবু নিত্‌ আয়কে বড়া অপরাধ কর্‌কে যাতা ছায়, উস্কা জেরা রূপা

কীজিয়ে!’ মহাস্ত বলিলেন, ‘বাঙ্গালীলোক সাধুকো নেহি মান্তা হয়।’ একদিন ঐ বাবু আসিয়া মহাস্তকে বলিলেন, ‘এই সাধু! তোমু গাঁজামে তো খুব দমু মার্তা হয়, ইসমে তো খুব কেরামত। আউর কুহ্ কেরামৎ দেখ্‌লানে সেক্তা হয়?’ এই সময়ে এই সিদ্ধপুরুষটি উকীল বাবুকে ডাকিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন, ‘আরে বাঙ্গালী বাবু, ক্যা বল্তা হয়? সাধুকা আউর কুহ্ কেরামৎ দেখোগে। ভাল, লেড়্‌কা বালা লেকে ঘর কর্তা হয় তো, আচ্ছা চলা যাও ঘর, আব্‌ যাংকে সাধুকা কেরামৎ দেখো।’ সাধুর কথা শুনিয়া উকিল বাবু চমকিয়া গেলেন, মুখ তাঁর শুকাইয়া গেল; তিনি ক্রতপদে বাড়ীর দিকে চলিলেন; রাস্তায় দেখিলেন, তাঁর চাকরটি ছুটিয়া আসিতেছে। বাবুকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, ‘বাবু, আপনার ছেলেকে সাপে কাটিয়াছে।’ বাবু বাড়ী যাইয়া ছেলের মুখ্‌ অবস্থা দেখিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন; তখনই ওকা, বৈজ, ডাক্তারাদি আনাইয়া যত প্রকার চেষ্টা করিবার করিলেন, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। তখন সাধুর ইচ্ছাতেই এই প্রকার ঘটিয়াছে বুঝিয়া, সন্দ্বীক তিনি ঐ সাধুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক কান্নাকাটি করিয়া সাধুর পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন। সাধু বলিলেন—‘আব্‌ কাহে আয়া, সাধুকা কেরামৎ দেখো না? আউর তিন রোজ বাদ আয় যাও।’ সাধুর কথায় আশ্বাস পাইয়া উকিল বাবু ছেলেটিকে একটি ঘরে রাখিয়া দিলেন, তাহার শরীর ফুলিয়া গেল; তিন দিন পরে তিনি সাধুর পায়ে পড়িয়া ঔষধ চাহিলে, সাধু ধুনি হইতে কিছু ভস্ম লইয়া বাবুটির হাতে দিয়া বলিলেন, ‘আপ্না হাত্‌সে শওযলা পানি লেকে, লেড়্‌কা কা শিরপর ঢাল দেও, আউর এহি ভস্ম আচ্ছা করুকে উস্‌কা শরীরমে মন্‌ দেও; আধা ঘণ্টা বাদ লেড়্‌কা আচ্ছা হো যায়েগা।’ সাধু এই বলিয়া তখনই জমাত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বাবুটি ঐ প্রকার করিতে ছেলেটি সুস্থ হইয়া উঠিল। সকলে অবাক্‌। বাবুটি পরে সাধুকে ঢের খুঁজিলেন, কিন্তু আর পাইলেন না।”

স্বপ্ন—কর্মের উপদেশ।

ঠাকুর আমাকে কিছুকালযাবৎ আশ্রমস্থ লকলের সেবা ও বাহিরের কাজকর্ম করিতে বলিতেছেন। সকাল বেলা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার নিয়মিত কার্য্য ১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার। করিয়া প্রায় অবসর পাই না, সময়ে সময়ে নাম করিতে বিরক্তি বোধ হইলেও, বাহিরের কোন কাজকর্মে বা কাহারও সেবা করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি ঐ সময়ে কোন একটি প্রশ্ন তুলিয়া ঠাকুরেরই সঙ্গে গল্প করি। গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম,—একটি মহাত্মা আমাকে আসিয়া বলিলেন, ‘গুরু যেমন বলেছেন, ঠিক সেই মত ক’রে যাও, ওতে কখনও নিরুৎসাহ হ’য়ো না। কর্মটি ত্যাগ কর্তে নাই। যত কাল না বিদ্বন্মুখ সন্তোষ লাভ হয়, ততকালই কর্ম করিতে হবে; রজস্তুমোগুণ যত কাল আছে, কর্ম না ক’রে নিস্তার নাই। আলস্য ক’রে কর্ম না করলে, পরে ভুগ্তে হবে। বৈধ কর্ম দ্বারাই রজস্তুমোগুণ নষ্ট হ’য়ে যায়।’ স্বপ্নের কথা ঠাকুরকে বলাতে,

ঠাকুর বলিলেন—“সময় দীর্ঘ বোধ হ’লে বা নাম করতে বিরক্তি জন্মালে, ব’সে থাকতে নাই, বাহিরের কাজই করতে হয়। ঐ সময় জোর ক’রে নাম করতে গেলে, নামে আরও শক্ততা আসে। তাতে অনিষ্ট হয়।”

আমি বলিলাম—আমার মনে হয়, বাহিরের কাজকর্ম করা অপেক্ষা, ঐ সময়ে জোর ক’রে নাম বা পাঠ করাতেই বেশী উপকার হয়।

ঠাকুর বলিলেন—“সে কিছু নয়। বাহিরের কাজকর্ম করা আর নাম করা, আমি কিন্তু সমানই মনে করি। সমস্তই ত কর্ম। লক্ষ্যটি স্থির থাকলেই হ’ল। কর্ম করানিয়ে কথা, কার কোন্ কর্মে কি বস্তু লাভ হয়, তা কে বলতে পারে? লক্ষ্যটি স্থির রেখে কাঁথা সেলাই-ই কর আর নামই কর, একই কথা। জীবনের গতি কোন্ দিকে, তাহা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত, এরূপই করতে হয়। তোমার এখনও একটা জীবনের দিক ঠিক হয় নাই। যখন তাহা ঠিক হ’য়ে যাবে, তখন একধারা কর্ম করবে। জীবনের গতি ঠিক হ’তে এখনও বহু বিলম্ব। এজীবন কোন্ দিকে কোন্ পথ দিয়ে যাবে, বলা যায় না। সকলেরই এক পথ নয় ত। নানাপথে চ’লে, মানুষ লক্ষ্যবস্তু লাভ করে। ব’সে থাকতে নাই; তা হ’লেই ক্রমে একটায় গিয়ে দাঁড়াবে।”

স্বপ্ন—প্রলয়ের দৃশ্য।

গত রাত্রে একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম—‘বেলা অবসানপ্রায়, আমি রান্না করিতে বসিয়াছি, অকস্মাৎ ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ১ঃই ফাটন, শুক্রবার। মুহূর্হঃ ভূমিকম্প হইতে লাগিল। বসিয়াও আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। চারিদিকে ভীষণ শব্দ শুনিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম বিষম ব্যাপার! অনন্ত আকাশবাপী ভয়ঙ্কর ঘৃণিবায়ু গ্রহ-উপগ্রহসমেত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটি চক্রাকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কোথায় যেন লইয়া যাইতেছে। ধূলিরাশিতে সমস্ত নভোমণ্ডল একেবারে ধূমাকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি পক্ষিসকল ঘৃণিবায়ুতে পড়িয়া আবর্জকালের তৃণের মত ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর দিকে আসিয়া পড়িতেছে। চটাচট্ শব্দে চতুর্দিকে রাশিকৃত শিলাবর্ষণ হইতেছে। মহা দুর্লক্ষণ দেখিয়া, আমি হঠাৎ পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম—বল্মল করিয়া ঐ দিকে একটি সূর্য উঠিল। বিস্ত্রিত হইয়া অমনই আমি আকাশের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—সকল দিকেই একটি একটি করিয়া সূর্য উদয় হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে দশ বারটি ভয়ঙ্কর প্রখরতেজোবিশিষ্ট সূর্যের এককালে প্রকাশ ও তাহাদের ঘন ঘন কম্পন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। সে সময়ে ঐ সকলের সহিত পৃথিবীটিও ভয়ঙ্কর সোঁ সোঁ শব্দে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া, নিম্নদিকে কোথায় যেন যাইতে লাগিল। আমি অমনই আসনে বসিয়া গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম

ধানে রাখিয়া, ‘জয়গুরু’ ‘জয়গুরু’ বলিতে বলিতে মগ্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই দেখি, সকল দিক্ শান্ত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত নিস্তর।’ অমনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া বলিলেন—“ভবিষ্যৎ প্রলয়ের দৃশ্যটিই দেখেছ। প্রলয় অনেক প্রকার আছে। যা দেখেছ, তা এই সৌরজগতের প্রলয়, ওরূপ একটা সময় শীঘ্রই আসুছে বটে।”

স্বপ্ন—ঠাকুরের দেহত্যাগের উদ্যোগ।

তিন চার দিন হয় স্বপ্নে ভয়ানক প্রলয়ের দৃশ্য দেখিয়াছি, গতকল্য আবার তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর

স্বপ্ন দেখিয়া মন অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম—আমরা ১০শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

বহুলোক ঠাকুরের সঙ্গে একটা স্থানে রহিয়াছি। ঠাকুর উত্তর দিকে আসন করিয়া বসিয়া বলিলেন, “আমার কাজ শেষ হ’য়ে গেছে; এখন আমি দেহত্যাগ করবো।” পরে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “শ্রীবৃন্দাবনে আমার কাঁথাখানা ফেলে এসেছিলাম, তাহা কেহ নিয়ে আসতে পার?” আমি অমনই শ্রীবৃন্দাবনে চলিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁথাখানা আনিয়া দিলাম। ঐ সময়ে গুরুভ্রাতাভগিনীরা ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ঠাকুরের বামপার্শ্বে এক হাত অস্তরে রহিলাম। ঠাকুর সকলেরই প্রতি সম্মেহদৃষ্টি করিয়া, এক এক জনকে এক একটা কিছু দিতে লাগিলেন। আমি সর্বাপেক্ষা ঠাকুরের নিকটে থাকিলেও ঠাকুর আমাকে কিছুই দিলেন না। পরে দেহত্যাগের সময়ে, সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “কি, তোমাকে কিছু দিই নাই?” এই বলিয়া নিজ মস্তকের সম্মুখ হইতে একটি জিনিস মুঠে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া, আমার হাতে দিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা তুমি এটি নেও।’ ওটি পাওয়া মাত্র আমি মাথায় রাখিলাম। ভাবাবেশে উন্নতবৎ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আর কান্দিতে কান্দিতে গাইতে লাগিলাম—‘আমার জানি কি হ’লো গো, গৌরান্দ্র বলিতে নয়ন ঝরে।’ আমি ক্ষণকাল পরে ঐ জিনিসটি মাটিতে ফেলিয়া আসন করিয়া উহার উপরে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। আর অমনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুরকে স্বপ্নবৃত্তান্তটি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি ত কখনও এ সব কল্পনাও করি না, তবে এরূপ দেখিলাম কেন?

ঠাকুর বলিলেন—“কেন দেখলে, বলা যায় না। এ সব স্বপ্ন লিখে রাখতে হয়। সমস্ত স্বপ্নই অলীক নয়। একটি স্বপ্ন বিশ বৎসর পরে সত্য হয়েছে দেখেছি।”

আমি বলিলাম—যে বস্তু মাথায় একবার স্পর্শ পেলো কৃতার্থ হওয়া যায়, তা মাটিতে ফেলে পেতে নিয়ে, আসন ক’রে বসতে, আমার প্রবৃত্তি হ’লো কেন?

ঠাকুর বলিলেন—“ওটি হ’চ্ছে শক্তি। ভগবানের নাম করতে হ’লে, শক্তির উপরেই ত বসতে হয়।”

ইহার পর ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—“তোমাদের কয় ভাইয়ের ভিতরেই বৈষ্ণব বীজ রয়েছে। এখন যে যে ভাবেই থাক, পরে সকলেরই বৈষ্ণব ভাব দাঁড়াবে।”

ঠাকুর দেহ ছাড়িবেন ভাবিয়া কোথায় দুঃখে অধীর হইব, তাহা না হইয়া, ঠাকুর এ জিনিস আমাকে দিবেন মনে করিয়া গরু হইতে লাগিল। হায় দশা! এই ত আমার অবস্থা!

কৃপণতায় অনুশাসন। ঘরখানা উইল করবে কার নামে?

আশ্রমের দক্ষিণের ঘরে সকালে সন্ধ্যায় অনেক গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হন। এই ঘরখানা ই সকলের বসিবার ঘর। স্বতরাং আসনে স্থির হইয়া এ ঘরে বসিবার ঘো নাই।

ঠাকুরকে যাইয়া আজ বলিলাম, ‘দক্ষিণের ঘরে সর্বদাই লোকের গোলমাল। ওখানে সাধন করার বড়ই অসুবিধা। সকলেই এসে বাজে গল্প করে, অথচ তাহা বললে ঝগড়া হয়।’

ঠাকুর বলিলেন—“ওখানে অসুবিধা হ’লে অন্যত্রও ত যেতে পার? গাছতলায় এদিকে সেদিকে, আশ্রমে স্থানের ত অভাব নাই। নাম করা নিয়ে কথা, তা ত যেখানে সেখানেই হ’তে পারে। দশটি লোক যেখানে মিলেমিশে একটা আনন্দ করে, সেখানে তাদের বাধা দিয়ে, নিজের সুবিধার চেষ্টা কর্তে নাই।”

আমি বলিলাম—আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পুকুরের ধারে, আপনি যদি বলেন, একখানা ছোট ঘর ক’রে নিতে পারি। তা হ’লে আর কোন অসুবিধা থাকে না।

ঠাকুর বলিলেন—“তার পর?” কোথাও চ’লে গেলে ঐ ঘরখানা উইল ক’রে যাবে কার নামে?”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, ‘ঠাকুর একথা আমাকে বলিলেন কেন?’

রাত্রিতে ঠাকুর আমার সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন—“ওর সাধন ভজনেতে যা একটু হ’চ্ছে, এক কৃপণতা দোষে তা মাটি ক’রে দিচ্ছে। হাতে ওর এক শত টাকা আছে, অনেক চেষ্টায় জমায়েছে। তা কোন প্রকারে খরচ করায় দিতে পারেন? কৃপণতাই সঙ্কীর্ণতা কিনা। ধর্ম্মার্থীদের স্বভাবে একটিমাত্র দোষ থাকলেও, তাতে ক’রে সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ’য়ে যায়। এখন হ’তে এবিষয়ে সাবধান না হ’লে, ক্রমে ঘটনায় প’ড়ে, ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঠিক হবে।”

ঠাকুর এ সময়ে ছোট দাদার উদারতার খুব প্রশংসা করিলেন। ‘ঘরখানা উইল ক’রে যাবে কার নামে?’ ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য্য এ সময় আমি বুঝিলাম। ঠাকুরের মুখে ঐ সকল কথা

শুনিয়া, মাথা আমার বিষম গরম হইয়া গেল। ভাবিলাম, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে যতকাল উদ্বেগ, অশান্তি ও ক্লেশ বোধ আছে, ততকাল বিনা আয়াসে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঐ ক্লেশের ও অশান্তির উপশমের ব্যবস্থা রাখা দোষ হইল ! নিয়ত অভাব ভোগ করিয়া মন যদি অশান্তিপূর্ণই রহিল, তা হ'লেই বা সাধন ভজন করিব কিরূপ ? অর্থ সঞ্চয় ত সাধন ভজনেরই সুবিধার জন্ত, বিলাসিতার জন্ত ত নয়। ঠাকুর এত বুঝেন, আমার এই স্তম্ভ অভিপ্রায়টি বুঝিলেন না !

আমার সঙ্কীর্ণতা। ঠাকুরের উপদেশ ও ভিক্ষার ব্যবস্থা।

গত কল্যা ঠাকুরের মুখে আমার সঙ্কীর্ণতার বিষয় শুনিয়া অবধি, ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতেছি।

প্রাণ যেন হ হ করিয়া জলিয়া যাইতেছে। অভাব বশতঃই আমার এই ২২শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

কৃপণতা অথবা স্বভাবেই আমার সঙ্কীর্ণতা, তাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি না।

ঠাকুর বলিয়াছেন যে, 'ক্রমে ধাক্কা খেয়ে, এ দোষ আমার দূর হবে।' কিন্তু ধাক্কাও ত কম খাইতেছি না ! দোষ দূর হইতেছে কই ? কয়দিন হয় সরকারি ভাণ্ডারে 'ঘৃত বাড়ন্ত হইয়াছে' দিদিমা বলাতে, ঠাকুরের সেবায় আধ ছটাক পরিমাণ ঘৃত প্রত্যহ আমি দিয়া আসিতেছিলাম। পাঁচ ছয় দিন ঐ প্রকার দেওয়ার পর একদিন আমার মনে হইল, 'ভাল ! সরকারি ভাণ্ডারে ত ঘৃত আসিতেছে না, দিদিমাও বেশ সুবিধা বুঝিয়াছেন। ওরা যতকাল ঘৃত না আনিবে, ততকালই ত এই প্রকার ঠাকুর-সেবায় আমাকে ঘৃত দিতে হইবে। এত কষ্টে আমি ঘৃত সংগ্রহ করি, এ ভাবে প্রতিদিন দিলে আমার এক মাসের হোমের ঘৃত ত দশ দিনেই শেষ হইয়া যাইবে।'

এই প্রকার বিচার ও আক্ষেপ আমার মনে আসার পরে, সেই দিনেই ঠাকুর দিদিমাকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন—“আহারের সময়ে ওর ঘি আমাকে দিবেন না। ঐ ঘি আমার হজম হবে না।” ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে মনে করিলেন, হোমের ঘৃত বহু দিনের সংগ্রহ—নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই ঠাকুর ঐ কথা বলিলেন। আমি কিন্তু ঠাকুরের বলার তাৎপর্য তখনই বুঝিয়া কয়দিনযাবৎ জলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। আমার অভিপ্রায়মতই ত ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে তাতেও এত জ্বালা কেন ? ভিতরের ক্লেশ অসহ্য বোধ হওয়াতে, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, ‘আমার সঙ্কীর্ণতা কিসে যাবে, বলিয়া দিন। হাতের টাকাগুলি আমি দান ক’রে ফেলব।’

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—“টাকা যা রয়েছে, এখনই ব্যয় ক’রে দরকার নাই। এখন থাক। সাময়িক একটা ভাবে বা উৎসাহে কোন কাজই কর্তে নাই। অনেক সময়ে, উৎসাহে দান ক’রে, পরে অনুতাপে লোক নরক ভোগ করে। সমস্ত কাজই স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরভাবে কর্তে হয়। এখন থেকে আর কিছু সঞ্চয় ক’রো না। দাদারা যাহা মাসে মাসে দেন, পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ ব্যয় ক’রে ফেলো। যে পথে চল্ছ, তাতে সঞ্চয় কর্তে নাই।”

আমি বলিলাম—বায় কি নিজের প্রয়োজনে কর্বে, না অগ্নির জ্ঞা ?

ঠাকুর বলিলেন—“তোমার আবার নিজের প্রয়োজন কি ? আজ থেকে আহারের জ্ঞা ভিক্ষা কর্বে। অর্থ কারও নিকট চাইবে না। ভিক্ষায়, দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ কর্বে না। কেহ বেশী দিয়ে গেলে, তা কাকেও দিয়ে দিবে। আহারের কোন বস্তুই সঞ্চয় কর্বে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত রান্নাও কর্বে না। যে দিন ভিক্ষায় কিছু না জুটবে, ভাঙার হ’তে নিবে। আশ্রমের ভাঙারের সামগ্রী ত ভিক্ষুকদেরই জ্ঞা। এই ভাবে চ’লে যদি তেমন বৈরাগ্য জন্মে, তবেই ত সন্ন্যাস। না হ’লে এখন থেকে যে দিকে জীবনের গতি হবে, সে দিকেই যেতে হবে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই সমস্ত অভ্যাস কর্তে হয়। ব্রহ্মচর্য ঠিক হ’লেই ত সব হ’লো। এ সকল অভ্যাস এখন না করলে, আর কর্বে কবে ?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ভিক্ষা কয় বাড়ী পর্য্যন্ত কর্তে পার্বে ?

ঠাকুর বলিলেন—“ভিক্ষা তিন বাড়ী পর্য্যন্ত কর্তে পার্বে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন কোন জাতির বাড়ী ভিক্ষা করা যায় ?

ঠাকুর বলিলেন—“চাল ভিক্ষা সকলের বাড়ীই করা যায়। শ্রদ্ধার ভিক্ষার সর্বত্রই পবিত্র। ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষাই ব্যবস্থা।”

প্রথম ভিক্ষা ঠাকুরের হাতে ; এ কি চমৎকার !

ঠাকুর এ সকল কথা বলিয়া নীরব হইলেন পরে আমি ভাবিতে লাগিলাম—লোকে বলে, প্রথম দিনের ভিক্ষা যে ভাবে পাওয়া যায়, সারা জীবনে ভিক্ষা সে ভাবেই সেই প্রকারের বস্তু লাভ হইয়া থাকে। এজ্ঞা নাকি উপনয়নের সময় ভিক্ষা মা’র হাতেই প্রথম লইতে হয়। স্নেহভাবে দরদ করিয়া উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তু ঠাকুর বিনা কে আমাকে দিবে ? এই মনে করিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, ‘জীবনে প্রথম ভিক্ষা তা হ’লে আপনার নিকটই আজ কর্বে।’

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন—“তা বেশ আজ আমিই তোমাকে ভিক্ষা দিব, কাল থেকে অল্প বাড়ী যেও। এখন ভিক্ষা এ পাড়াতেই ক’রো।”

সকাল বেলা ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ পাইয়া নিজ আসনে আসিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় দেখি, আশ্রমে মহা ঘট পড়িয়া গেল। একটি অবস্থাপন্ন ভক্ত গুরুভ্রাতা, আজ ঠাকুরের সেবার জ্ঞা প্রচুর সামগ্রী লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পলাউ, ছানার ডালনা প্রভৃতি বহু উপাদেয় খাদ্য ঠাকুরের ভোগের জ্ঞা প্রস্তুত হইল। বেলা প্রায় একটার সময়ে ঠাকুরের সেবা হইল। আহারান্তে ঠাকুর নিজ হাতে তুজাবশিষ্ট পলাউ এবং ডালনা প্রভৃতি একটি পাথরের বাটীতে তুলিয়া,

আমাকে ডাকিয়া উহা দিয়া বলিলেন—“এই নেও, আজ এই তোমার ভিক্ষা। এখন নিয়ে রেখে দেও, তোমার আহারের সময়েই খেয়ো।”

আমি খুব আনন্দিত মনে উহা লইয়া আসিলাম এবং ঢাকিয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—‘হায় ঠাকুর! পলাউ যদি দিলে, তা হ’লে গরম গরম এখনই খেতে বললে না কেন? চার পাঁচ ঘণ্টা পরে ইহা ত জুড়ায় একেবারে জল হ’য়ে যাবে। প্রথম ভিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রসাদ হাতে ধ’রে দিলেও গরম থাকতে তৃপ্তির সহিত খেতে দিলে না!’

ঠাকুরের সেবার পর নিয়মিতরূপে মহাভারত পাঠ করিয়া, স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর আর আর দিনের মত ৫৥ টার সময়ে আমাকে বলিলেন—“যাও, এখন তুমি আহার কর গিয়ে।” আমি আহার করিতে বসিয়া প্রসাদের বাটীটি স্পর্শ করিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম ‘তরকারি সহিত সমস্ত পলাউ চমৎকার গরম রহিয়াছে, ঠিক যেন উহা কেহ উননের উপর হইতে আনিয়া রাখিয়াছে।’ পাথরের বাটীতে পলাউ-প্রসাদ, পাঁচ ঘণ্টা পরেও কি প্রকারে এত গরম রহিল, ভাবিয়া একেবারে অবাক হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ উহা লইয়া বসিয়া কান্দিলাম। প্রসাদ পাইতে আজ আমার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। প্রসাদ পাওয়ার পর গত রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, ‘সঙ্কল্প মাত্রে পাখীর মত শূন্যমার্গে অনন্ত আকাশে উর্দ্ধদিকে উড়িয়া যাইতেছি।’

অন্য (২ শে ফাল্গুন) জীবনে প্রথম বাহিরে ভিক্ষা করিলাম। মনোহরা দিদি খুব শ্রদ্ধার সহিত চাউল, বুটের ডাল, আলু, কাঁচকলা, বেগুন, লস্কা, সৈন্ধব ও ঘৃত ভিক্ষা দিলেন। আমি নিজের পরিমাণ মত রাখিয়া, অবশিষ্ট পাখীদের ছড়াইয়া দিলাম। পক্ষ্য দ্বারা হোম করিয়া যোগজীবন, শ্রীধর ও পণ্ডিত মহাশয়কে এক এক গ্রাস দিয়া প্রসাদ পাইলাম। ভিক্ষায় আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল।

এই কয়দিনযাবৎ ঠাকুরের কথা সর্বদাই মনে হইতেছে। হাতের টাকাগুলি ব্যয় না করিয়া ফেলা পর্য্যন্ত বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছি। শ্রীকৃন্দাবনে থাকার কালে ২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। মাঠাকুর, ঠাকুরকে একখানা মহাভারত দেওয়ার আকাজক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরকে তাহাই দিব স্থির করিয়া টাকা আনিতে বাড়ী যাইব। ঠাকুরকে বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা জানাইলে, ঠাকুর বলিলেন—“বাড়ী যেয়ে ভিক্ষা ক’রো না; মার মনে কষ্ট হবে। বাড়ীতে যখনই যাবে মাঠাকুরের প্রসাদ পেও।”

সমবয়স্ক গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্রকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পহুঁছিতে নোকায় ও স্থলপথে ৫।৬ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে বহুবার ১৫।২০ মিনিট করিয়া রাস্তায় ধূপ ধনা চন্দন ও গুগ্গুলের পরিষ্কার স্নগন্ধ পাইয়া, উভয়েই আশ্চর্য্য হইতে লাগিলাম। বিস্তৃত ময়দানে চলতি পথে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সঙ্গন্ধ কোথা হইতে কি প্রকারে আসিতেছে কিছুই বুঝিলাম না।

চৈত্র ।

সেবা-ভক্তিতে বিগ্রহ জাগ্রত হন ।

এবার বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী কথায় কথায় তাঁর গোপাল ঠাকুরের কথা বলিলেন, শুনিয়া অবাক হইলাম । মা'র দু'টি হৃন্দর ছোট ছোট গোপাল ঠাকুর আছেন । তিনি প্রতিদিন ১ ই চৈত্র, সোমবার । তাহাদের খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সেবা পূজা করিয়া থাকেন । একদিন পাড়ার একটি দুষ্ট ছেলে, আমাদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়া, ঐ গোপাল ঠাকুর দু'টি দেখিতে পায় ; খেলা সঙ্গ হইলে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সন্ধ্যার পরে সে গোপাল দু'টি চুরি করিয়া লইয়া যায় । মা তাহা কিছুই জানেন না । শেষ রাত্রিতে গোপাল ঠাকুর স্বপ্নে মাকে বলিলেন— 'ওগো ! একবার আমাদের ভাখ্ । ঐ দুষ্ট ছেলেটা আমাদের নিয়ে এই বাড়ীতে এনে উত্তরের ঘরে শিকার উপর হাঁড়ির ভিতর নারিকেলের মালায় ক'রে রেখে দিয়েছে । সকাল হ'লেই পুরুত পাঠায়ে আমাদের নিয়ে যাস্ ।' মা শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া অমনই জাগিয়া উঠিলেন এবং বাস্তবতার সহিত ঠাকুরঘরে গিয়া দেখিলেন—যথার্থই ঠাকুর সিংহাসনে নাই । তিনি অমনই পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন । পুরোহিত ঠাকুর গ্রামের অপর প্রান্তে সেই বাড়ীতে যাইয়া, একেবারে ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং শিকার উপর হাঁড়ির ভিতরে নারিকেলের মালায় গোপাল দুইটিকে পাইয়া লইয়া আসিলেন ।

ঠাকুরকে এই কথা বলায় ঠাকুর বলিলেন “শ্রদ্ধা ক'রে সেবা পূজা করলে, বিগ্রহ জীবন্ত হন । তখন তিনি সেবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ; মাহুষের মত খাবার চান ; কোনও প্রকার অনাচার অত্যাচার হ'লে ব'লে দেন । এ সব কিছুই আশ্চর্য্য নয় । অনেক স্থলেই এ সব দেখা যায় । তোমার দাদার শালগ্রামটিও বড় চমৎকার ; বেশ জাগ্রত । আমি যখন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম, একদিন অযোধ্যা থেকে ঠাকুর দর্শন ক'রে বাসায় এসে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই, তোমার দাদার ঠাকুর আমাকে বল্লেন— 'ওরে, আমাকে কিছু খাবার দে । ওরা আমার পূজা করে, কিন্তু খাবার দেয় না ।' আমি সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিলাম, তাই ওই বামনদেবকে দিলাম । সেই থেকেই তোমার দাদা ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছেন ।”

এই বলিয়া ঠাকুর দাদার শালগ্রামের আরও অনেক কথা বলিলেন । সে সকল বিষয় গত বৎসর আমি যখন দাদার নিকটে ছিলাম, দাদার মুখে শুনিয়া সেই সময়ের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি, এজন্ত এস্থলে আর লিখিলাম না । কোনও একটি বৈষ্ণব পরমহংস, অযাচিত ভাবে হঠাৎ একদিন

আসিয়া ঐ শালগ্রামটি দাদাকে দিয়া যান। দাদা তাঁকে বলিলেন—আমি এ সব মানি না বিশ্বাস করি না। পরমহংস বলিলেন—ঘরে এমনই রেখে দিন। ঠাকুর আমার খুব জাগ্রত, ইনি নিজেই মানায়ে নিবেন। দাদা শালগ্রাম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিলেও, ঠাকুরেরই অসাধারণ রূপায় শালগ্রামকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঠাকুর দাদার কথা তোলাতে, স্বর্ষোগ পাইয়া বলিলাম—কয়দিন হয় দাদা তাঁর ৫৬ বৎসরের মেয়েটির জাগ্রত অবস্থাও যে সকল দর্শনাদি হয়, সে সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করুতে লিখেছেন। এই বলিয়া আমি বিস্তারিতরূপে, দাদার পত্রের বিষয় ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন—“তোমার দাদা ডাক্তার মানুষ। লিখে দাও, মাথা গরম হয়েছে বা কোন রোগ হয়েছে মনে ক’রে, ওকে ঔষধ পত্র না খাওয়ান। এ অবস্থায় ঔষধ খাওয়ালে অনিষ্ট হবে। সাধারণে চোখে যা দেখে না, কেহ তা দেখে বললেই গোল। লোকে মনে করে, মাথার কোন রোগ হয়েছে। এ অবস্থায় রোগ মনে ক’রে ঔষধাদি খাওয়ালে, অনেক সময়ে বিপদ ঘটে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—মাথার গোলমালে কি লোকে ওসব দেখে না?

উত্তর—“তা দেখবে না কেন, খুব দেখে। এজন্যই শাস্ত্র পুরাণের বর্ণনার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলায়ে নিতে হয়। মাথার গোলমালে যা দেখে, তা গোলমালই দেখে, প্রমাণের সহিত তার মিল থাকে না।”

প্রশ্ন—সাধনের সময়ে আসনে ব’সে, লোকে যে সব বিভীষিকা দেখে, তা কি সত্য?

উত্তর—“আসনে স্থির থেকে সাধন করলেই, তা সত্য কি মিথ্যা ধরা পড়ে।”

কৌশলের দান ; অনুতাপ ।

বাড়ী ঘাইয়া এবার ৮১০ দিন ছিলাম। পোষ্টাফিস হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া মাতা ঠাকুরাণীকে ২৫ টাকা দিয়া গেওয়ারিয়া আসিয়াছি। ঠাকুরকে একখানা মহাভারত ১০ ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

কিনিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে, একটি গুরুভ্রাতাকে ৪০ টাকা দিলাম। নিজের প্রয়োজনে পুস্তক ক্রয় করিয়া, ৮১০ টাকা ব্যয় করিলাম। অবশিষ্ট টাকা দু’দিন আমার হাতেই রাখিয়াছিলাম। কোন কোন গুরুভ্রাতা তাহা জানিতে পারিয়া অভাব ও প্রয়োজন জানাইয়া আমার নিকট কিছু কিছু চাহিতে লাগিল। আমি বিষয় ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। ভাবলাম ‘এ কি উৎপাত!’ আমি তাড়াতাড়ি ঐ টাকাগুলি লইয়া গিয়া, দিদিমার হাতে দিয়া বলিলাম—দিদিমা! এই টাকা আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করিবেন; আশ্রমের ভাণ্ডারে ইহা আমি দিলাম। জানি না, ঠাকুর কোন সূত্রে আমার দানের কৌশল বুঝিয়া আমাকে বলিলেন—“আশ্রমের ভাণ্ডারের জন্ত বুড়ো-ঠাকুরের হাতে অতগুলি টাকা দিয়েছে কেন?”

ঠাকুরের ঈশ্বর হস্তমুখে ঠাট্টার ভাবে এই প্রশ্নটি শুনামাত্র, আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল, আমি লজ্জায় মাথাটি হেঁট করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিলাম, ভাবিলাম—‘হয়েছে, এবার বুঝি সব গুণের ফাঁক !’

গত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারিকে যে দান করিয়াছিলাম, তাহা আমার এ সময়ে মনে পড়িল, আর ভয়ানক অসুতাপে ও জ্বালায় অস্থির হইতে লাগিলাম। গত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেই, ঠাকুর আমাকে যমুনায় স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। সঙ্গে আমার এগারটি টাকা ছিল। আল্গা স্থানে রাখিয়া গেলে, পাছে কেহ জানিতে পারে এই আশঙ্কায় উহা টেকে গুজিয়া স্নান করিতে গেলাম। পথ আমার অজ্ঞাত বলিয়া, কুঞ্জের মালীক দামোদর পূজারি সঙ্গে চলিলেন। স্নানের সময় টাকা সারিয়া রাখিতে দামোদর উহা দেখিয়া ফেলিলেন। আমি মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম ঠাকুরের কোন কিছু প্রয়োজন জানাইয়া এ বেটা যখন ইচ্ছা টাকা কয়টা বাহির করিয়া লইবে। নজর যখন উহার পড়িয়াছে, এ টাকা বাণ্ডয়ারই মধ্যে। সুতরাং এখনই ভবিষ্যৎ উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল। মনে মনে এই স্থির করিয়া, স্নানের পর দামোদরকে বলিলাম—পূজারিজী! আপনিই ত আমাদের ঠাকুরের সেবার সমস্ত ভার লইয়া আছেন। এই কয়টা টাকা মাত্র আমার আছে, আপনি ইহা ঠাকুরের সেবায় লাগাইয়া দিবেন। আর আমি যে দু’তিন মাস আপনার আশ্রমে থাকিব, দয়া করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ, দু’বেলা দু’মুঠো আমাকে দিবেন। তীর্থে আসিয়া সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণকেই ত দান করিতে হয়, না হ’লে কিছুই ত সফল হয় না। তাই আমার যাহা কিছু আছে, আপনাকেই দান করিলাম, আমাকে আশীর্বাদ করুন। এই বলিয়া টাকা কয়টি দামোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিলাম। দামোদর হাতে টাকা পাইয়া, খুব খুসি হইয়া অত্যন্ত আদরের সহিত আমার পিঠে দু’টি চাপড় মারিয়া বলিলেন—‘ও তোহারা ত ভক্তি বড়া ভারি! ভাল! ভাল! আরে সব দে দিয়া! রাম! রাম!’ আমি ও মনে মনে বলিলাম—‘হাঁ, দান ভক্তি আমার যা, তুমি পরে বুঝবে।’

এবারও আশ্রমসেবার জন্ত দানটি, আমার যে ভাবে হইয়াছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর বলিলেন—“যার প্রয়োজন, কোনও দিক্ না তাকায়ে, দান তাকেই কর্ত্তে হয়। দান দরদ ক’রে কর্ত্তে হয়। নিজের একটা অভাব হ’লে তা যেমন পূরণ কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, অন্তর প্রয়োজনও যদি সেই প্রকার মনে লাগে, তা হ’লেই যথার্থ দান হয়। শ্রদ্ধাশূন্য দান, দেখাদেখি দান বা উৎপাত শান্তির জন্ত যে দান, তাকে দান বলে না। আর প্রতিষ্ঠার জন্ত দান, একটা মতলব ক’রে দান বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থের গন্ধ রেখে যে দান তা দানই নয়। উহা একটা কৌশল করা মাত্র। ওতে আত্মার কোন কল্যাণই হয় না, বরং অনিষ্ট হয়।”

হুদ্দিনে ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি ।

গতকলা একাদশী তিথিতে আর আর বারের মত নিরসু উপবাস করিয়াছি। সন্ধ্যার পরে ছয় সাত বৎসরের কয়েকটি বালিকা আসিয়া আমার আসনের পাশে বসিল,
: ৩ই চৈত্র, শুক্রবার।

এবং গল্প বলিতে পুনঃপুনঃ ছেদ করিতে লাগিল। আমি দু'একটি গল্প শুনাইয়াই তাহাদিগকে বিদায় করিলাম। রাত্রে স্বপ্নদোষ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি প্রায় বারটা হইতে ভোর পর্য্যন্ত, একবার বাহিরে একবার ঘরে উঠাবসা করিয়া কাটাইলাম। বিষম আক্ষেপ আসিল। মনের ক্লেশে মাথাটি আগুন হইয়া গেল। ঠাকুরের উপরে দারুণ অবিশ্বাস জগিল। ভাবিলাম— 'সমস্তই বৃথা! অনর্থক শ্রম করিতেছি।' সামান্য শরীরের একটা দুর্গতি, যে গুরুতর ব্যবস্থামত এত কাল কার্য্য করিয়াও ফিরিল না, তাঁর উপদেশ মত চলিলে, স্বভাবের দোষ, মনের বহিষ্কৃত দুর্ব্বস্থা যে দূর হইবে তারই বা প্রমাণ কি? ভগবানকে লাভ করিব প্রত্যাশায় যাহার কৃপাই একমাত্র ভরসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি, এবং যাহার উপদেশই একমাত্র কর্তব্য জানিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছি, সামান্য সামান্য বিষয়েই যদি তাঁর বাক্য মিথ্যা হইল, তাহা হইলে প্রকৃত ধর্ম্ম-লাভের জন্ম তিনি যে সকল উপায় বলিয়া দিতেছেন, তাহা যে সত্য, তারই বা বিশ্বাস কি? চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবনে রোগের উপশম না হইলে, তাঁহার হাতযশে রোগীর নির্ভর করা, আর অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া থাকা একই কথা। আমি তাহা কিছুতেই পারিব না। কল্যাণে আমি ঠাকুরকে শেষ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিব। এই স্থির করিয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অল্পদূরে স্নান করিয়া, কোনও প্রকারে নিত্যকর্ম্ম সারিয়া লইলাম। নির্জনে অবসর বুঝিয়া, ঠাকুরের চা-সেবার সময় সময় কালে, তাঁর পশ্চাদ্ধিকে, ঘরের বাহিরে উঠানে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। 'হায়! ঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিলাম', এ সময়ে মনে হইতেই, আমার কান্না আসিয়া পড়িল, আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। এ সময়ে ঠাকুরও আধকান্না স্বরে প্রায় দুই মিনিট কাল "হরি বোল" "হরি বোল" বলিতে লাগিলেন। আমি মাথা তুলিতেই, ঠাকুর পশ্চাদ্ধিকে আমার পানে মুখ ফিরাইয়া, মমতাপূর্ণ ছলছল চক্ষে, খুব স্নেহভাবে ডাকিয়া বলিলেন "আহা কাল নিরসু উপবাস ক'রে এখনও কিছু খাও নাই? এই নেও, একটু জল খেয়ে এখন ঠাণ্ডা হও গিয়ে।"

এই বলিয়া ঠাকুর কিছু মিষ্টি ও একটি বেল আমার হাতে দিলেন। ঠাকুরের সেই সময়ের কান্না, অর্দ্ধক্ষুট স্বর ও এক প্রকার চাহনিতে, আমার যেন বুক ফাটিয়া গেল। কেবল এই মনে হইতে লাগিল, 'আহা! এ জগতে এরূপ দরদের চক্ষে কে আর আমাকে দেখিবে?' আমি কান্দিতে কান্দিতে অবসর হইয়া পড়িলাম। একটু পরে খাবার লইয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম।

সকালে জলযোগের পর বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে, ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। ঠাকুর

কিছুকালের জ্ঞান পাঠ বন্ধ করিলেন। ঐ সময়ে আমি বলিলাম, ‘অনেক সময়ে অনেক কথা আপনাকে বলব মনে করি, কিন্তু নিকটে আসিলেই সব ভুলে যাই।’

ঠাকুর আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—“বলিবে আর কি? বলা কওয়ার আর কি আছে? কাজ ক’রে যাও। একটা স্থায়ী অবস্থা হঠাৎই ত মহাত্মারা দেন না। সিংহের দুধ সোনার পাত্রে না রাখলে টেকে না, নষ্ট হ’য়ে যায়। মহাত্মারা পাত্রটি ঠিক ক’রে নিয়ে, বস্তু দেন। অবস্থালভের জন্য ব্যস্ত হইও না, সে ঠিক সময়েই হবে।”

আমি বলিলাম—এক সময়ে হবে, এই আশা পেলেই ত নিশ্চিন্ত থাকি।

ঠাকুর বলিলেন—“এখন যদি তোমাকে ঐ অবস্থা দেওয়া যায়, তোমার অনিষ্ট করা হবে। উদ্ধরতা হ’লে, তুমি কারোকেই গণ্য করবে না। ঐ অবস্থা লাভ হ’লে, তুমি স্থির থাকতে পারবে না। ঐ ঐশ্বর্য্যেতে ক’রে সমস্ত সংসার তুমি ছারখার করবে, সর্ব্বনাশ করবে। অভিমানটি নষ্ট হ’লেই ওসব ঐশ্বর্য্যলাভ নিরাপদ। এখন কাজ ক’রে যাও। ওসব দিকে খ্যাল রেখো না। সব দিকে ঠিক হওয়া, ছ’একদিনের কর্ম নয়।”

ঠাকুর একটুকু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—“ব্রহ্মচর্যাশ্রমে স্ত্রীলোকের সহিত কোন প্রকার সংস্রবই রাখতে নাই। এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হ’তে হয়। তাঁদের দিকে তাকাবে না, তাঁদের সঙ্গে বসবে না, তাঁদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপও করবে না। স্ত্রীজাতি যেই কেন হউন না, অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন আর যুবতীই হউন অথবা নিতান্ত বালিকা খুকীই হউন, সর্ব্বদা তাঁদের থেকে তফাৎ থাকবে। চুম্বকে যেমন লোহাকে টানে, সেই প্রকার স্ত্রীজাতির শরীর এমন কতগুলি উপাদানে গঠিত যে, তাতে পুরুষ শরীরকে আকর্ষণ করে। এটি বস্তুগুণ, এতে পাত্রাপাত্র, সাধু অসাধু বিচার নাই। এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা, এমন কি মাতা, ভগিনী, ছহিতার সম্বন্ধেও সাবধান থাকতে অতুশাসন ক’রে বলেছেন—

‘মাত্রা স্বস্তা ছহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কৰ্ষতি ॥’

মাতা, ভগিনী, ছহিতার সম্বন্ধেও নির্জনে একাসনে বসবে না; বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বানকেও আকর্ষণ করে। বিদ্বান্ বলতে ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। যিনি মুক্তপুরুষ, তাঁকেও এতে আকর্ষণ করে। কাশীতে দণ্ডী স্বামী এ কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তিনি মনে করলেন, ‘এ কখনও হয়? ব্রহ্মবিদ্যা যিনি লাভ করেছেন,

সেই বিদ্বানকে কিছুতেই এতে আকর্ষণ করতে পারে না।' তিনি, ব্যাসদেব ভুল লিখেছেন মনে ক'রে, তা কেটে দিয়ে, 'নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি' লিখে রাখলেন। তার পর তাঁর যে ছদ্মশা ঘটেছিল, তা ত শুনেছ ?"

অবিশ্বাস, সাধনে অভিমান ; অনুশাসন।

মহাভারতপার্শ্বের পর ভিতরে বিষম উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার যে সব অবিশ্বাস সন্দেহ জন্মিয়াছে, বলিয়া ফেলি। আমি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, 'মিথ্যা কথা বলা কি শুধু আমাদেরই দোষ, না ভগবানেরও ?'

ঠাকুর বলিলেন--"ভগবান্ কখনও মিথ্যা বলেন না ; তাঁর ইচ্ছা, কার্য্য, বাক্য সমস্তই সত্য। সেখানে মিথ্যার কিছুই নাই।"

আমি বলিলাম—শ্রামবাজারে আমার প্রতি আদেশ হয়েছিল—'ছ'টি ঘণ্টা স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রো, স্বপ্নদোষ হবে না।' আমি ত ঐ সময় থেকে প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ মাত ঘণ্টা ব'সে নাম করছি, কিন্তু স্বপ্নদোষ ত নিবারণ হ'ল না। এজন্য আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস আসিয়াছে। দেখিতেছি আমরা মিথ্যা বলি অতীত ও বর্তমান বিষয়ে, আর আপনারা বলেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া কোনও অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ না করিয়া, একভাবেই থাকিয়া বলিলেন--"তুমি স্থিরমনে ছ'ঘণ্টা নাম ক'রে থাক ?"

আমি বলিলাম—স্থিরমনে কি ক'রে করব ? মন ত স্বভাবতই অস্থির। আসনে ছ'ঘণ্টারও অধিক সময় একভাবে ব'সে নাম করি।

ঠাকুর বলিলেন—"তা হ'লে আর অশ্রের দোষ কি ? ছ'ঘণ্টা কেন, ছ'মিনিটও তুমি স্থির হ'য়ে নাম কর না। একটিবার কর দেখি, কেমন কথা অশ্রু হয়। শুধু নাম করলেই ত হবে না, স্থির হ'য়ে করা চাই। এই নাম অক্ষর নয়, একটা শব্দ নয় ; এই নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। ভগবান্ই নাম। নাম করা আর ভগবানের সঙ্গ করা এক। লক্ষ্য বস্তু ছেড়ে দিয়ে, নাম করলে কি হবে ? নাম করার সময়ে, মনটি নানা-দিকে ঘুরে বেড়ায়, নাম ঠিক করা হয় না। নিজের দোষ দেখ না, অশ্রেরই দোষে কষ্ট পাচ্ছ মনে কর। নিজের ক্রটি না দেখে, এরূপে অশ্রের প্রতি দোষারোপ করতে নাই, অপরাধ হয়।"

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—"তুমি অন্যান্য অপেক্ষা আসনে একটু অধিক সময়ে ব'সে থাক, এতেই তোমার কতটা অভিমান হয়েছে ! দেখ, কি ভয়ানক ! তোমার মত

যারা আসনে বসে না, নাম করে না, সর্বদা হাসি গল্প ক'রে বেড়ায়, কিছুই করে না দেখতে পাচ্ছ, তাদের ভিতরেও এমন সব সদগুণ আছে, যা তোমার নাই। কোন চেষ্টা না ক'রে শুধু বিশ্বাসবলে, কেহ কেহ এমন অবস্থা লাভ করবে, যা সাধন ভজন ক'রে বহুকালে তোমার লাভ করা কঠিন হবে। সর্বদা নিজেকে ছোট ভেবো, কারো অপেক্ষাই কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রো না। অনেকে বহু সাধন ভজন ক'রে, কঠোরতা ক'রে, যে অবস্থা বহুকালে লাভ করতে পারে না, একটি লম্পটের, বদমায়েসের, ডাকাতের সেই অবস্থা স্বাভাবিকই থাকতে পারে। অভিমান করবার কি আছে? একটু সাধন কর ব'লে, অভিমানে পথ দেখছ না! এই অভিমান থাকতে, একটা অবস্থা তোমাকে দিলে, ঐশ্বর্য্যমন্ত হ'য়ে তুমি কারোকে তৃণতুল্যও জ্ঞান করবে না। প্রতি কার্য্যে বিচার ক'রে চলো, বিচার না করলে অনেক অনর্থ জন্মে। নিজেকে ছোট ব'লে না জানা পর্য্যন্ত, হাজার সাধন ভজন চেষ্টা তপস্কায়ও কিছুই হবে না।”

ঠাকুরের প্রতি আমার অবিধাস আসিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি মিথ্যা কথা বলেন, এই

১০ই চৈত্র, রবিবার।

সকল বিষয় ঠাকুরকে মুখের উপরে বলা অবধি, ভিতর যেন আমার একে-বারে শূন্য শাসন হইয়া গিয়াছে। দিনরাত আমার কি ভাবে যাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অন্তরের অসহ যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া, নিজ শরীরে নিজে নানাস্থানে আঘাত করিলাম, চুল ছিঁড়িলাম, মাথা ঠুকিলাম, কান্দিতে কান্দিতে অস্থির হইয়া হাত পা সময়ে সময়ে আঁহড়াইতে লাগিলাম। আত্মহত্যা করিবারও সময়ে সময়ে ঝোক আসিতে লাগিল। ঠাকুর এই সময়ে পাঠ বন্ধ রাখিয়া এক একবার উচ্চৈঃস্বরে ‘হরিবোল’ ‘হরিবোল’ বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন “কাল থেকে আবার তুমি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ ক'রো।”

আজ ঠাকুরের আদেশ মত আবার সেই ‘নীলকণ্ঠবেশ’ ধারণ করিয়া, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। বেশের গুণেই হউক অথবা ঠাকুরের রূপায়ই হউক, ধীরে ধীরে আমার জালা যন্ত্রণা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবৃত্তি হইয়া গেল।

পরিবেশনে ত্রুটি। তীর্থপর্য্যটনের নিয়ম।

এবার কলিকাতা হইতে আমার পর এ পর্য্যন্ত আশ্রমে বড়ই অর্থক্লান্ততা চলিতেছে। গুরুভ্রাতারা

১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

অনেকে আহারের অস্ববিধা ভোগ করিয়া স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও, আশ্রমে

আহারাদি বিষয়ে ভালর দিকে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই। কিছুদিন

ঠাকুরের এবং সমাধিমন্দিরের জন্ত পৃথকভাবে ভোগ রান্না করিয়া, আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাদের সাধারণ

রকম ব্যবস্থায় চলিয়াছিল। ঠাকুর বোধ হয় আমাদের ভিতরের দুর্বস্থা আমাদেরকে দেখাইবার জন্যই তখন ওসব বিষয়ে কিছু বলেন নাই। ‘ঠাকুর পূর্বের ঘরে পৃথক্ আহার করেন, তাঁর পাক স্বতন্ত্র প্রকার হয়’ ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কথা তুলিলেন। ঠাকুর উহা জ্ঞাত হওয়া মাত্রই সেই দিন হইতে দক্ষিণের ঘরে সকলের সহিত এক সঙ্গে বসিয়া সাধারণের পাকে আহার করিতেছেন। পরিবেশনের ভার পূর্বাপর আমার হাতেই আছে। আমি গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা ঠাকুরকে ভাল তরকারি অধিক পরিমাণে দিয়া থাকি। ঠাকুর দুই তিন দিন আমাদের ওরূপ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়াও শুনি নাই।

আজ আবার ঠাকুর বলিলেন—“একস্থানে দশটি লোক ব’সে আহার করলে পরিবেশনে লঘু গুরু করতে নাই; এক রকমই দিতে হয়। প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় অধিক পরিমাণে দিলে এঁটো বস্তু দেওয়া হয়। খেয়ে আহারে কোন তৃপ্তি হয় না ক্ষুধাও মিটে না।”

আজ মহাভারতপাঠের পর ঠাকুর আমাকে তীর্থপর্যটনের নিয়ম বলিলেন—“তীর্থপর্যটন যৌবনে না করলে আর হ’য়ে উঠে না। যা কিছু করা এ সময়েই করতে হয়। পর্যটনের সময়ে সর্বদা মাথা হেট ক’রে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। প্রতিদিন ৩৪ ক্রোশ বা বেলা দশটা পর্যন্ত চ’লে একটা স্থানে বিশ্রাম করতে হয়। সেখানে ভিক্ষা ক’রে স্বপাক আহার করলেই ভাল। পর্যটনের সময়ে ধাতু বস্তু সঙ্গে রাখতে নাই। অর্থাৎ স্পর্শও করতে নাই। টিকেট কেহ ক’রে দিলে নিতে পার। জলপাত্র কাঠের করঙ্গ হ’লেই ভাল। কোঁপীন, বহির্বাস, একখানা কবল ও পাঠের ছ’ একখানা পুস্তক মাত্র সঙ্গে রাখতে হয়। কারও সঙ্গে না চ’লে একাকী চলাতেই বেশী উপকার হয়। আহারের জন্য কোন দেবালয়ে প্রসাদও পাওয়া যায়।”

আমি ভাবিলাম এ মন্দ নয়। দেবতা বিগ্রহকে কলনা বই কিছুই মনে করি না, এ অবস্থায় আমাকে তীর্থ পর্যটনের ব্যবস্থা!

যোগসঙ্কট।

গত রাত্রিতে বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। রাত্রি বারটার সময়ে আর আর দিনের মত হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসিলাম। প্রায় দেড়টার সময়ে নাম করিতে করিতে একটু ১২শে চৈত্র। তন্দ্রাবেশ হইল। ঐ সময়ে ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাইয়া জাগিয়া পড়িলাম। তিনি প্রায়ই গভীর রাত্রিতে দুই একটু গানে টান দিয়া ছ’এক মিনিটের মধ্যেই ভাবাবেশে গৌঁ গৌঁ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়েন। গত রাত্রিতেও—

“সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জে, চিত্ত সমাধান কর রে।

আদি সত্য তিনি, কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে ;

জীবন্ত জ্যোতির্ময়, সকলের আশ্রয়,

দেখে সেই, যে জন বিশ্বাস করে।

অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, বিরাজিত হৃদি-কন্দরে ;

জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।

অনন্ত গুণাধার, প্রশান্ত মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে।

পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজ গুণে, দীন হীন ব’লে দয়া ক’রে।

চিরক্ষমাশীল কল্যাণ-দাতা নিকট সহায় দুঃখসাগরে ;

পরম চায়বান, করেন ফলদান, পাপ পুণ্য কর্ম অহুসারে।

প্রেমময় দয়াসিদ্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে ;

তঁার মুখ দেখি, সবে হও হে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে

বিচিত্র শোভাময়, নির্মল প্রকৃতি,

বর্ণিতে সে রূপ বচন হারে ;

ভজন সাধন তাঁর, কর রে নিরন্তর,

চিরভিখারী হ’য়ে তাঁর দ্বারে ॥”

ব্রহ্ম-সঙ্গীতের এই গানটির দু’এক পদ গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের ঐ গান এবং আশ্চর্য্য গম্ভীর এক প্রকার স্বর শুনিয়া আমার ভিতরে আগুন আগুন এতই বেগে নাম হইতে লাগিল যে আমি একেবারে অবসর হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার হাত পা মাথা যেন থিচিয়া পেটের ভিতরে টানিয়া লইতে লাগিল। আমি তখন ঐ অস্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতি অঙ্গে হইতেছে বুঝিয়াও তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিলাম না। শিরা, ধমনি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশীগুলি মোচড়াইয়া, মনে হইল যেন আমাকে একেবারে কুয়াণ্ডাকৃতি করিয়া ফেলিল। ভিতরে বাহিরে কেবলই নামই শুনিতে লাগিলাম। শরীরে এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহা নিবারণের কোনও চেষ্টাই আসিল না। কিছুক্ষণ পরে আমার দেহের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইল। তখন কি অবস্থায় কোথায় কি ভাবে ছিলাম ঠাকুরই জানেন। এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম আমি কিছুই জানি না। পরে ধীরে ধীরে নামের বেগ কমিয়া আসিল, হাত পাও ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করিয়া সোজা করিয়া বসিলাম। ঠাকুরকে মধ্যাহ্নে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

‘এরূপ কেন হ’ল ?’

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, ওপ্রকার হয়। নাম স্বাসে প্রশ্বাসে হ’লে, যখন ঐ নাম প্রতি শিরায় শিরায় চলতে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কাণ, চোখ, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিতর দিকে টেনে নেয়। ঐ অবস্থার আরম্ভেই সতর্ক না হ’লে আর নাম এ সময়ে একেবারে ছেড়ে দিলে বিষম সঙ্কটে পড়তে হয়। ঐ অবস্থায় হাত পা সমস্ত একেবারে পেটের ভিতরে চ’লেও যেতে পারে। আবার অল্প প্রকারও হয়। নামটি অস্থি মজ্জা মাংসে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যখন হ’তে থাকে, তখন হাত, পা, জাহ্নু প্রভৃতি শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থলের গ্রন্থি সকল থ’সে যায়, একেবারে আলগা হ’য়ে পড়ে; হাত পা লম্বা হ’য়ে যায়। তেমন মত হ’লে হাত পা এমন কি মাথাটি পর্যন্ত শরীর হ’তে ছুটে পড়ে। আবার ধীরে ধীরে ঠিক ঠিক স্থানে এসে লেগে জুড়ে যায়। এ সব শুধু কথা নয় নিজে দেখেছি।”

প্রশ্ন—একই নামে শরীরের ভিতরে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা ঘটায় কেন?

উত্তর—“নাম এক এক ভাবে চ’লে, দেহে এক এক প্রকার অবস্থা করে।”

প্রশ্ন—নাম করতে করতে এক এক সময়ে শরীরে ভয়ানক জ্বালা হয় কেন?

ঠাকুর বলিলেন—“এ জ্বালা কি জ্বালা? নাম যদি করতে পার, তা হ’লে জ্বালা কি টের পাবে। প্রাচীন কালে ঋষিদের সময়ে তুষানলের ব্যবস্থা ছিল। দেহশুদ্ধির জন্তু কারো কারোকে তাঁরা তুষানলে শুদ্ধ ক’রে নিতেন। এ যুগে তা হবার যো নাই। শরীর সে প্রকার নয়; সে প্রকারের হঠযোগেরও অভ্যাস কেহ করে না। এখন মহাপুরুষেরা কৃপা ক’রে, নামাগ্নিতে দেহ শুদ্ধ ক’রে নেন। স্বাস প্রশ্বাসে যখন নাম হ’তে থাকে, তখন এই জ্বালার আরম্ভ হয়। ক্রমে নামের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্বালা এতই বৃদ্ধি হ’য়ে পড়ে যে মনে হয় শরীরের প্রতি অণু পরমাণু একেবারে দগ্ধ হ’য়ে গেল। এই নামাগ্নির জ্বালায় মানুষ তখন পাগলের মত ছুটাছুটি করে। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে পরমহংসজীর আদেশে যখন আমি বিদ্যাপর্বতে ছিলাম এই জ্বালা আমার হয়েছিল। এই জ্বালায় স্থির থাকতে না পেরে সারা দিন আমি গায়ে পাতলা কাদা মাখতাম। একদিন ঐ জ্বালা বিষম অসহ্য হওয়ায় পর্বতের ভিতরে একটা কুণ্ডে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী আমাকে তুলে এনে বললেন—‘এ কি করেছ? এ জলে কখনও নাবতে আছে? এখনই যে পাথর হ’য়ে যেতে। দেখ, তোমার চুল, দাড়ি, গোঁপ সমস্ত একেবারে সাদা হ’য়ে গেছে। এ জলের এ রকমই গুণ।’ সন্ন্যাসী অমনই পাহাড় খুঁজে একটি লতা এনে তা ছেঁচে কিছুটা রস ক’রে চুলে লাগিয়ে দিলেন।

যে সব স্থানে ঐ রস দিয়েছিলেন তা কাল হ'লো। আর যেগুলিতে লাগান হ'লো না, তা এখনও সাদা হ'য়ে আছে। তাই আমার সামনের এ সব চুল সাদা আর ছ'পাশে ও পিছনের চুল কাল। গুরুজীর দর্শন পেয়ে তাঁকে জ্বালার কথা বলায় তিনি বললেন “এ জ্বালায়ই এত অস্থির হ'চ্ছ! এখন তুমি জ্বালামুখী চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন করলে, স্থানের প্রভাবে এই জ্বালা আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হবে; পরে শীত্রই একেবারে নিবৃত্ত হ'য়ে যাবে। আমি অমনই জ্বালামুখী চ'লে গেলাম।”

এই বলিয়া ঠাকুর বিদ্যাপর্যন্তে সাধন সময়ে যে সকল অবস্থা হয়েছিল অনেক বলিলেন। ঠাকুরের মুখে সে সব কথা শুনিয়া পূর্বে একবার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি বলিয়া এখানে আর লিখিলাম না।

প্রকৃতির গলদ বার্ককেয় প্রকাশ। উপদেশ।

আমার জীবনের গতি একটা ঠিক হইতে এখনও বহু বিলম্ব। ঠাকুরের মুখে ইহা শুনিয়া অবধি মনটি অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। এবার বাড়ী ঘাইয়া আমার হিতাকাজ্ঞী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একটি বৃদ্ধের মুখে তাঁহার জীবনের কথা শুনিয়া নিয়ত কেবল তাহাই ভাবিতেছি। তিনি আমার ব্রহ্মচর্যের কথা শুনিয়া বলিলেন—‘আরে বাপু, এখন যাহাই কর না কেন, শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যৌবনে ইঞ্জিয়প্রাবল্য যেমন অধিক হইয়া থাকে, তেমন আবার সংসঙ্গে থাকিলে ধর্মোৎসাহও খুব বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। প্রকৃতির গলদ যৌবনে চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় উহা প্রায় ফুটিয়া উঠে। যৌবনাবস্থায় ধর্মের দিকে আমার বড়ই ঝোঁক ছিল; সন্ধ্যা, পূজা, জপতপ লইয়াই প্রায় অনেক সময় কাটাইতাম। চরিত্রের বলও আমার অসাধারণ ছিল। একবার একটি জরুরি মামলায় পড়িয়া, বিষম বাড় তুফানের পরদিন আমি পদ্মানদী দিয়া ঢাকা চলিলাম। পূর্ব রাত্রিতে অনেক নৌকাডুবি হইয়াছিল। আমি পান্সি নৌকা হইতে দেখিলাম— ১৭১৮ বৎসরের একটি পরমা স্তন্দরী যুবতী উলঙ্গাবস্থায় চড়ার উপরে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে বিপন্ন মনে করিয়া, অমনই তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। মেয়েটি বলিল, ‘গত রাত্রিতে এই নদীতে আমাদের নৌকা ডুবে যায়। আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না জানি না। প্রায় মুচ্ছাবস্থায় আমি এই চড়ায় আসিয়া পড়ি। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন।’ আমি তাহার কথা শুনিয়া কান্দিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ নিজের কাপড়ের অর্দ্ধখানা পরিতে দিয়া তাহাকে নৌকায় লইয়া আসিলাম। আমার কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ২৪ দিন পান্সি নৌকায় আমার সঙ্গেই ছিল। পরে তাহার বাড়ীতে তাহাকে পহুঁছাইয়া দিলাম। ঐ সময়ে সঙ্গে আর কেহই ছিল না। তৎকালে মুহূর্তের জন্তও আমার কোন প্রকার বিকার হয় নাই। বয়স তখন আমার ২৭২৮ বৎসর। আর আজ পর্যন্ত জীবনে কখন কোন বিশেষ দুর্ভাগ্যও আমি

করি নাই। কিন্তু এখন আমার বয়স প্রায় ৬৭ বৎসর হইল, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, শরীর রুগ্ন, অবসন্ন; এই নিস্তেজ বৃদ্ধাবস্থায়ও আমার এমনই দুর্বাবস্থা ঘটয়াছে যে, সেই সময়ের কথা মনে করিয়া আক্ষেপে দিনরাত কাটাইতেছি। কেবলই মনে হয়, ‘হায়, এমন স্বযোগ হাতে পাইয়া তখন কেন ছাড়িলাম?’ তাই বলি বাপু, বিষম প্রলোভনে পড়িলেও এক সময়ে নিজ চেষ্টায় ভাল থাকা যায়; কিন্তু মূলে ভাল হওয়া যায় না। প্রকৃতিতে যে সকল দোষ আছে, তাহা চাপিয়া রাখা সহজ কিন্তু তার মূল উৎপাটন করা নিজের সাধ্যে নাই। তা শুধু গুরুকৃপাই হয়।’

এই গল্পটি ঠাকুরের নিকট বলিলাম। ঠাকুর বলিলেন--“ভবিষ্যৎ কিছু ভেবে প্রয়োজন নাই। এখন যা বলা যাচ্ছে ক’রে যাও। এজন্য যৌবনেই সাধন ভজন কর্ত্তে হয়। বয়স বেশী হ’লে, মনের উৎসাহ উত্তম ক্রমে ক্রমে নিবিয়া আসে। শরীর অবসন্ন ও রুগ্ন হ’য়ে পড়ে, তখন সাধন ভজন করা কি সহজ? যৌবনই যথার্থ সাধন ভজন করার কাল। এ সময় থেকে খুব চেষ্টা ক’রে, ধর্ম্মে একটা সংস্কার ও রুচি জন্মায়ে নিতে পারলে কতকটা রক্ষা পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যে প্রস্থানে নামটি অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, নিরাপৎ ভূমি লাভ করা যায় না। অদৃষ্টের ভোগ যদি ঘোল আনাই ভুগতে হয়, স্বভাবের দোষ ত্যাগ করা যদি অসম্ভবই হয়, তা হ’লে সাধন ভজন, ব্রত, তপস্যা এ সকলের আর তাৎপর্য্য কি? ভগবানের বিন্দুমাত্র কৃপা হ’লে, লক্ষ লক্ষ জন্মের ভোগ, পলকে নষ্ট হ’য়ে যায়; এ অতি সত্য কথা। তাঁর কৃপাই সার, আর কিছুই কিছু না। কাতর হ’য়ে তাঁর দিকে তাকালে তিনি নিশ্চয় কৃপা করেন।”

বৃষ্টিসময়ে তর্পণ; ঠাকুরের কৃপা।

আজ অষ্টমী-স্নানের দিন। ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া স্নান-তর্পণ করিব, অনেক দিন হইতে এ প্রকার মনে করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা হইল না। আর আর দিনের মত প্রত্যুষে ২৩শে চৈত্র। উঠিয়া, বুড়ীগঙ্গায়ই স্নান করিতে গেলাম। ভয়ানক বৃষ্টি হইতে লাগিল। পিতার মৃত্যুদিনে আজ এক গণ্ডুঘ জল পিতাকে দেওয়া হইবে না, মনে করিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তর্পণের জলে বৃষ্টির ফোটা পড়িলে, ঐ জল রুধির হইয়া যায় শুনিয়াছি। তাই নদীর পাড়ে যাইয়া, কিছুক্ষণ বিষন্ন হইয়া বসিয়া রহিলাম, পরে অল্পপায় দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া ঠাকুরের নিকট খুব কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলাম—‘ঠাকুর, সারা বৎসর আমি পিতাকে তর্পণের জল দিয়া আসিয়াছি, আর আজ বিশেষ দিনে এক গণ্ডুঘ জল তাঁকে দিতে পারিলাম না! ঠাকুর, দয়া ক’রে কিছুক্ষণের জন্য এ বৃষ্টি থামায়ে দও।’ বৃষ্টি এক ভাবেই রহিয়াছে দেখিয়া, আমি অগত্যা

নদীতে নামিলাম এবং ব্রহ্মপুত্রকে আহ্বান করিয়া, এক এক জনের নামে বুপ্, বুপ্ করিয়া ১৫২০টি ডুব দিলাম। মাথা তুলিয়া দেখি আর বৃষ্টি নাই একেবারে খামিয়া গিয়াছে, এক ফোটা জলও পড়িতেছে না। আমি দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিয়া, শেষ গণ্ডুষ জল দেওয়া মাত্রে অকস্মাৎ আবার ঝাপটা হাওয়া আসিয়া মুঘলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি ইহা দেখিয়া একেবারে অবাক হইলাম। এ সব কি আকস্মিক ঘটনা, না—ঠাকুরের কৃপারই ফল, কিছুই পরিস্কার বুঝিলাম না। গঙ্গাতীরে চমৎকার সদগন্ধ পাইয়া চিত্ত বড়ই প্রফুল্ল হইল।

মধ্যাহ্নে অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কখন কখন দিনের বেলা আসনে বসিয়া, কখন বা গভীর রাত্রিতে, আবার রাস্তায় ঘাটে বা বাগানে, জঙ্গলে, অকস্মাৎ খুব সদগন্ধ কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যায়, একটু পরেই আর থাকে না। অনেক সময়ে অহুসন্ধান করে দেখেছি, সে সব স্থানে ঐ প্রকার গন্ধের কোন হেতুই থাকে না; এ প্রকার হয় কেন?

ঠাকুর বলিলেন—“এ সব গন্ধ পাওয়া ভাল। দেব দেবী, ঋষি মুনি বা মহাপুরুষেরা, দয়া ক’রে যে স্থানে আসেন সে স্থানে তাঁদের কৃপাতেই, তাঁদের গায়ের গন্ধ কেহ কেহ পান। এই গন্ধ নানারকমই পাওয়া যায়। কখনও ধূপ ধূনার গন্ধ, কখনও চন্দন—গুণ্ণুলের গন্ধ, কখনও পদ্ম গন্ধ, কখনও অশ্রু প্রকার সুগন্ধি ফুলের গন্ধ, মর্ত্তমান কলার গন্ধ, কাঁঠালের গন্ধ, আবার ফকির সাহেবদের আগমনে গাঁজার বা লবানের (সুগন্ধ বৃক্ষনির্ধ্যাস) গন্ধ পাওয়া যায়। সে সময়ে তাঁদের চরণ উদ্দেশে ভক্তি ক’রে প্রণাম কর্ত্তে হয়। আর স্থির হ’য়ে ব’সে খুব নাম কর্ত্তে হয়; তাঁদেরও তাতে খুব আনন্দ হয়। ক্রমে তাঁদের আরও কৃপা প্রত্যক্ষ করা যায়।”

সাধকের মাদক ব্যবহার; গাঁজার ধূঁয়ায় দশমহাবিড়া।

আজ কথায় কথায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধু ফকির, তান্ত্রিক সাধকেরা, অনেকেই ত মদ গাঁজা খান। এই সব খাওয়াতে তাঁদের সাধনের কি কোন প্রকার সাহায্য করে? গাঁজাখোর সাধুদের দেখলেইত গুণ্ডা ব’লে মনে হয়।

ঠাকুর বলিলেন—“গুণ্ডারাও অনেকে সময়ে সময়ে সাধুর বেশ ধ’রে থাকে, তা ঠিক। গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, একদিন গোফার ভিতর থেকে দেখলাম কয়েকজন লোক অনেকগুলি জিনিস পত্র নিয়ে ঝম্ ঝম্ ক’রে পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে। তাদের দেখেই আমি চিন্তে পারলাম। পাহাড়ের নীচেই তারা সাধু সেজে থাকত। প্রতিদিন সকালে আমি তাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতাম। ঐ দিন

সকাল বেলা বাবাজীকে গিয়ে বললাম, ‘বাবাজী, পাহাড়ের নীচে যারা গায়ে ভস্ম মেখে, তিলক কেটে, মালা প’রে, সাধু সেজে ব’সে থাকে তারা সাধু নয়। গত রাতে তাদের আমি কতকগুলি জিনিস পত্র নিয়ে পাহাড়ে উঠতে দেখেছি।’ বাবাজী বললেন, ‘ওরা সাধু নয়, গুণ্ডা। দিনে সাধুর বেশ ধ’রে বসে থাকে, আর রাতে সহরে গিয়ে চুরি ডাকাতি করে। সে সব চোরাই মাল পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে একটা গোফাতে রেখে দেয়, তা আমি জানি। তুমি যে ওদের পরিচয় পেয়েছ, তা ওদের কিছুতেই জানতে দিও না; বিপদে পড়বে। ওদের সঙ্গে এতকাল যে প্রকার ব্যবহার ক’রে এসেছ, ঠিক তেমনই ক’রো।’ আমি বাবাজীর কথা শুনে আর আর দিনের মত তাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক’রে এলাম। তারা লোক দেখলেই ধুনির কাছে সাধু সেজে ব’সে থাকত, আর লোক না থাকলে, গাঁজা খেয়ে গোলামাল করত। কোনও সাধুকে গাঁজা খেতে দেখলেই, আমার সময়ে সময়ে মনে হ’ত, ইনিও বুঝি ঐ রকমই এক জন। ছেলেবেলা থেকে কারোকে গাঁজা খেতে দেখলেই আমি তার উপর খুব চ’টে যেতাম।”

“একদিন বুদ্ধগয়া যেতে রাস্তার ধারে, বট গাছের নীচে, গায়ে ভস্মমাখা খুব তেজস্বী একটি সাধুকে ধুনি জ্বেলে ব’সে আছেন দেখতে পেলাম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ’তেই, তিনি আমাকে বসতে আসন দিলেন। পুনঃপুনঃ তিনি গাঁজা খাচ্ছেন দেখে আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হ’ল। আমি সাধুকে বললাম, ‘এত গাঁজা খেলে কি চিত্ত স্থির রেখে সাধন ভজন করা যায়? আপনি এত গাঁজা খান কেন?’ সাধু একটু হেসে আমাকে বললেন, বৈঠ বাচ্ছা, গাঁজা কাহে পিতে দেখোগে? আচ্ছা!’ এই ব’লে তিনি তাঁর চেলাটিকে বললেন, ‘আরে! দশ চিলুম্ গাঞ্জা এক দফে চড়াও।’ চেলাটি একেবারে দশ কক্ষিতে গাঁজা চড়ায়ে তার উপরে আগুন দিতে লাগলেন। সাধু একটি একটি ক’রে ঐ কক্ষি নিয়ে এক এক দমে ফরসা ক’রে ফেলে দিতে লাগলেন। প্রতি দমেই তিনি ধূঁয়া গিলে কিছুক্ষণের জন্য কুস্তক ক’রে, চোখ বুজে স্থির হ’য়ে থেকে উহা ছেড়ে দিতে লাগলেন, আর আমাকে আশ্বুল দিয়ে সঙ্কেত ক’রে ঐ ধূঁয়ার দিকে দৃষ্টি করতে বললেন। আমি ধূঁয়ার দিকে দৃষ্টি ক’রে দেখলাম, প্রত্যেক দমের ধূঁয়ায়ই, কুস্তকের পর ছেড়ে দেওয়া মাত্র, উহাতে দশমহাবিছার এক একটি আকৃতি হ’তে লাগল। ক্রমে দশ দমের ধূঁয়াতে সাধু আমাকে দশটি মহাবিছার রূপ দেখালেন। আমি ওখানে কিছুক্ষণ ব’সে থেকে বুদ্ধগয়ায় চ’লে গেলাম।”

“শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় অনেক সময়ে অনাবৃত মাঠে, ময়দানে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্বতে সাধুদের থাকতে হয়। ঐ সকল স্থানে নানা প্রকার জল হাওয়ায়, ব্যাধি জন্মাইতে পারে। তাহা নিবারণের জন্য সাধুরা গাঁজা, চরস, কুইচলা প্রভৃতি নেশা বস্তু অভ্যাস কর্তে বাধ্য হন।”

“মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশা বস্তুর স্বাভাবিক একটা গুণ এই যে, প্রকৃতির যথার্থ অবস্থাটি উহাতে প্রকাশ ক’রে দেয়। অনেক ভাল ভাল তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীরাও আত্মপরীক্ষার জন্য স্বভাব যথার্থই অধিকৃত হ’য়েছে কিনা, তাহা পরিষ্কাররূপে জান্বার জন্য ভয়ানক প্রলোভনের বস্তু চোখের সামনে রেখে ঐ সকল নেশা ক’রে থাকেন। আর তাতে ভিতরের অবস্থা কি প্রকার হয়, সে দিকে সর্বদা লক্ষ্য কর্তে থাকেন। ভাল সাধুরা নেশার কখনও বশ হন না, প্রয়োজনমত গ্রহণ করে থাকেন মাত্র।”

দয়া ও সহানুভূতিতে সাধারণ নীতি টেকে না।

এবার ছ’তিনটি চোর গভীর রাত্রিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, আমাদের আশ্রমে কয় দিনই আসিয়া কোন সুবিধা না পাইয়া অমনই চলিয়া গেল। চোর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই ঠাকুর তাহাদের ডাকিয়া বলেন—“জেগে আছি হে।” চোরেরা ঠাকুরের ঐ কথা কয় দিনই শুনিয়া আশ্রমে আসা বন্ধ করিয়াছে। এই ব্যাপার জানিয়া আমাদের কারও কারও মনে এ প্রকার আলোচনা হইতেছে, ‘ঠাকুর ত্ররূপ করেন কেন? চোরকে ত ধরিয়া শাস্তি দেওয়াই উচিত। পাছে চোরের উপর অত্যাচার হয়, এজন্য তাহাদের সরিয়া পড়িতে, ঠাকুর এ প্রকারে নিত্য তাহাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন মনে হয়।’ ঠাকুরের নিকট এই বিষয়ে কথা তুলিলে, ঠাকুর বলিলেন—“যে স্থলে দয়া ও সহানুভূতি হয়, সাধারণ নীতি সেখানে টেকে না। গাজিপুরের পাহারারী (পয়-আহারী) বাবা প্রায় সর্বদা সমাধিতে থাকতেন সপ্তাহে ছ’তিন দিন মাত্র কিছুকালের জন্য, গোফার দরজা খুলে রাখতেন, ঐ সময়ে অনেক বড় বড় লোক তাঁকে দর্শন কর্তে যেতেন; অনেকে অনেক মূল্যবান বস্তুও বাবাজীকে দিতেন। বাবাজীর গোফাতেই সে সব জিনিস থাকত। বাবাজী পোয়াটাক দুধ মাত্র খেতেন। একদিন বাবাজী সকালে গোফা হ’তে বা’র হ’য়ে গঙ্গায় স্নান কর্তে গেলেন, সেই অবসরে একটি চোর বাবাজীর গোফায় প্রবেশ ক’রে, যা কিছু ছিল সমস্ত জড় ক’রে কন্ডলে গাঁঠরি বাঁধলে। এই সময়ে বাবাজী স্নান ক’রে উঠলেন; বাবাজীর দৃষ্টি পড়তেই চোর বস্তা ফেলে পালাল। বাবাজী গোফায় এসে আসনে না ব’সে

অমনই ঐ বস্তাটি, অনেক ক’রে মাথায় তুলে নিলেন। পরে লাঠি ভর দিয়ে, ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। আট দশবার রাস্তায় বিশ্রাম ক’রে দেড় মাইল ছ’মাইল পথ, পাঁচ ছয় ঘণ্টার চেষ্ঠায় চ’লে, সেই চোরের বাড়িতে এসে হাঁপিয়ে পড়লেন। বস্তাটি রেখে, চোরকে ডেকে বললেন ‘বাবা! আমি বুড়োমানুষ, আমার উপর একটু দয়া তোমার হ’ল না! এত বড় বস্তাটি, আমার জন্ত বেঁধে রেখে এসেছ! লাঠি ভর ক’রে চলতে আমার কষ্ট হয়, আর এত বড় বোঝা কি আমি—বুড়োমানুষ, এ ছ’মাইল পথ নিয়ে আসতে পারি?’ চোর তখন বাবাজীর পায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বাবাজী বললেন, ‘বাবা! এতে তোমার আর কি অপরাধ হ’য়েছে? অভাবে ক্লেশ পাও, আর আমার ঘরে অনাবশ্যক জিনিসগুলি র’য়েছে, পেলে তোমার উপকার হয়, নিবে না কেন? তবে—আশা ক’রে বেঁধে রেখে, ফেলে না এলেই হ’ত। আমি যে বুড়ো-মানুষ!’ বাবাজীর এই ব্যবহারে, চোরেরও একটা পরিবর্তন হ’য়ে গেল। সাধারণ নীতির বিচারে ত এই চোরকে জেল দেওয়াই ঠিক ছিল, লোকে ইহাই ব’লবে।”

একটু খামিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন—“অনেক দিন হয় প্রচারক অবস্থায়, একদিন আমি একটু বেশী রাত্রিতে মেছোবাজার দিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছি, ফুটপাথের উপরে একটি মেয়েকে দাঁড়ান দেখতে পেলাম। ছেঁড়া খুব ময়লা কাপড় প’রে সে খুব ব্যস্ততার সহিত রাস্তার একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাচ্ছে। তার শুদ্ধ মলিন মুখ ও এক প্রকার কাতর ভাবে চাহনি দেখে, আমার বুকে এসে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মা! এত রাত্রিতে এ ভাবে তুমি দাঁড়িয়ে কেন?’ মেয়েটি বললে, ‘দেখুন তিন চার দিন আমার কিছু রোজগার হয় নাই। ছ’দিন আমি কিছুই খাই নাই।’ তার কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললাম। তাকে বললাম, ‘আরও একটু অপেক্ষা কর, দেখ, আজ ভগবান কিছু দেন কিনা।’ এই ব’লে আমি রাত এগারটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে, কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু হ’তে পাঁচটি টাকা সংগ্রহ করলাম। তা দিয়ে আট আনার খাবার, আড়াই টাকা দিয়ে একখানা ভাল শাড়ী এবং দুই টাকা নগদ নিয়ে মেয়েটির নিকটে উপস্থিত হ’লাম। মেয়েটিকে নমস্কার ক’রে, ওসব তার হাতে দিয়ে বললাম, ‘মা! এই খাবার, নিয়ে গিয়ে খাও। আজ ভগবান এই তোমাকে দিলেন। আর এই কাপড়খানা প’রে তুমি রাস্তায় দাঁড়িও। কিসে কি হয়, কিছু বুঝি না!’ এ দিন থেকে উপাসনায় ভগবানের কৃপা বিশেষ ভাবে অনুভব করতে লাগলাম।

ওয়াপণ্ডিত ও ঠাকুর ।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধারমণ বাবুর পুত্র পাঁচ সাত বৎসরের বালক, আধ পাগ্‌লাটে ‘ওয়াপণ্ডিত’, খুলা গায়ে নেংটাবস্থায় দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের বাড়ীর একটি গরুকে ধরিল। ঐ গরুটিকে লইয়া পণ্ডিত ঠাকুরের বার চৌদ্দ হাত অন্তরে পুকুরের ধারে একটি চায়া গাছের সহিত লম্বা দড়িতে বান্ধিয়া রাখিয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, গৌসাই, গরু রইল, দেখো যেন ছুটে না ; আমি আসি, এই ব’লে পণ্ডিত দু’হাতে পেছন চাপড়াইয়া খেলা করিতে দৌড় মারিল। ঠাকুর ঐ সময়ে পাশ ফিরিয়া গরুর দিকে মুখ করিয়া বসিলেন, অল্প কিছু না করিয়া, ভাবাবেশে মগ্ন না থাকিয়া, একটানা গরুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় দুইটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত ওয়াপণ্ডিতের আর দেখা নাই। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে আশ্রমের ভিতর দিয়া ওয়াপণ্ডিত বাইতেছে জানিতে পারিয়া, ঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “পণ্ডিত, এখন তোমার গরুটি নেবে ? আমি যে সেই থেকে তোমার গরু দেখছি।” পণ্ডিত দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, ‘ও ! গরুটা এখানেই আছে ? বেশ, নিগে যাই’। এই বলিয়া গরুটিকে নিয়া গেল। ঠাকুরও আসন হইতে উঠিয়া শৌচে গেলেন।

ঠাকুরের স্বপ্ন ; সাধুতে বিশ্বাস ।

গত রাত্রিতে তন্দ্ৰাবস্থায় বড়ই সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম ‘ধর্ম্মলাভের জন্ত বহুসান ঘুরিয়া ফিরিয়া, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঠাকুরের সম্মুখে বাইয়া দেখি, তাঁর মস্তকে সুন্দর জটা, রং ঈষৎ তাম্রবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর ; কর ধরিয়া সটান অবস্থায় স্থির ভাবে আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি সম্মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন ; নিজের অসাধারণ সাধন প্রভাবে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যেন অগ্রাহ করিতেছেন। ইহার নিকটে আমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, কিছুকাল নানাস্থানে থাকিয়া সাধন ভজন করিলাম। অবশেষে, এই ঠাকুরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি আর তিনি নাই। সেই উগ্রতেজঃসম্পন্ন আকৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; এখন তাঁহার রূপ অল্প প্রকার। জটাতার বুদ্ধি পাইয়া কোমর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় ঈষৎ শ্যামবর্ণ স্থলাকৃতি গৌসাই স্থির গম্ভীর শান্তভাবে মাধুর্য্যরসে ডুবিয়া নিজের অবস্থায় বিভোর হইয়া, যেন ঢুলুঢুলু করিতেছেন। সেই চিত্তমোহন রূপের দিকে তাকাইয়া আমি অবশ হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর তখন মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘কি ? তুমি কি চাও, দীক্ষা নিবে ?’ আমি বলিলাম, ‘হাঁ, নিব।’ ঠাকুর বলিলেন, ‘পূর্বে যার নিকট দীক্ষা নিয়েছিলে, তাঁকে যে ত্যাগ করিতে হবে।’ আমি বলিলাম, ‘আপনাকে দেখে, আমি সেই রূপ যে ভুলে গেছি।’ ঠাকুর আমাকে তখন আবার দীক্ষা দিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে এ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সেই রূপটি এক

মুহূর্তের জন্ত ভুল হইতেছে না; অন্তরে যেন সেই অপূৰ্ণ রূপের একটা ছাপ পড়িয়া রহিয়াছে*। ঠাকুরকে অবসর মত নিৰ্জ্জনে এই বিষয় বলাতে, ঠাকুর বলিলেন—“এ সব স্বপ্ন লিখে রাখতে হয়। এক মিনিটের স্বপ্নে একটা জন্মের ভোগও শেষ হ'য়ে যেতে পারে। আমার জীবনের একটা দিক স্বপ্নে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। পূৰ্বে আমি কখনও স্বপ্ন সত্য হয় ইহা বিশ্বাস করতাম না, পরে দেখে দেখে বিশ্বাস করতে হয়েছে।”

“ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক অবস্থায়, বহুকাল পূৰ্বে আমার একবার হার্টডিজিজ্ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল; বেদনা হওয়া মাত্রই, আমি মুচ্ছিত হ'য়ে পড়তাম। এক মিনিট পূৰ্বেও বুঝতে পারতাম না। কখন কোথায় কি অবস্থায় পড়ি কি মরি, এই আশঙ্কায় আমার দেহ রক্ষার জন্ত একটি দ্বারওয়ান নিযুক্ত হয়েছিল, কোথাও বার হ'তে পারতাম না ব'লে মনে বড়ই আক্ষেপ হ'ত। মনে হ'ত, যদি কাজকর্মই কিছু করতে না পারলাম, তা হ'লে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? এ সময়ে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের একটি বাসায় আমি থাকতাম। শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখলাম জগন্নাথের ঘাটে অনেক সাধু বাসায় আমি থাকতাম। শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখলাম জগন্নাথের ঘাটে অনেক সাধু এসে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটি সাধু গায়ে ভস্ম, মাথায় জটা, একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ধুনি জ্বলে ব'সে আছেন। আমাকে হাত নেড়ে ডাকলেন এবং বললেন, ‘বাচ্ছা দিয়ে ধুনি জ্বলে ব'সে আছেন। আমাকে হাত নেড়ে ডাকলেন এবং বললেন, ‘বাচ্ছা ইহা আয় যাও, দাওয়াই লে লেও, বেমার ছুট্ যায়েগা।’ স্বপ্নটি দেখে জেগে পড়লাম, প্রাণ বড়ই অস্থির হ'ল; ভাবলাম—একবার গঙ্গা তীরে যেয়ে দেখি না কেন, আমি অমনই বার হ'য়ে পড়লাম। গঙ্গাতীরে জগন্নাথের ঘাটে গিয়ে দেখি, গঙ্গাসাগরের অমনই বার হ'য়ে পড়লাম। গঙ্গাতীরে জগন্নাথের ঘাটে গিয়ে দেখি, গঙ্গাসাগরের যাত্রী বিস্তার সাধু ওখানে আড্ডা ক'রে ব'সে আছেন। স্বপ্নে যে স্থানটিতে আমি সাধু দর্শন পেয়েছিলাম, ঠিক সেখানে গিয়ে দেখি সেই সাধুই ধুনি জ্বলে ব'সে রয়েছেন। আমাকে দেখে খুব স্নেহের সহিত ‘বৈঠ বাচ্ছা, বৈঠ, দাওয়াই লেওগে?’ এই ব'লে আমাকে দেখে খুব স্নেহের সহিত ‘বৈঠ বাচ্ছা, বৈঠ, দাওয়াই লেওগে?’ এই ব'লে তিনি একটা কোঁটা হতে অতি সামান্য পরিমাণে একটু ভস্ম আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘এহি পায় লেও, মুচ্ছা তোমারা আউর কভি নেহি হোগা। হামারা পাশ দাওয়াই আউর ছায় নেই, রহেনেসে তোমারা বেমার একদম্ ছুট্ যাতে।’ এই ব'লে তিনি আমাকে ধুনি হ'তে কতকগুলি ভস্ম দিয়ে বললেন, ‘কয় রোজ এহি ভসম্ লেকে শরীরমে আচ্ছা কর্কে রগ্‌ড়াও।’ আমি তখন উহা নিয়ে এলাম। প্রতিদিন ঐ ভস্ম কয়দিন ধ'রে গায়ে মাখলাম। সেই সময়ে আমার ব্রাহ্মবন্ধু অনেকে, আমাকে ভয়ানক কুসংস্কারী

* এইরূপ অবিকল পুরীতে ঠাকুরের হইয়াছিল।

ব'লে মনে করতে লাগলেন। আমার কিন্তু ঐ সময় হ'তে হার্টডিজিজে আর মূর্ছা হয় নাই। এই ঘটনার পর হ'তে সাধুদের প্রতি আমার একটা খুব শ্রদ্ধা এলো। রাস্তা ঘাটে সাধুবেশ দেখলেই আমি ভক্তি ক'রে নমস্কার করতাম। ভালমন্দ কিছুই বিচার করতাম না। মনে হ'ত, 'কার ভিতরে কি আছে, তা ত আমি জানি না।' নমস্কার করায় আর দোষ কি? যদি ভাগ্যক্রমে ঐ নমস্কার কোনও মহাপুরুষকে হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে বিশেষ কল্যাণও ত হ'তে পারে।"

“একদিন আমি যুজাপুর স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পেলাম একটি দীর্ঘাকৃতি কাকাল-বেশে সাধু, দণ্ড কমণ্ডলু হাতে ছুটে আসছেন। দূর হ'তে দেখতে পেয়ে আমি তাঁকে নমস্কার করব মনে ক'রে, ফুটপাথের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়লাম। তিনি নিকটে আসতেই আমি তাঁকে নমস্কার করলাম। চলতি মুখে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তখন মনে হ'ল যেন আধমণ বরফ আমার মাথায় কেহ চাপিয়ে দিলে। সশস্ত্র শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আমি সাধুর সঙ্গে যেতে মনস্থ করা মাত্র সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে বললেন, 'চলো, বাচ্ছা চলো'; এই ব'লে খুব দ্রুতপদে যেতে লাগলেন। আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। কি ভাবে কোন দিক দিয়ে কোথায় যে গেলাম কিছুই জানি না। একেবারে যেন মিস্‌মেরাইজড হ'য়ে পড়লাম। কতক্ষণ পরে দেখি, ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হয়েছি। সাধু আমাকে একটা গাছের নিচে বসিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু ব্যতীত কিছুই হয় না, তিনি পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন। আমি তাঁর নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করতে, তিনি আমাকে বললেন, না, তা হবে না; তোমার গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে তিনিই তোমাকে খুঁজে নিবেন, ব্যস্ত হ'তে হবে না। তারপর আমি তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। হাবড়ার পোলের উপরে চলতে চলতে দেখলাম, হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হ'য়ে পড়লেন। এ ঘটনার পরে সাধুদের প্রতি আমার আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।"

“একবার স্বপ্নে দেখলাম, ভগবানকে লাভ করবার জন্ম বহুস্থান ঘুরে ঘুরে একটা স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই, একখানা সাইনবোর্ড উড়তে উড়তে আমার সামনে এসে পড়ল। সাইনবোর্ডখানাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'এই পথে চল।' লেখার পরেই মুণ্ডিবদ্ধ তর্জনী নির্দেশ করা একখানা হাত ওতে রয়েছে দেখতে পেলাম। সাইনবোর্ডখানা শূন্যপথে যেতে লাগল। আমি অম্ম কোনও দিকে লক্ষ্য না ক'রে সেই অজুলিসন্ধেত

ধ'রে চলতে লাগলাম। হাতখানা আমার আগে আগে চলল; আমি কত বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, দুর্গমস্থানে, পথে অপথে চ'লে চ'লে, একটা ভয়ঙ্কর নদীর পাড়ে যেয়ে উপস্থিত হ'লাম, নদীর যেন কূল কিনারা নাই; সেখানে পঁহুছে দেখি, আর একখানা সাইনবোর্ড নদীর ঠিক পারেই রয়েছে, তাতে লেখা 'বিশ্বাসীদিগের পারে বাইবার ঘাট।' তার পর আরও কত! এ সব স্বপ্ন, স্বপ্ন নয়; যথার্থ অবস্থাই কারও কারও স্বপ্নে প্রকাশ হয়।"

মহাত্মাপুরুষের চামারীবৃত্তি।

ঠাকুর কথায় কথায় আজ বলিলেন—“একদিন মেছোবাজার স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, আমার জুতা ছিঁড়ে গেল। রাস্তার উপরে একটি চামারকে দেখে, তাকে জুতা সেলাই করতে দিলাম, কিন্তু সে পয়সা চুক্তি করলে না। জুতা সেলাই হ'য়ে গেলে, আমি তাকে পয়সা দিলাম। সেই পয়সা হ'তে, সে আমাকে ছু'টি পয়সা ফিরিয়ে দিল এবং তখনই তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে নিয়ে চলল। আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমি তার পিছনে পিছনে চললাম। সে গঙ্গাতীরে বাবু-ঘাটে যেয়ে, তলুপি তলুপা রাস্তার নীচে একটা ভাঙ্গা খিলানের ভিতর গুঁজে রেখে গঙ্গাস্নান করল; পরে তিলক ক'রে, সন্ধ্যা তর্পণাদি ক'রে, খিদিরপুরের দিকে চলল। আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগলাম। সে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করল। আমিও ঐ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, একটি লোক এসে আমাকে অতিথি মনে ক'রে, বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যেয়ে দেখি ঐ চামারটি একজন মহাস্ত। তাঁর বিস্তর শিষ্যসেবক আছেন। আখুড়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। খুব ধুমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম। মহাস্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার এত শিষ্যসেবক, নিজে মহাস্ত, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিছুরই ত অভাব নাই, তবে আপনি জুতা সেলাই করেন কেন?' মহাস্ত বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কঁঁদে ফেললেন এবং হাত জোড় ক'রে, তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে পুনঃপুনঃ নমস্কার করতে করতে বললেন—‘গুরু আমার বড় দয়াল ছিলেন।’ একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার পূর্বেই, আমি আহাৰ করেছিলাম, তাতে তিনি আমাকে শাসন ক'রে বললেন, ‘আরে তু কাহে সাধু ছয়া, তুতো চামার হো।’ আমার গুরুদেবের সেই বাক্য আমি হ'তে অগ্রথা হবে?—এই জন্ত আমি সেই দিন থেকেই চামারী ক'রে জীবিকা নির্বাহ করছি। সারাদিন চামারী ক'রে, নিজের আহারোপযোগী চার আনা পয়সা মাত্র পেলেহ

আমি চ'লে আসি। গুরুদেব শেষকালে তাঁর গদিতে আমাকেই দয়া ক'রে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও সাধ্যমত চামারীবৃত্তি দ্বারা তাঁরই সেবা ক'রে দিন কাটায়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্বাদ করবেন, যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের সেই বাক্য রক্ষা ক'রে যেতে পারি।”

“ইহাকে দেখার পর আমার মনে হ'ল এ প্রকার ছদ্মবেশেতে মহাত্মারা যেখানে সেখানে থাকতে পারেন; বাইরের 'আকার, বেশভূষা ও আচার ব্যবহার দেখে তখন তাঁদের চেনবার যো নাই, তখনকার কি অবস্থা, কি প্রকারে বুঝ'ব? সেই হ'তে আমি রাস্তায় বার হ'লেই ছ'দিকে স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, চামার, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর, যাকেই রাস্তায় সম্মুখে ছ'পাশে দেখতে পাই, মনে মনে নমস্কার করে চলি। এতে ক'রে লোকালয়ে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষেরা সময়ে সময়ে ঐ প্রকার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান, সামনে পড়লেই তাঁদেরও ধ'রে নেওয়া যায়।”

কুলগুরু, গ্রন্থগুরু, স্ত্রীগুরু, সিদ্ধগুরু এবং

সদগুরু সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নোত্তর।

যথার্থ ধর্ম্মলাভের জন্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও মনের উৎসাহ, অনেকের ভিতরে থাকিলেও আজকাল উপযুক্ত গুরুর অভাবে সে বিষয়ে বড়ই অস্ববিধা হইতেছে। যাহারা কৌলিক গুরুর কার্য্য করিতেছেন দেশের ছরবহাবশতঃ সময়ের গুণে তাঁদের আর সে অবস্থা নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে বা সময়ের প্রভাবে লোকের মতি বৃদ্ধিও এখন অল্প প্রকার। সরল বিখ্যাসে কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, এজন্য অনেকে পুস্তক দেখিয়া যোগাভ্যাসের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কেহ কেহ বিপর হইতেছেন। সুতরাং এখন উপায় কি? এ বিষয়ে সংশয় হওয়াতে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হইল ‘কুলগুরু কাকে বলে? কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণে, আজকাল লোকে তেমন ফল পায় না কেন? এতে কোনও প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি?’

ঠাকুর প্রশ্ন শুনিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—“আজকাল গুরুকরণ বড়ই সমস্যার বিষয় হ'য়ে পড়েছে। পূর্বে আমাদের দেশে যঁারা গুরু ছিলেন, সব সিদ্ধপুরুষই ছিলেন। কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হ'লেই, তাঁদের কুলগুরু বলা হ'ত। এখন কুলগুরু বলতে, লোকে বংশপরম্পরাগুরু বুঝে। এখন যঁারা গুরুর কার্য্য করছেন, অনুসন্ধান নিলে

জানা যায়, তাঁদের বংশে কেহ না কেহ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কিছুকাল পূর্বেও সিদ্ধ-পুরুষদের বংশে যাঁরা গুরুর কার্য্য কর্তেন, সিদ্ধ না হ'লেও তাঁরা বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষাদিও তাঁরা ভাল জানতেন। কেহ দীক্ষাপ্রার্থী হ'লে, গুরুরা তার কোষ্ঠী লইয়া, জন্মলগ্ন ধ'রে গণনা কর্তেন; গণনা দ্বারা দীক্ষার্থীর প্রকৃতি, সাত্ত্বিক কি রাজসিক অথবা তামসিক তাহা জেনে নিয়ে, ঐ প্রকৃতির সহিত কোন্ দেবতার বিশেষ সম্বন্ধ তাহা স্থির ক'রে নিতেন। পরে ঐ ব্যক্তির দেহ মন ও প্রকৃতির সহিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এমন কি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনুকূল প্রতিকূল কি প্রকারে যোগাযোগ তাও নিরূপণ ক'রে নিতেন। তার পর যে সকল অক্ষর স্মরণে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, তার গুণানুযায়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিমুখে তাকে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করবে, তা একটি একটি ক'রে গণনা দ্বারা বা'র ক'রে ফেলতেন। পরে সে সকল অক্ষরের সংযোজনায় মন্ত্র উদ্ধার ক'রে শিষ্যকে প্রদান কর্তেন; এবং তদনুযায়ী পূজাপদ্ধতিও ব্যবস্থা কর্তেন। এই প্রণালীতে দীক্ষা হ'লে গুরুর কোন সাহায্য না পেলেও, শিষ্য যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবৎ মন্ত্রজপ ও ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তা হ'লে তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং ঐ দেবতার একটা সাহায্য পেয়ে, ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন। ঠিক প্রকৃতির অনুযায়ী প্রণালীমত দীক্ষা পেয়ে সাধক যদি রীতিমত চেষ্টা করেন, তা হ'লে তার একটা ফল হ'তেই হবে। এজন্ম অনেক স্থলে দেখা যায়, গুরু সাধারণ অবস্থায় থাকলেও শিষ্য সিদ্ধিলাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই প্রণালী ধ'রে দীক্ষা প্রায় হয় না। শাস্ত্রঘরে একটি বৈষ্ণব প্রকৃতির লোককে গুরু এসে বংশপ্রণালী অনুসারে হয় ত শক্তির উপাসনাই দিলেন, আবার বৈষ্ণববংশের একটি শাস্ত্রভাবের লোককে হয় ত বিষ্ণুমন্ত্রই দিয়া সেই মত নিয়মপদ্ধতি ব'লে গেলেন। এই প্রকার প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথে চ'লে, সাধন ভজন করায়, কোন উপকারই হ'তে দেখা যায় না। তামসভাবের একটি লোকের সাত্ত্বিক উপাসনা কর্তে হ'লে তার যেমন প্রকৃতি মন,—এমন কি শরীরের পর্য্যন্ত অণুপরমাণুর প্রলয় ঘটাইয়া, ওসকল সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত কর্তে হয়; না হ'লে সত্ত্বগুণী দেবতার প্রসন্নতা লাভ অসম্ভব। সেই প্রকার সত্ত্বগুণীরও তামস দেবদেবীর উপাসনা কর্তে হ'লে ঐ প্রকার কর্তে হয়। এসব সহজ নয়। এ জন্মই পনের বৎসর বয়সে কেহ সাধন নিয়া, আশি বৎসর পর্য্যন্ত জপতপ ক'রেও, একটা দেবদেবীর দর্শন বা কৃপার প্রত্যক্ষতা

বিষয়ে, কোনও সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আবার কেহ বা ছেলে বয়সেই, অল্পদিন সাধন ভজন ক'রে, নিজ উপাশ্রয় দেবতার কৃপা বিষয়ে পরিষ্কার প্রমাণ দিয়া থাকেন। বর্তমান সময়ে যারা গুরুর কাজ করেন, প্রায়ই অন্য কোন বিচার না ক'রে শুধু বংশের ধারা ধ'রে, তাঁরা সাধন দেন ব'লেই অনেক অনিষ্ট হ'চ্ছে; কারণ সাধন ভজন ক'রে, লোকে ফল না পাওয়াতে মন্ত্রের উপর, ক্রিয়ার উপর এবং দেবদেবীর উপর একটা অবিশ্বাস এসে পড়'ছে। তবে লৌকিক গুরুর নিকট, বিধিমনত দীক্ষা বা গুরুশক্তির কোনও সাহায্য না পেলেও, অন্য কোনও অনিষ্টের তেমন সম্ভাবনা নাই। বরং সাধকের শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাকলে, ওতে উপকারই হয়; কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীলের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করায় অনেক সময়ে বিষম বিপদ ঘটে।”

প্রশ্ন—‘আজকাল অনেক পুস্তকেই ত যোগাভ্যাসের প্রণালী সমস্ত লেখা আছে দেখতে পাই। সে সব দেখে যোগাভ্যাস করাতে কি তেমন উপকার হয় না।’

উত্তর—“উপকার কি, গ্রন্থাদি দেখে, যোগাভ্যাস করতে যাওয়া আরও ভয়ানক। অনেকে ওরকম করতে গিয়ে হাণিয়া, কুষ্ঠ, মস্তিষ্কের রোগ, কখনও বা অন্য কোন প্রকার উৎকট রোগে প'ড়ে, একেবারে সর্বনাশ ক'রে ফেলেন। সাধন ভজনের কোন ক্রিয়াই, কৌশল না জেনে শুধু পুস্তক দেখে অভ্যাস করতে নাই। প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিই, শাস্ত্রকর্তারা খুব সঙ্ক্ষেতে লিখে গিয়েছেন। ওসব ক্রিয়ার অভ্যাস করতে হ'লেই, ক্রিয়াবান্ গুরুর নিকটে গিয়ে সন্ধানটি জানতে হয়, প্রণালী ধ'রে শিক্ষা করতে হয়। না হ'লে হয় না।”

প্রশ্ন—‘কোন কোন স্ত্রীলোকও ত গুরু আছেন; তাঁরা দীক্ষা দিচ্ছেন; শুন্তে পাই তাঁরা নাকি সিদ্ধা?’

উত্তর—“তা দিন। তবে সিদ্ধাই হউন আর মহাসিদ্ধাই হউন, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করলেও, নারীদেহ কখনও আচার্য্য হ'তে পারে না। গুরুর দেহ সর্বদাই পবিত্র; তাঁকে সেবা ক'রে, স্পর্শ ক'রে, শিষ্য শুদ্ধ হন। শাস্ত্রকর্তারা কোনও কোনও প্রাকৃতিক অনিবার্য কারণে, স্ত্রীশরীর স্বাভাবিকই অশুচি বলে গেছেন। ব্রাহ্মণীও ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে পারেন না; এখন যদি কেহ তাই করেন কি করবে? শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও অনুশাসন যারা মানেন না, গ্রাহ করেন না, তাঁরা যা ইচ্ছা করতে পারেন। তাতে আর কথা কি!”

প্রশ্ন—‘মহাপুরুষদের কথামত যদি কেহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য করেন?’

উত্তর—“মহাপুরুষদের কথা ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। তবে শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থার সহিত মিল না হ’তে পারে। তা ব’লেই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হবে, তা বলা যায় না। ‘বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা,’ এ ত শাস্ত্রেই আছে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য—মহাপুরুষ কেন, স্বয়ং ভগবান্ও যদি করতে বলেন, অভিমান থাকতে, বিচার বুদ্ধি থাকতে, তা কেহ করলে, তাকে সেইমত দণ্ডটিও পেতে হয়। ভগবানের কথাতেই ত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, অশ্বখামা হত ইতি গজঃ ব’লে, প্রকারান্তরে মিথ্যা কথাটি বলেছিলেন; তাতে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন কই? ভগবান্ই ত এজন্ম তাঁকে আবার নরকও দর্শন করালেন। এ প্রকার দৃষ্টান্ত আরও ঢের আছে। ভগবান্ও একটি কম পাত্র নন ত! শাস্ত্রকর্ত্তারা সবই দেখিয়েছেন।”

এ সকল কথার পরে, সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণে কি প্রকার ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা, জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—“বিচারশূন্য হ’য়ে ‘কেহ সিদ্ধপুরুষ’ শুনা মাত্রেই, তাঁর নিকটে গিয়ে দীক্ষা নেওয়াও ঠিক নয়। সিদ্ধ ত কত রকম আছে। ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, কোন বিশেষ বিশেষ দেবদেবীসিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যাসিদ্ধ। যাঁর যা সম্বল, তিনি তা লাভ করলেই ত সিদ্ধ হলেন। আমি যা চাই সে বিষয়ে যিনি সিদ্ধ নন, তিনি আমাকে সেই পথ ব’লে দিতে পারবেন কেন, ওবিষয়ে সাহায্যই বা কি করবেন? যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধ, তিনি সেই পথই মাত্র বলতে পারেন। সিদ্ধ হ’লেই ত আর সর্ব্বজ্ঞ হলেন না! আর সিদ্ধ হ’লেই যে তিনি ধার্ম্মিকও হবেন তাও বলা যায় না। ধর্ম্মের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব না রেখেও, কত লোক কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছেন! শুধু যোগাঙ্গ মাত্র অভ্যাস দ্বারা ঐশ্বর্য্যোতে ক’রে, কোনও ব্যক্তি চন্দ্রলোকে, সূর্য্যালোকে, নক্ষত্রলোকে, শরীরে অনায়াসে গতিবিধি করতে পারেন, অথচ তিনি নাস্তিক, ইহা কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্ব্বে ঋষিপদবাচ্য হ’য়েও কেহ কেহ নাস্তিক ছিলেন। সুতরাং কোন সিদ্ধবাক্তির নিকটেও সাধন গ্রহণের পূর্ব্বে, তিনি কিসে সিদ্ধ, সেটি বেশ ক’রে জেনে নিতে হয়। নাস্তিক প্রকৃতির একটি লোক, সিদ্ধ নাম শুনেই, যদি একজন কাপালিক বা পিশাচসিদ্ধের নিকটে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই প্রণালীমত, মদ মাংসাদি নিয়ে তামসসাধন করতে থাকেন, তাতে তাঁর আর কি উপকার হবে? প্রকৃতির বিরুদ্ধ সাধন ক’রে, সিদ্ধ-গুরুর সাহায্যসত্ত্বেও উপকার কিছুই হবে না বরং অনিষ্টই হবে। এজন্ম দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে সিদ্ধপুরুষ জেনেও, রীতিমত তাঁর সঙ্গে কিছু কাল করতে হয়। ক্রমে তাঁর আচার-

ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, সাধনভজন দেখে, যদি তাঁর প্রতি চিত্ত তেমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে এবং নিজের লক্ষ্য বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধ বলে জানা যায়, তবেই তাঁর নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। এ প্রকার হ'লে, সিদ্ধগুরুর সাহায্যে এবং নিজ প্রকৃতির অনুকূল সাধন চেষ্টায় তিনি অচিরে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।”

ঠাকুর এই প্রকার বলিয়া নীরব হইলেন ; পরে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল—‘সদগুরু কি ? তাঁর শিক্ষার বিশেষত্বই বা কি ? আর ঐ দীক্ষা লাভ হ'লে কি অবস্থা হয় ?’

ঠাকুর ভাবাবেশে থাকিয়া থাকিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—“সদগুরুর নিকটে দীক্ষা, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন প্রকার কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই ; তাহা সম্পূর্ণ কৃপাসাপেক্ষ। এই দীক্ষা যে কোন অবস্থায়, যথায় তথায় একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হ'য়ে থাকে। ভগবানই সদগুরু। ভগবানের পদাশ্রিত ভগবজ্জন মহাপুরুষেরাই সদগুরু। সদগুরু শিষ্য করেন না, তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতরে তিনি নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, তাঁরই সেবা, পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর দেবমন্দির। দেবমন্দিরে কোন প্রকার অপচার অনাচার হ'লে, সেবক যেমন তাহা দেখে লজ্জিত হন, হুঃখিত হন ; শিষ্যেরও কোন প্রকার দুর্দশা দেখলে, এই গুরু তেমনি নিজেরই, সেবা পূজার ক্রটি হ'য়েছে মনে ক'রে মলিন হ'য়ে যান। সদগুরুপ্রদত্ত নাম, নাম নয়, অক্ষর নয় বা একটা শব্দ নয় ; এই নামেই ভগবানের অনন্তশক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই শক্তিসঞ্চারই সদগুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায় একবারও কারও লাভ হ'লে, তার নিজের আর কিছুই করবার থাকে না। তার জীবনের সমস্ত কার্য্য, এমন কি—প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত, সেই এক জনারই ইচ্ছাধীন। কুমীরে-পোকাকার আরসোলা ধরার মত, সদগুরু শক্তিসঞ্চার ক'রে, দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ক্রমে আত্মসাৎ ক'রে নেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে—দীক্ষাগ্রহণমাত্রেন নরো নারায়ণো ভবেৎ।”

সাধন চেষ্টাই উন্নতির মৌপান ; নিরাশায় ভরসা।

জীবনের নানা প্রকার দুঃবস্থা ভাবিয়া, ধর্ম্মলাভ বিষয়ে একান্ত নিরাশ হইয়া ঠাকুরকে বলিলাম ‘ব্রাহ্মসমাজে যত দিন ছিলাম, মনে হয় বেশ ছিলাম। তখন কেমন একটা মতো অহুরাগ, ধর্ম্মে উৎসাহ, সকল দিকেই উন্নতির জগু প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। সব দিকেই একটা সুন্দর অবস্থা ভোগ করেছি। এখন ত সেরূপ আর জীবনে কিছুই দেখছি না। একটা কিছু ধ'রে দু'পাঁচ দিন চেষ্টা করতে না করতেই, হয়রান হ'য়ে পড়ি ; একটা দোষ দূর করতে গিয়ে, ভিতরের আরও দশটা গলদ

বা'র হ'য়ে পড়ে। হাত পা যেন ভেঙ্গে যায়, মনের উৎসাহ নিবে আসে। এরূপ হয় কেন? সঙ্গুরুর আশ্রয় পেয়ে আমার উন্নতির পরিণাম কি এই হ'ল?

ঠাকুর বলিলেন—“এই সাধন যারা পেয়েছেন, প্রায় অনেকেরই এই অবস্থা। আমি সকল বিষয়ে কর্তা, আমার উন্নতি আমিই করতে পারি এই অভিমানটি থাকতে, মানুষ ভগবানের দিকে তাকায় না। এই অভিমানটি নষ্ট করবার জন্যই, এই প্রকার অবস্থা আসা প্রয়োজন। মানুষ যে কিছুই নয়, মানুষের যে কিছুই করবার সাধ্য নাই, এটি বেশ ক'রে বুঝতে হবে। না হ'লে ভগবানের দিকে কেহ দৃষ্টিও করবে না, উন্নতিও হবে না।”

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে ভাবাবেশে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—“গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পুনঃপুনঃ সংগ্রাম করতে বলেছেন। এই সংগ্রাম, সাধক মাত্রেরই জীবনে আসবে। নানাপ্রকার ছরবস্থায় প'ড়ে, প্রলোভনের সহিত সাধক সংগ্রাম করতে থাকবে। এই সংগ্রামে সাধক কখনও বা প্রলোভনকে পরাস্ত করবে, আবার কখনও বা প্রলোভনে সাধককে পরাজয় করবে। এই বিষম সংগ্রামে অনেককাল সাধককে কাটাতে হয়। এ সময়ে একমাত্র গুরুদত্ত নামকেই অস্ত্র ক'রে, অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক, রিপুকুলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হয়। সংগ্রামের অবস্থার ন্যায় এমন ভয়ানক অবস্থা সাধকজীবনে আর নাই। বারংবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সাধক যখন নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর প্রলোভন ও রিপুগণ দ্বারা পুনঃপুনঃ পরাস্ত হ'তে থাকে, তখন তার আর ধৈর্য্য থাকে না। ‘সাধন ভজনে কিছু হয় না, সাধন ভজন সমস্তই বৃথা,’ সাধক এরূপ মনে ক'রে, একেবারে নাস্তিকের মত হ'য়ে পড়ে। যারা ছ'চার ধাক্কা খেয়েই, একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে, তাদের ভোগ শেষ হ'তে কালবিলম্ব হয়। আর যারা পুনঃপুনঃ প'ড়েও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, সংগ্রামে নিবৃত্ত হয় না, খুব শীঘ্রই তাদের ভোগ শেষ হ'য়ে যায়। যার যেমন প্রকৃতি, সে সেই মতই সংগ্রাম করতে পারে; কেহ কম, কেহ বেশি। কিন্তু অবশেষে, সকলকেই এই যুদ্ধে পরাস্ত হ'তে হবে। যুদ্ধে প্রতিপদে পরাস্ত হ'য়ে হ'য়ে, যখন একেবারে নিস্তেজ হ'য়ে পড়বে, হাড়মুড় ভেঙ্গে, একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, চারিদিক অন্ধকার দেখবে, তখন সাধক বুঝবে, যে তার ক্ষমতায় আর কিছুই হবার নয়; সে নিতান্তই অসার; একটি সামান্য

বিষয়েও, তার কিছুই করবার সামর্থ্য নাই। তখনই সে নিজেকে যথার্থ হীন, পতিত, অধম জ্ঞান ক'রে, প্রবল শক্তিশালীর দিকে তাকাবে ; অন্তরের সহিত তাঁর আশ্রয় নিবে ; তাঁরই উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে যথার্থ কৃপাপ্রার্থী হবে। নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই ; নিজেকে অসার হ'তেও অসার জেনে, একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হ'লেই, “ভক্তিযোগ” আরম্ভ হয় ; তখন আর সাধকের কোনও প্রকার ইচ্ছা, চেষ্টা বা স্বাধীনতা থাকে না। সমস্তই ভগবান করেন পরিষ্কার জেনে, সম্পূর্ণরূপে তাঁরই কৃপার উপর নিজেকে ছেড়ে দেয়। ভক্ত নিজেকে ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলে, ভগবৎকৃপায় তখন তার নিকটে নানা তত্ত্ব প্রকাশ হ'তে থাকে। এই সব তত্ত্ব প্রকাশের অবস্থাই “জ্ঞানযোগ” গীতাতে যে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় বলেছেন, তার তাৎপর্য্যই এই। তীব্র তপস্যা, কঠোর বৈরাগ্য ও প্রাণপণ সাধন ভজন ক'রেও যে, যথার্থ অবস্থা কিছুই লাভ হয় না ; তাঁর কৃপা ব্যতীত যে কিছুই হবে না, এটি পরিষ্কাররূপে বুঝবার জন্যই সাধন ভজন। নিজের চেষ্টা, সাধ্য সমস্তই অসার। একমাত্র তাঁর কৃপাই সার।”

ঠাকুর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—“খুব সংগ্রাম কর, এই সংগ্রাম জীবনে আসাও মহাসৌভাগ্য জানবে। অনেকের জীবনে এই সংগ্রামই আসে না। সংগ্রাম আরম্ভ হ'লেই বুঝবে, ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হ'ল। এই সাধনের ভিতরে যাঁরা আছেন, সকলকেই এই সংগ্রামে পড়তে হবে ; সকলকেই অন্তরের সহিত সমস্ত রিপূর নিকটে পরাস্ত মানতে হবে। নিজেদের যাহা যথার্থ ভিত্তি, তাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিজের যায়গায় একবার গিয়ে দাঁড়াইলেই, নিজেকে অতিশয় হীন, পতিত, কান্দাল ব'লে মনে হবে। ঐ সময়ে দীনবন্ধু, পতিতপাবন, কান্দালের ঠাকুর ব'লে, ভগবানকে ডাকা, একটা কথার কথা, শিখা কথা হবে না। নিজের দুর্ব্বস্থা অনুভব ক'রে ভগবানকে ডাকলে, উহা প্রাণের সহিত ডাকা হবে। তখন ভগবানও দয়া করবেন। নিরাশ হবার কিছুই নাই।”

১২৯৮ সালের—চৈত্র মাস পর্য্যন্ত।

মহেশ লাইব্রেরী

পুস্তক-বিক্রেতা

২/১, বামচরণ দে স্ট্রীট

(কলকাতা কোয়ার্টার), কলিকাতা-১৩



শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

